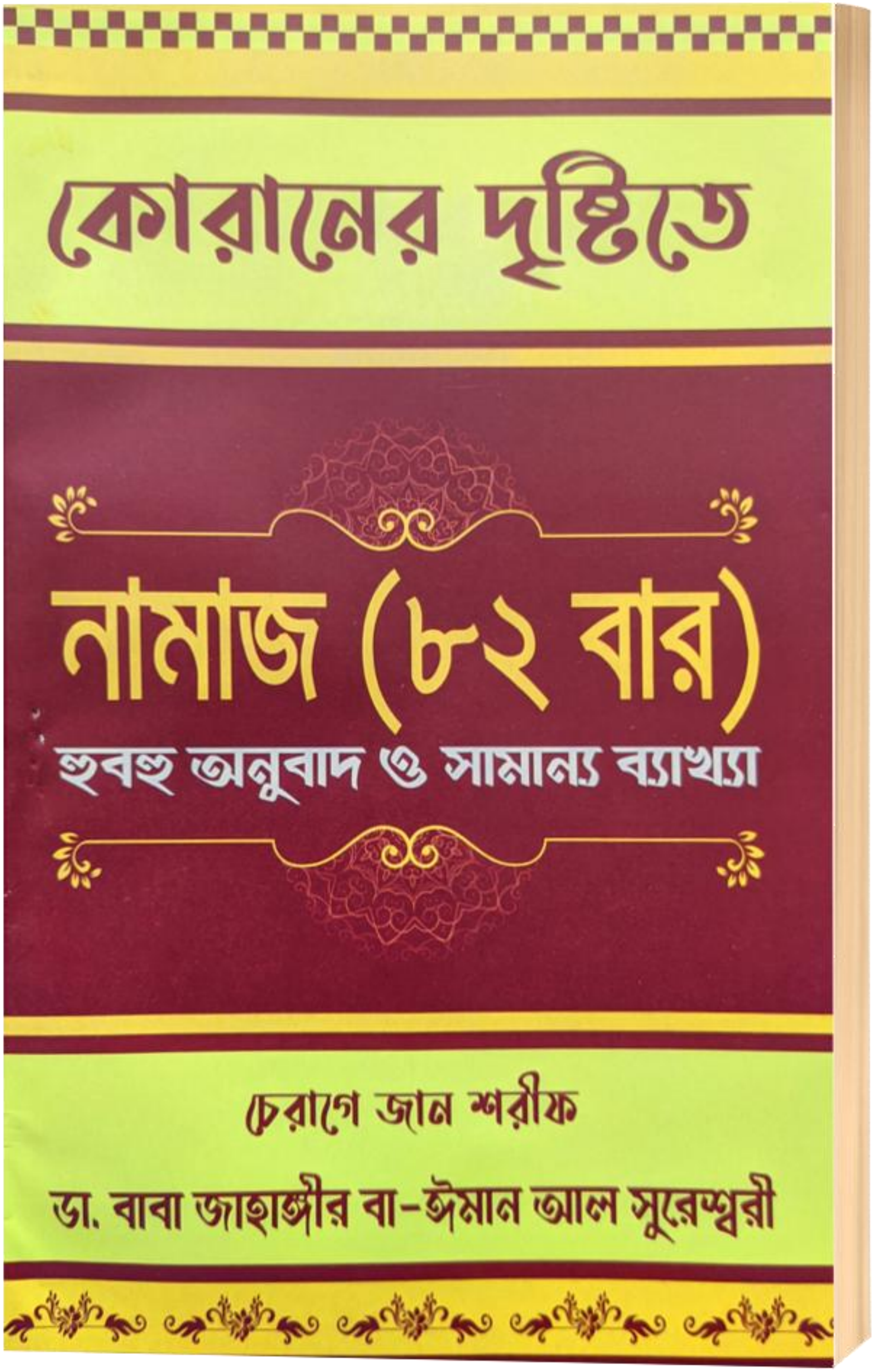

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

কোরানের দৃষ্টিতে

নামাজ

(৮২ বার)

চেরাগে জান শরীফ

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা–ঈমান আল সুরেশ্বরী

সুফিবাদ প্রকাশনালয়
প্রযত্নে : বে-ঈমান হোমিও হল
১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা) ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩, ০১৯১১৫৯৭৭৮০
web : www.babajahangirbd.com

প্রকাশক : ❑ নাহিদ শামসেত্তাব্রীজ ❑ নাজনিন মাধবি ❑ বেদম ওয়ারসী ❑ সিতুলমুনা ❑ নাইস ❑ ইরম কলন্দর ❑ নিটশে ❑ তামামি ❑ সানাই ❑ সারমাস্ত ❑ সই ❑ রক্তিম ❑ ইনশা ❑ কান্দিল ❑ রিন্দি ❑ সমনুন মোহেব ❑ কায়েনা হাসতি ❑ পূজারি ❑ মাহিনুর ❑ কুন্তি ❑ আশকাত ❑ মিরাব কলন্দর ❑ নাজা কলন্দর ❑ নাওমি ❑ লিয়াম ❑ সোহ্‌নি মাওহেল।
(সুফিবাদ প্রকাশনালয়-এর পক্ষে)
ফকিরনি দরবার শরিফ
গ্রাম : চুনকুটিয়া, ডাক : শুভাঢ্যা
থানা : কেরানীগঞ্জ, জেলা : ঢাকা
ফোন: ০১৯১১৫৯৭৭৮০, ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
web : www.babajahangirbd.com

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০১২
প্রচ্ছদ : রুম্মান, হুরায়রা ও হাসিব
স্বত্ব : মুক্ত
শব্দবিন্যাস : বাবা জাহাঙ্গীর কম্পিউটারস্, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ : এম আর প্রেস, ০২ নং ঈশ্বরদাশ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
বাঁধাই : বাবা জাহাঙ্গীর বাধাই ঘর, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মূল্য : ১৫০ টাকা মাত্র

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোনো দামে বিক্রি অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোনো প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবেও না। কারণ, এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো দেশের মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্য যে কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোনো সাময়িকীতে এই বইয়ের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোনো কারো নামে ধারাবাহিকভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোনো প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোনোদিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন, তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারিবেন।

সুফিবাদ প্রকাশনালয় হতে প্রকাশিত
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী রচিত গ্রন্থাবলি

- মারেফতের গোপন কথা
- মারেফতের বাণী
- সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ– ১ম খণ্ড
- সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ– ২য় খণ্ড
- সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ– ৩য় খণ্ড
- ইতিহাস নয় সুফিবাদের রহস্য
- নিহ্নবে চিত্তদাহ : সুফিবাদ সার্বজনীন
- কোরানুল মাজিদ (১৫ পারা হুবহু অনুবাদ ও কিছু ব্যাখ্যা)
- কোরানের দৃষ্টিতে নামাজ ৮২ বার
- কোরান ও হাদিসের দৃষ্টিতে রোজা, ইফতার, জাকাত, হজ্ব ও কোরবানী
- শরিয়তি শয়তান মারেফতি শয়তান
- মারেফাতের গোপন আলাপ
- গান বাজনার দলিল
- ফকিরির আসল কথা
- ফকিরির গোপন কথা
- শরিয়তি সেজদা মারেফতি সেজদা
- মারেফতের গোপন দর্শন অনেকেরই অজানা
- মারেফতের গোপন ভেদ রহস্য
- মারেফতের গোপন আলোচনা
- মারেফতের গোপনেরও গোপন কথা
- সুফিবাদের গোপনেরও গোপন কথা
- ফকিরির গোপনেও গোপন কথা
- আল্লাহ্ কোথায় থাকে?
- ধ্যান সাধনা
- মাজার ও কবরের পার্থক্য
- ভন্ড পীর ও পাগলা কুকুর হতে সাবধান
- আলে বায়েত ও কারবালার করুণ দৃশ্য

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে কল করুন : ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩

সালাত তথা নামাজ

আমরা নামাজ বিষয়টির উপর সামান্য আলোচনা করতে চাই। 'নামাজ' যদিও ফারসি শব্দ, কিন্তু ইহার আরবি শব্দটি হলো 'সালাত'। 'সালাত' শব্দটির অর্থ হলো সংযোগ প্রচেষ্টা, যোগাযোগ স্থাপন করা। সেই সংযোগ, সেই যোগাযোগ কার সঙ্গে? আল্লাহ্‌র সঙ্গে, না দুনিয়াদারির সঙ্গে? '*আত্‌তালেবুদ্‌ দুনিয়া মরদুদ*' অর্থাৎ 'যে কেবলমাত্র দুনিয়াই চায় সে মরদুদ নামক শয়তান।' যদিও চার প্রকার শয়তানই মানুষের অন্তরে বাস করে এবং সৃষ্টিজগতের আর কোথাও বাস করার অনুমতি দেওয়া হয় নি, তবু খান্নাস এবং মরদুদ এই দুইটি রূপ শয়তানের ভয়ঙ্কর রূপ। শয়তানের খান্নাস এবং মরদুদ রূপ দুইটি যার অন্তরে ভয়ঙ্কররূপে বাসা বেঁধে আছে তারা সত্যিই বদনসিব।

সালাত তথা নামাজ ওয়াক্তিয়া এবং দায়েমি। সকল নবি-রসুলের আমলেই সালাত কায়েম করার কথাটি আমরা *কোরান* হতে জানতে পারি এবং এ-ও জানতে পারি যে, যারা সালাত কায়েম করতে পেরেছেন তাদের কপালে সালাত কায়েমের চিহ্নটি ফুটে ওঠে।

ওয়াক্তিয়া সালাত তথা নামাজ মহানবির আমল হতে শুরু হয়েছে এবং মহানবি মেরাজে গিয়ে উম্মতদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতটি রহমতের উপহার হিশাবে নিয়ে এসেছেন। যদিও পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হজরত মুসা (আ.)-র বার বার অনুরোধে আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজটি নিয়ে এসেছেন।

যদি কেউ অধম লিখককে এই প্রশ্নটি করেন যে, মহানবি কেমন করে মুসা নবির অনুরোধে বার বার আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে এলেন? হজরত মুসা নবি কেমন করে মহানবিকে অনুরোধ ও উপদেশ দিতে পারেন? এই কথাটির উত্তর অধম লিখকের জানা নাই।

ওয়াক্তিয়া সালাত পালন করতে গেলে কপালে ঘষা খাওয়ার কালো দাগ পড়ে। এই কপালে ঘষা খাওয়া কালো দাগটিই কি সালাত কায়েমের চিহ্ন ফুটে ওঠা? এই জাতীয় চিহ্নটিকে *কোরান*-এর ভাষায় সিমা বলা হয়। এই ওয়াক্তিয়া সালাত পূর্ববর্তী নবিদের অনুসারীদের মাঝে প্রচলিত ছিল না, সুতরাং পূর্ববর্তী নবিদের অনুসারীদের কপালে এই কালো কহর জাতীয় চিহ্নটি ফুটে উঠবার প্রশ্নই আসে না। তবে কি ইহা আল্লাহ্‌র দেওয়া নুরানি চিহ্ন? অথবা অন্য কিছু যা অধম লিখকের জানা নাই?

মহানবি বলেছেন, '*আস্‌সালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম মিনাল সালাতিল ওয়াক্তি*' অর্থাৎ 'ওয়াক্তিয়া নামাজ হইতে দায়েমি নামাজ অনেক মর্যাদাপূর্ণ (তথা আফজাল)।' আমরা *কোরান*-এর সুরা মারেজের

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

২৩ নম্বর আয়াতেও দায়েমি সালাতের কথাটি জানতে পারি। *কোরান* বলছে, '*আল্লাজিনা হুম আলা সালাতেহিম দায়েমুনা*' অর্থাৎ 'তাহারা সালাতের (নামাজ) উপর সব সময় অবস্থান করেন।'

একটু ভালো করে লক্ষ করে দেখুন যে দায়েমি সালাত (নামাজ)-টির কথা *কোরান*-এও পাই, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথাটি *কোরান*-এ উল্লেখ করা হয় নি। মহানবিকে রাতে মেরাজে নেবার বিষয়টি *কোরান*-এ উল্লেখ আছে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যে উনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেই কথাটির উল্লেখ *কোরান*-এর কোথাও নাই। এক মোতাজিলা ফেরকার অনুসারী, আল্লামা জামাকসুরি, তাঁর রচিত *তফ্সিরে কাশ্শাফ*-এ সুরা বনি ইসরাইলের ৭৮ নম্বর আয়াতটি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা। যদিও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথাটি এই আয়াত দিয়ে প্রমাণিত হয় না, তবু আল্লামা জামাকসুরিকে তাঁর এই গবেষণার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

হজরত জাবেরের বর্ণিত হাদিসটি এখানে তুলে ধরলাম : '*মেফ্তাহুল জান্নাতে আস্সালাতু ওয়া মেফতাহু সালাতিত্ তহুর*' অর্থাৎ 'জান্নাতের চাবি হলো নামাজ আর নামাজের চাবিটি হলো তাহারত অর্থাৎ পবিত্রতা।' পরম শ্রদ্ধেয় আলেম-উলামারা 'নামাজ বেহেশতের চাবি' কথাটি উল্লেখ করেন, কিন্তু নামাজেরও যে চাবি আছে এবং নামাজের সেই চাবিটির নাম তাহারত অর্থাৎ পবিত্রতা, ইহা প্রায় ক্ষেত্রেই এড়িয়ে যাওয়া হয়। এড়িয়ে যাবার কারণও আছে। কারণ এমনিতেই মানুষ নামাজের প্রতি উদাসীন, তাই নামাজের চাবিটি যে তাহারত উহা বলতে গেলে আরও উদাসীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

শরীর পাকসাফ থাকার পরও পানি দিয়ে ওজু করে নামাজ পড়তে হয়। এই শরীরের পাকসাফ থাকা এবং পানি দিয়ে ওজু করাটি হলো মেজাজি তাহারত তথা মেজাজি পবিত্রতা। এই মেজাজি তাহারত তথা মেজাজি পবিত্রতা দিয়ে কেমন করে হাকিকি তাহারত তথা হাকিকি পবিত্রতার দিকে এগিয়ে যেতে হবে তারই একটি মূল্যবান পদক্ষেপ এবং মূল্যবান শিক্ষা। সুতরাং মেজাজি তাহারত তথা মেজাজি পবিত্রতাটিকেও অবহেলা করতে নাই। নামাজের চাবি তাহারত তথা পবিত্রতা। মেজাজি তাহারত তথা মেজাজি পবিত্রতা তখনই হাকিকি তাহারতে তথা হাকিকি পবিত্রতায় নিয়ে যায়, যখন সালাতি তথা নামাজি আপন নফ্সের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বাহির করে দিতে পারে। ***যেইমাত্র খান্নাসরূপী শয়তানকে আপন আপন নফ্স হতে সালাতি তথা নামাজি বের করে দিতে পারেন তখনই দায়েমি সালাতটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখনই আল্লাহ্‌র সঙ্গে সালাতির যোগাযোগ হয়ে যায়, তখনই আল্লাহ্‌র সঙ্গে সালাতি সংযোগে চিরস্থায়ীরূপে তথা দায়েমিরূপে অবস্থান করেন। এই সালাতই, এই নামাজই সালাতিকে তথা নামাজিকে মেরাজে নিয়ে যায়। এ জন্যই বলা হয়, মোমিনের সালাতই হলো মেরাজ।*** কারণ মোমিনের সঙ্গে তখন আর খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করতে পারে না। খান্নাসরূপী শয়তানটিকে সালাতের মাধ্যমে, নামাজের মাধ্যমে, যোগাযোগের মাধ্যমে, সংযোগের মাধ্যমে আপন নফ্স হতে বাহির করে দেওয়ামাত্র সালাতি মোমিন হয়ে যায়। ইহাই মোমিনের আসল সংজ্ঞা, ইহাই মোমিনের হাকিকি বয়ান। আপন নফ্সের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তান যতদিন কমবেশি অবস্থান করে সেই

সালাতি তথা নামাজি ততদিন কেবলমাত্র আমানু তথা ইমানদার। কারণ আল্লাহপাক মোমিনদের সঙ্গে থাকেন, আমানুদের সঙ্গে থাকেন না।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখসমূহ

এখন আমরা *কোরানুল করিম* হতে সালাত তথা নামাজ বিষয়টি যেখানে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার সামান্য কিছু নমুনা তুলে ধরতে চাই।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা আল বাকারার ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যাহারা গায়েবের (অদেখার) প্রতি বিশ্বাস করে (*আল্লাজিনা ইউমেনুনা বিল গায়েব*) এবং সালাত কায়েম করে (*ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা*) এবং আমরা (এখানে আল্লাহ 'আমি' বলেন নি, তাই হুবহু রাখলাম) তাহাদেরকে যে রেজেক দিয়াছি (*ওয়া মিম্মা রাজাকনাহুম*), তাহা ব্যয় করে (*ইউনফেকুনা*)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে সালাত কায়েমের আগের শর্তটি হলো, যারা বিল গায়েবের উপর ইমান আনে। বিল গায়েব শব্দটির বাংলা অনুবাদ করা হয় অদৃশ্য। এই অদৃশ্য বলতে কী বুঝায়? বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দৃশ্য এবং অদৃশ্যের বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনেক জটিল। আমরা ইচ্ছা করেই সেইসব জটিল পথে অগ্রসর না হয়ে সোজা কথায় বলতে চাই, আল্লাহ তথা সমস্ত সৃষ্টির সেফাত-সমূহ এবং জাত-সমূহের একত্রিত রূপটির নাম হলো আল্লাহ। সেই আল্লাহ তথা রুহ তথা 'আমরা'-রূপী রুহ, ফেরেশতা, আখেরাত, বেহেশত, এবং দোজখের উপর না দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করাটাকেই বিল গায়েবে বিশ্বাস করা তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস বলতে চাই। এইসব বিষয়গুলো তথা বিল গায়েবগুলো দেখবার কোনো যন্ত্র বা উপায়- উপকরণ এই সর্বাধুনিক বিজ্ঞানও আবিষ্কার করতে পারে নি। অথচ অবাক হবার কথাটি হলো, এই আল্লাহই 'নাহনু আকরাবু'-রূপে, রুহরূপে প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই তথা জীবন-রগের নিকটেই অবস্থান করছেন। এই অবস্থানটির ঘোষণা *কোরান* দেবার পরও আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। তাই এটা বিল গায়েবের জ্ঞান। তারপর যে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে উহা প্রতিটি মানুষের ভিতরেই থাক আর বাহিরেই থাক, আমরা দেখতে পাই না। এই দেখতে না-পাওয়া বিষয়টিকেই বিল গায়েব বলা হয়। আখেরাত আর কেয়ামত শব্দ দু'টো যদিও পাশাপাশি চলে তবু এখানে মৃত্যু-ঘটনাটির কথাকেই আখেরাত বলা হয়েছে। এবং ইহাও প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর আসে জান্নাত এবং জাহান্নামের কথাটি। জান্নাত ও জাহান্নাম কথা দু'টো বলতে গেলে মেজাজি এবং হাকিকির কথাটি এসে পড়ে। মেজাজি জান্নাত ও জাহান্নাম সম্ভবত বাহিরে থাকে (অধম লিখকের জানা নাই)। কিন্তু ***হাকিকি জান্নাত ও জাহান্নাম যে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেওয়া***

হয়েছে ইহাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। তাই বলা হয়ে থাকে, যিনি জান্নাতে অবস্থান করেন তার কাছে সব কিছুই জান্নাত আর যে জাহান্নামে অবস্থান করে তার কাছে সব কিছুই জাহান্নাম। এই বিষয়গুলোর উপর তথা বিল গায়েবের উপর দৃঢ় আস্থা যারা রাখতে পারবেন তাদেরকে এর আগেই বলা হয়েছে মুত্তাকি। আল্লাহ যেমন সবরকারীর সঙ্গে তথা যারা ধৈর্যধারণ করে তাদের সঙ্গে থাকবার কথাটি *কোরান*-এ ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি যারা মুত্তাকি তাদের সঙ্গেও আল্লাহ আছেন বা থাকেন বলে ঘোষণাটি *কোরান* দিয়েছে। সুতরাং মুত্তাকি বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা দায়েমি সালাতের মধ্যে তথা চিরস্থায়ী যোগাযোগ স্থাপন করাটির প্রশ্নে ধ্যানসাধনা ও মোরাকাবা-মোশাহেদার অবিরাম সাধনা চালিয়ে যান। এই অবিরাম ধ্যানসাধনা ও মোরাকাবা-মোশাহেদাটি এ জন্যই মুত্তাকিরা করে যান যাতে বিল গায়েবের বিষয়গুলো তথা অদৃশ্যের বিষয়গুলো মুত্তাকির ভেতর গোপনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যদি সবার জন্যই প্রকাশিত হয়ে যাবার বিধানটি দেওয়া হতো তা হলে দুনিয়াতে আল্লাহ যে আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছেন সেই কথাটির আর কোনো মূল্য থাকতো না। তা হলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত। আর সবাই মুসলমান হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র এই জটিল খেলাগুলোর কোনো মূল্যায়ন থাকতো না। এই কথাগুলো *কোরান*-এর অনেক আয়াতে অনেক রকম ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মুত্তাকি নামক সাধকেরাই ধ্যানসাধনা এবং মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে বিল গায়েবের তথা অদৃশ্যের ঘটনাগুলো জেনে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান। তাই আল্লাহ এই মুত্তাকিদের সঙ্গে সব সময় আছেন বলে *কোরান* ঘোষণা দিয়েছে। মুত্তাকি বলার প্রশ্নেও মেজাজি মুত্তাকি এবং হাকিকি মুত্তাকির কথাটি এসে পড়ে। মেজাজি মুত্তাকিরা বিল গায়েবের দৃশ্যগুলোর প্রতি ইমান এনেও, ধ্যানসাধনা করেও, এইসব বিষয়ের রহস্য উদঘাটন করতে পারে না। তারাও মুত্তাকি, তবে তারা মেজাজি মুত্তাকি। তারা মোটেও হাকিকি মুত্তাকি নয়। কারণ হাকিকি মুত্তাকি হবার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাক হয়ে যান। ***নিরাকার আল্লাহ যেমন সাকার মানুষ ছাড়া কথা বলার বিধানটি রাখেন নি, তেমনি হাকিকি মুত্তাকিদের মাধ্যমেই আল্লাহ কথা বলে যান।*** তাই আমরা হাদিসে দেখতে পাই, মহানবি বলেছেন, আল্লাহ্‌র খাস বান্দা নফল এবাদত-বন্দেগি করতে করতে এমন একটি পর্যায়ে এসে পড়েন যখন ওই খাস বান্দা, ওই খাস মুত্তাকির মুখেই আল্লাহ কথা বলেন, ওই খাস বান্দা ও হাকিকি মুত্তাকির চোখে আল্লাহ দর্শন করেন–ইত্যাদি। (হাদিসটি হুবহু উদ্ধৃত নয়)।

তাই মুত্তাকিরা বিল গায়েবের উপর ইমান আনে তথা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত কায়েম করে তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় এবং তাদেরকে যে রেজেক দান করা হয়েছে উহা হতে ব্যয় করে– রেজেকের বেলাতেও মেজাজি এবং হাকিকি কথাটি এসে পড়ে। মেজাজি রেজেক দান করাটি তথা ব্যয় করাটির কথা দ্বারা আমরা মোটামুটিভাবে দুনিয়ার ধনসম্পদ ব্যয় করার কথাটি বুঝে থাকি। দুনিয়ার ধনসম্পদ নামক রেজেক কথাটির সঙ্গে বেহিশাব কথাটি মোটেই খাটে না, কারণ আধুনিক বিজ্ঞান দুনিয়াতে চাউল, গম, কাসাভা, আলু, ডাল, পিঁয়াজ, রশুন, আদা এবং ইত্যাদি ধনসম্পদ বিষয়ের রেজেকগুলোর পরিমাণটুকু অনায়াসে বলে দিতে পারে। তা হলে বেহিশাব কথাটি

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

দুনিয়ার ধনসম্পদের প্রশ্নে অধম লিখকের মনে হয়, খাটে না। কিন্তু যেটি হাকিকি রেজেক, যেটি অসীম রেজেক, যেটি নুরানি রেজেক, যেটি রহস্যের রেজেক উহা মাপার যন্ত্রটি আধুনিক বিজ্ঞানও আবিষ্কার করতে পারে নি এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা না পারারই কথা। একজন হাকিকি মুত্তাকি আরেকজন মেজাজি মুত্তাকিকে যখন রহস্যের রেজেক দান করেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে মেজাজি মুত্তাকিটি হাকিকি মুত্তাকিতে পরিণত হয়ে যান। তাই *কোরান* সর্বপ্রথম একটি প্রচন্ড চপেটাঘাত করছে এই বলে যে 'আলিফ-লাম-মিম ওইটাই কেতাব।' এখানে দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে তথা বাক্যটি শেষ করে দেওয়া হয়েছে। অনেকেই এই বিষয়টি বুঝতে না পেরে কত রকমের যে ধানাইপানাই করতে থাকে এবং সেই ধানাইপানাইয়ের একেক রকম রূপ ও রঙ দেখে সরল পাঠকেরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। অনেক শ্রদ্ধেয় ধানাইপানাই করনেওয়ালা পাঠকেরা তথা লিখকেরা কিছু বুঝতে না পেরে ইহার উপর একটি বিশেষণ তথা টাইটেল জুড়ে দেয় আর সেই টাইটেলটির নাম হলো 'হুরুফ আল মুকাত্তায়াত' তথা বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ। পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহকেই হুরুফে মুকাত্তায়াত বলা হয়।

কী চমৎকার টাইটেলটি আলিফ-লাম-মিমের মাথার উপরে টুপি পরানোর মতো পরিয়ে দিয়ে আবার গুরুগম্ভীর ভাষায়, শব্দচয়নের অলঙ্কারে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে, ইহার তাৎপর্য তথা ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। এই কথাগুলো বলেই গবেষকেরা খালাস পেতে চায়, মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু *কোরান* বলছে : আল্লাহ পাক কোনো কিছুই কারণ ছাড়া তথা অকারণে বলেন না, তথা মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই *কোরান*-এর কথাগুলো। অথচ না বুঝে, না শুনে, না গবেষণা করে, না ধ্যানসাধনা করে, 'এই বিষয়গুলো আল্লাহই ভালো জানেন' বলে একখানা খাসা বাক্য লিখে খালাস পেতে চায়। আফসোস! এইসব গবেষকেরা মনের ভুলেও একটি কথা লিখতে জানে না, আর সেই কথাটি হলো–কোরান-এর এই কথাগুলোর অর্থ আমাদের জানা নাই। 'আমাদের জানা নাই' কথাটি লিখলে তথাকথিত ইসলাম গবেষকদের মান-ইজ্জত আর থাকে না। তাই নরওয়ের বিখ্যাত দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্দ বার বার তার শিষ্যদেরকে একটি কথা বলেছিলেন আর সেই মহামূল্যবান কথাটি হলো : হে আমার শিষ্যরা, জেনে রাখো, যে মানুষটি সব প্রশ্নের উত্তর গরগর গরগর করে দিতে পারে সে একজন বিপদজনক মানুষ। তার থেকে দূরে থেকো। কারণ তার থেকে জ্ঞান যতটুকু অর্জন করতে পারবে তার চেয়ে বেশি অহঙ্কার তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। (হুবহু উদ্ধৃত নয়)।

মহানবি বলেছেন, আগুন যেমন কাঠ খেয়ে ফেলে, অহঙ্কার সে রকম মানুষের মানবিক গুণগুলোকে খেয়ে ফেলে। অধম লিখক হয়তো কিছু লেখাপড়া করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, অনেক ইসলাম গবেষক, অনেক ধর্মের ধ্বজধারী, অনেক *কোরান* অনুবাদক, অনেক *কোরান*-এর তফসিরকারক আপন প্রবৃত্তির বেষ্টনীর দ্বারা বুঝতে না পেরে কত রকম ডিজাইনের যে গুল-মারা বিদ্যা লিখে গেছেন তার ইয়াত্তা নাই। একটি বারের তরেও গুল-মারা বিদ্যাটি ফেলে দিয়ে অকপটে বলে দিতে পারলো না যে,

কোরান-এর এই আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করার মতো জ্ঞান আমার নাই। অথবা, *কোরান*-এর এই আয়াতের মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারলাম না।

'জালিকাল কেতাব' অর্থাৎ 'ওইটাই কেতাব।' বলা হয় নি, 'হাজাল কেতাব' তথা 'এইটাই কেতাব।' 'ওইটাই কেতাব।' কোনটা কেতাব? বলা হয় নি জালিকাল *কোরান*, বলা হয় নি জালিকাল ফোরকান : বলা হয়েছে জালিকাল কেতাব তথা ওইটাই কেতাব। খাস নিয়তে, পবিত্র মন নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভয় রেখে আলিফ-লাম-মিম নামক আয়াতটির গবেষণা করে যান। অবশ্য অনেকেই আলিফ-লাম-মিমের রহস্যটি মোটামুটিভাবে লিখে গেছেন। সেই লেখা ভুল হোক, কিন্তু আন্তরিকতার প্রশ্নে পুরস্কার অবধারিত।

কোরান কোথাও *কোরান*-কে কেতাব বলেছে, আবার কেতাব শব্দটি দিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিরাজ্যের প্রকাশ ও বিকাশের চলমান ধারাটিকে বুঝানো হয়েছে। ওইটাই কেতাব। কোনটা? আলিফ-লাম-মিমটাই কেতাব। বাক্যটি এখানেই শেষ। তাই *কোরান*-এর সর্বপ্রথমেই রহস্যলোকের রহস্যময় কথার একটি মাত্র বাক্য মানবজাতির গালের উপরে প্রচন্ড চপেটাঘাত। হজরত শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি এই আলিফ-লাম-মিমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণটি করেছেন। সেই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণটি ভুলই হোক আর শুদ্ধই হোক, কিন্তু আন্তরিকতার প্রশ্নে নিজের বিবেককে ফাঁকি দেবার অবকাশটি রাখেন নি।

এই মহান আল্লাহ্‌র ওলি সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি আলিফ লাম-মিম বিষয়টির উপর যে ব্যাখ্যাটি দিয়ে গেছেন উহাই হুবহু তাঁর ভাষায়, তাঁর *কোরান দর্শন* নামক *কোরান*-এর তফসির হতে তুলে ধরলাম :

"আলে মিম (অর্থাৎ মোহাম্মদের বংশধর)

"আল এবং মিম অক্ষরের উপর চিরস্থায়ী মদ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া মিমের উপর তসদীদ রহিয়াছে। মোহাম্মদ (আ) তাঁহার আল সহকারে সৃষ্টির মধ্যে জাহেরে এবং বাতেনে চিরন্তন হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। এখানে 'আল' অর্থ নূরের বংশধর। আদিতে মোহাম্মদ ও অন্তে মোহাম্মদ, মধ্যে মোহাম্মদ, তাঁহাদের সবাই মোহাম্মদ। সৃষ্টির আদি-অন্তে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে সর্বত্র তাঁহারাই কর্তাব্যক্তি। মীমের উপর তসদীদ রহিয়াছে। ফলতঃ ইহার উচ্চারণে মীম দ্বিগুন হইতেছে অর্থাৎ মোহাম্মদই মোহাম্মদ।

"এই সংকেতটি ৬টি সুরার উদঘাটিকারূপে বা প্রারম্ভিক সংকেতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা : সুরা বাকারা, আলে ইমরান, আনকাবুত, রুম, লোকমান এবং সেজদা।

"অনুবাদ : (২ : ১–৩)– আলে মোহাম্মদ, উহা আল কেতাব, নাই তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ– উহা একটি হেদায়েত সেই সকল মোত্তাকিদের জন্য যাহারা গায়েবের সহিত ঈমানের কাজ করে এবং সালাত দাঁড় করে এবং আমরা যে রেজেক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

"ব্যাখ্যা: স্রষ্টার বিকাশ বিজ্ঞানকে কেতাব বলে। স্রষ্টার সকল প্রকার বিকাশ বিজ্ঞানের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহার কেতাবসমূহের মধ্যে মোহাম্মদের (আ) বংশধর হইলেন বিশিষ্ট একটি মহান কেতাব।

"অনুবাদ: (৩১ : ১-৩)- আলে মোহাম্মদ- তাঁহারা বিজ্ঞানময় আল কেতাবের পরিচয়, (তাঁহারা) সৌন্দর্যের অনুশীলনকারীদের জন্য (বা সৎকর্মশীলদের জন্য) একটি হেদায়েত ও রহমত।

"অনুবাদ: (৩২ : ১-২)- আলে মোহাম্মদ রাব্বিল আলামীন হইতে আল কেতাবের নাজেল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

অধম লিখকের মতে, আলিফ-লাম-মিমের রহস্যময় ব্যাখ্যাটি তিনি যে অতি সংক্ষেপে দিয়েছেন উহা একটি চমৎকার ব্যাখ্যা। তা ছাড়াও এই আলিফ-লাম-মিম বিষয়টির উপর অনেক ইসলাম গবেষক অনেক রকম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। যে গবেষক যতটুকু বুঝতে পেরেছেন ততটুকুই ব্যাখ্যা লিখে গেছেন। অনেক গবেষক তো আবার ভেটো-মারা বিদ্যার সিলমোহরটি মেরে দিয়েছেন। বলেছেন, এই আলিফ-লাম-মিমের অর্থটি আল্লাহই ভালো জানেন। এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা হলো? আল্লাহ তো সবই জানেন, এটা একটা অতি সাধারণ মানুষও জানে। যেহেতু আল্লাহ কথাটি বলেছেন এবং আল্লাহ বলেছেন কোনো কিছুই আমি অনর্থক বলিও না, সৃষ্টিও করি না- এরপরেও আল্লাহ্‌র উপর বিষয়টি চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে খালাস করার প্রচেষ্টাটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা পাঠকেরাই বিচার করবেন।

গবেষণায় ভুল হোক এতে আপত্তি নাই, কিন্তু আপত্তিটি তখনই করা যাবে যখন আন্তরিকতার প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কিত হতে হয়। অবশ্যই আল্লাহ প্রতিটি মানুষের অন্তরের আন্তরিকতাটি বুঝেন। কেবলমাত্র একটি দুঃখই থেকে যায় আর সেই দুঃখটি হলো এই আলিফ-লাম-মিমের রহস্যটি 'আমি বুঝতে পারলাম না' বলে অকপটে স্বীকার না করা।

এই কেতাবের সব কিছু বোঝা যে একটি অসম্ভব ব্যাপার, বিশেষ করে একজনের পক্ষে, তা *কোরান*-এর সুরা লোকমানের ২৭ নম্বর আয়াতেই বলে দেওয়া হয়েছে। অতি সংক্ষেপে বলছি : দুনিয়ার সব পানি যদি কালি হয়, এবং গাছগুলো যদি কলম হয়, তবুও কেতাবের ব্যাখ্যা করাটি সম্ভবপর হবে না। শুধু তাই নয়, বরং আরও জোর দিয়ে *কোরান* বলছে, এ রকমভাবে দুনিয়ার সব পানি যদি সাতবার পানিও হয়, দুনিয়ার সবগুলো গাছ যদি সাতবার কলমও হয়, তবু কেতাবের ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যাবে না। যেখানে দুনিয়ার সামান্য কালি-কলম এবং ছাপাখানার মেশিন দিয়েও শেষ করা যাচ্ছে না সেখানে দুনিয়ার সমস্ত পানির তুলনায় এই কালির অবস্থানটি কতটুকু হতে পারে তা বিচারের ভারটি পাঠকের হাতেই তুলে দিলাম।

আমরা অজ্ঞানতার কারণে একে অপরকে এইসব বিষয় নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করি। অথচ যাকে যতটুকু বুঝবার- জানবার রহমত আল্লাহ দান করেছেন, সে ততটুকুই বুঝতে এবং জানতে পারবে। সুতরাং কটাক্ষ করাটা সমীচীন মনে করি না।

পরম শ্রদ্ধেয় ইমাম কুরতুবি তাঁর তফসিরে বলেছেন : এই আলিফ-লাম-মিমের অর্থটি একমাত্র আল্লাহই জানেন। সুতরাং ইহার অর্থ আল্লাহ্‌র হাতেই থাকবে, কোনো মানুষ উহার ব্যাখ্যা প্রদান করবে না। ইমাম কুরতুবির মতে, এই আলিফ-লাম-মিমের ব্যাখ্যাটি কোনো মানুষের লিখা উচিত নয়।

আল্লাহ্‌র এই রহস্যময় জ্ঞানের গাট্টিটি যদি তাঁর কাছেই থাকতে দেওয়া হোক বলে উপদেশ দেন তা হলে প্রশ্নটি আসে, এই গাট্টিটি আল্লাহ কেন *কোরান*-এ প্রকাশ করলেন? শুধু প্রকাশই নয়, বরং সোজা আল্লাহ প্রথমেই বলে ফেলেছেন, 'ওইটাই কেতাব।' অথচ *কোরান* পড়লে আমরা দেখতে পাই, কেবল নবি-রসুলদেরই নয়, বরং আল্লাহ্‌র আবদালদেরকেও কেতাব দান করার কথাটি বলা হয়েছে। 'ওইটাই কেতাব' তথা উপরের আলিফ-লাম-মিমটাই কেতাব। এখানে 'জালিকাল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, 'হাজাল কেতাব' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। তা হলে আমরা দেখতে পাই, একদিকে নবি-রসুল এবং আবদালদের কেতাব দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে পরম শ্রদ্ধেয় কুরতুবি সাহেব আল্লাহ্‌র হাতেই বিষয়টি রেখে দেবার উপদেশটি দান করেছেন। ইহাতে কি স্পষ্ট আত্মবিরোধটি দেখতে পাওয়া যায় না?

কেতাবের জ্ঞানটি তো আল্লাহই দান করার কথাটি বলেছেন বার বার। অথচ 'ওইটাই কেতাব' বলে বাক্যটিকে শেষ করা হয়েছে তথা 'আলিফ-লাম-মিম জালিকাল কেতাব' তথা 'আলিফ-লাম-মিম ওইটাই কেতাব' বলে বাক্যটি শেষ করে দেওয়া হলো। তারপরেই কিন্তু বলা হয়েছে : এই কেতাবের রহস্যটি কেবলমাত্র মুত্তাকিরাই বুঝতে পারবে তথা পথের সন্ধান পাবে তথা রহস্যলোকের রহস্যময় কথাগুলো বুঝতে পারবে। আবার মুত্তাকি
হবার শর্তটি তার পরের আয়াতে দেওয়া হয়েছে। শর্তটি একটি একটি করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম শর্তটি হলো : মুত্তাকিদেরকে বিল গায়েবের উপর তথা অদৃশ্যের উপর ইমান আনতে হবে তথা বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি হলো : সালাত কায়েম করতে হবে, তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কেমন করে যোগাযোগ করতে হবে সেই যোগাযোগের পদ্ধতিটি, ফর্মুলাটি জেনে নিতে হবে– তা সেটা মেজাজি সালাতের মাধ্যমেই হোক আর হাকিকি সালাতের মাধ্যমেই হোক, তা সেটা ওয়াক্তিয়া সালাতের মাধ্যমেই হোক আর দায়েমি সালাতের মাধ্যমেই হোক। যদিও মহানবি বলে গেছেন : '*আস্ সালাতুদ্ দায়েমি আফজালুম মিনাল সালাতিল ওয়াক্তি*' তথা 'ওয়াক্তিয়া নামাজ হতে দায়েমি সালাতের মর্যাদা অনেক বেশি উন্নত। এই কথাটি কেবল হাদিসেই বলা হয় নি, বরং *কোরান*-এর ৭০ নম্বর সুরা আল মারেজের ২৩ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ বলছেন : '*আল্লাযিনাহুম আলা সালাতিহিম দায়িমুনা*' অর্থাৎ 'যারা দায়েমি সালাতের উপর দন্ডায়মান।'

ঢাকাইয়া ভাষায় বলে : 'কচু কাটতে কাটতেই ডাকাইত হয়।' আমরাও বলতে চাই, এই ওয়াক্তিয়া সালাতের অনুশীলনের মাধ্যমেই একদিন দায়েমি সালাতের অধিকারী হয়। তারপরের শর্তটি হলো : রেজেক বণ্টন করতে হবে, যে-রেজেক আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। বিষয়সম্পদের রেজেকটি মেজাজি রেজেক আর আধ্যাত্মিক রহস্যময় জ্ঞানগুলোকে বিতরণ করার নামটি হলো হাকিকি রেজেক। আমরা

অনেকেই মেজাজি আর হাকিকির বিষয়গুলোকে এক করে মহা লাবড়া পাকিয়ে ফেলি আর এই লাবড়া পাকানোর ফলেই মোহাম্মদি ইসলামের (?) ৭৩টি ফেরকা দেখতে পাই। এটা খুব বেশি একটা নতুন কিছু নয়, এটা খুব বেশি একটা অবাক হবার বিষয়ও নয়। কেন? কারণ ইহুদিদের আমলে ইব্রাহিমি ইসলামকে (?) ৭১টি ভাগে ভাগ করে ফেলেছিল এই মতভেদ এবং বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কারণে। তারপর আমরা দেখতে পাই, ইসায়ি ইসলামের (?) মতভেদটিও আরও এক ডিগ্রি উপরে উঠে গেল। ইসায়ি ইসলামের (?) মাঝেও মতভেদ বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফলে তা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেল। পাঠকদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই কথাগুলো অধম লিখকের কথা নয়, বরং মহানবির কথা তথা হাদিস। (হুবহু উদ্ধৃত নয়)।

সুফিয়ান আসসাওয়ারির মতে মুজাহিদ হতে ইবনে আবু নজিহ বলেছেন যে তিনি বলেছেন : আলিফ-লাম-মিম, হা-মিম, আলিম-লাম-মিম সোয়াদ– এইগুলো হলো *কোরানুল হাকিম*-এর চাবি। বন্ধ দরজার তালা খুলতে যেমন চাবির প্রয়োজন হয়, এই শব্দগুলিও *কোরান*-এর দরজা খোলার চাবি। মুজাহিদ হতে আরও বড় বড় ইসলাম গবেষকেরা একই রকম মন্তব্য করেছেন। আবার মুজাহিদের আরেক রকম কথায় ইবনে আবু নজিহ হতে শিবলি ও তার নিকট হতে আবু হুজায়ফা, মুসা ইবনে মাসউদ তারাও সবাই একবাক্যে বলেছেন যে, আমরা গবেষণা করে দেখলাম, আলিফ-লাম-মিম *কোরান*-এর অন্যতম নাম। প্রশ্ন থেকে যায়, এই কালির অক্ষরের ছাপার কাগজে লেখা *কোরান*-এর নাম, নাকি *কোরান* যে হাকিকতে তথা মূলে নুরময় সে *কোরান*-এর নামটি আলিফ-লাম-মিম তারা বলেছেন? এই কথাটি উল্লেখ করা হয় নি যে, আলিফ-লাম-মিমটি কি মেজাজি *কোরান*-এর অন্যতম নাম, নাকি নুরি *কোরান*-এর অন্যতম নাম। এদের কথার সঙ্গে একমত হয়ে ইসলাম গবেষক কাতাদাহ এবং জায়েদ ইবনে আসলামও ওই একই কথাই বলেছেন তথা পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন।

দামি ক্যামেরায় বাঘ-সিংহের সুন্দর এবং স্পষ্ট দু'টি বড় ছবি দেখলে সবাই বাঘ আর সিংহই বলবে, কিন্তু এই বলাটা মোটেই মিথ্যা নয়, যদিও হাকিকতে মিথ্যা এবং মেজাজিতে একদম সত্য। বুকে হাত রেখে বলুন তো, ওই বাঘ আর সিংহের ছবি দুটো কি আসলেই বাঘ-সিংহ নাকি তাদের মেজাজি রূপ? তা হলে হাকিকতের বাঘ আর সিংহ তথা আসল বাঘ আর সিংহ দেখতে হলে আপনাকে অবশ্যই চিড়িয়াখানায় যেতে হবে। কাগজ-কালির আঁচড়ে লেখা মেজাজি *কোরান*-টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুনিয়ার বড় বড় মাদ্রাসায় করা হয়। আবার নুরি *কোরান*-এর তথা হাকিকি *কোরান*-এর তথা আসল *কোরান*-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটি করার যদি কারও প্রবল ইচ্ছা থাকে তা হলে পীরের আদেশ মতো হেরাগুহার মতো নির্জন স্থানে দশ-পনের বছর অবিরাম ধ্যানসাধনা ও মোরাকাবা-মোশাহেদা করতেই হবে। কারণ নুরি *কোরান*-এর কোনো অক্ষর নাই : মেজাজি *কোরান*-এর অক্ষর আছে, শব্দ আছে, বাক্য আছে। অবশ্য নুরি *কোরান*-এর শিক্ষালাভ করার তরে নির্জনে ১০/১৫ বছর ধ্যানসাধনা করাটি হাতে গোনা কিছু গবেষক করে যান। এই জাতীয় গবেষকদের গবেষক না বলে পীর, মুরশিদ, ওলি, গাউস,

কুতুব, আবদাল এবং আরিফ বলাই উচিত। তাঁদের মতো হাকিকি *কোরান*-এর জ্ঞানে যারা জ্ঞানী তাদের কাছে প্রথমে মুরিদ হতে হবে। মেজাজি *কোরান* জানতে হলে যেমন মাদ্রাসায় গিয়ে মাদ্রসার গুরুদের কাছে শিখে নিতে হয়, জেনে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয় এবং অনেক রকম ফেরকাবাজির ব্যাকরণের ঘোরপ্যাঁচ শিখে নিতে হয়। মাদ্রাসার গুরুরা মেজাজি *কোরান*-এর পীর আর হাকিকি *কোরান*-এর তথা নুরি *কোরান*-এর রহস্য জানতে হলে নুরি *কোরান*-এর রহস্য যিনি জেনেছেন তাঁর কাছে মুরিদ হতেই হবে। সুতরাং মাদ্রাসায় মেজাজি *কোরান*-এর শিক্ষাদানকারী পীর বা গুরুকে যেমন কোনোক্রমেই অবহেলা অথবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা যায় না, হাকিকি *কোরান* তথা নুরি *কোরান*-এর বেলাতেও ওই একই কথা প্রযোজ্য।

ইসলাম গবেষক কাতাদাহ এবং জায়েদ ইবনে আসলামের মতামতের সঙ্গে আর এক ইসলাম গবেষক আবদুর রহমান ইবনে জায়েদ ইবনে আসলামের মতামতটি প্রায় একই রকম দেখতে পাই। অবশ্য *কোরান*-এর নাম এবং সুরার নাম এই দু'টি মতের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাই না। কারণ *কোরান*-এর সুরাগুলো *কোরান*-এর ভেতরেই অনেক রকম নামে অভিহিত হয়েছে।

আবার অন্য একটি ইসলাম গবেষকের দল বলেছেন যে এই মতটি অবাস্তব। এই অবাস্তব হবার কারণটি তারা দেখিয়েছেন এই বলে যে আলিফ-লাম-মিম-সোয়াদ বলতে কখনই পূর্ণ *কোরান* বোঝায় না, বরং সুরা আরাফকেই বোঝায়। এই জাতীয় গবেষকেরা বলেন, সুরার নাম আর *কোরান*-এর নাম এক কথা নহে। অধম লিখক একজন পচা ইসলাম গবেষক। আমি এই পরম শ্রদ্ধেয় গবেষকদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কেননা সমগ্র *কোরান*-এর কথা ও দর্শন মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ফর্মুলার মধ্যেই নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। অবশ্য এই পরম শ্রদ্ধেয় গবেষকদেরকে একদম ফেলে দেওয়া যায় না। কারণ সুন্দর বনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর দুনিয়ার তাবৎ জঙ্গলের টাইগারদের নকশা-পড়চা, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বরে সামান্য কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু হরিণ শিকার করার প্রশ্নে এরা সবাই ভয়ঙ্কর চালাক চতুর। অবশ্য এই গবেষকেরা এই মতামতগুলো জানিয়ে দেবার পরও পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। সংশয় তথা নিহ্নবে চিত্তদাহ হওয়াতে অকপটে বলে ফেলেছেন যে, আল্লাহই সবচাইতে ভালো জানেন, তথা ভেটো মারার বিদ্যাটি জাহির করে ফেললেন, তথা আল্লাহ্‌র স্কন্ধে বিষয়গুলোর রহস্য ছেড়ে দিলেন। অবশ্য যে গবেষক যে রকমভাবে বুঝতে পেরেছেন, সেই গবেষক আন্তরিকতার সহিতই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে গেছেন। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়।

আবার আরেক দল ইসলামের গবেষক বলে থাকেন, আলিফ-লাম-মিম– ইহা আল্লাহ্‌রই নাম। ইসলাম গবেষক শাদ শাবি বলেন আল্লাহ জাল্লা শানাহু-র ইশারা ইঙ্গিতের নামে সুরা শুরু করা হয়েছে। এই গবেষকের সঙ্গে আরও দুইজন ইসলামের গবেষক সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এবং ইসমাইল ইবনে আবদুর রহমান এই রকম কথাই বলেছেন। আবার অন্য এক ইসলাম গবেষক আল শুদ্দি হতে শুবা বিবরণ দিয়েছেন, 'আমার নিকট এই রকম একটি খবর জানতে পেরেছি যে হজরত ইবনে আব্বাস

(রা.) বলেছেন : আলিফ-লাম-মিম আল্লাহ জাল্লা শানাহুর একটি প্রধান নাম।' অধম লিখকের মতে হজরত ইবনে আব্বাসের এই কথাটি খুবই সুন্দর এবং রহস্যময়। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটি বিস্তারিত দেওয়া তো দূরে থাক, একটি কথাও লিখে যান নি।

শুবা-র বর্ণিত হাদিসটিকে সমর্থন দিয়ে ইসলাম গবেষক ইবনে জারির বিন্দার হতে তিনি ইবনে মাহদি হতে এবং তিনি শুবা হতে বর্ণনা করেছেন যে, শুবা বলেছেন, 'আমি শুদ্দিকে হা-মিম, তোয়া-হা-মিম ও আলিফ-লাম-মিম সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে তিনি বলেছেন : হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন উহা আল্লাহ্‌রই বিশেষ নাম।' হজরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই বর্ণনাটিকে ইবনে জারির বলেছেন, 'আমাকে মোহাম্মদ ইবনুল মুসনি, আবু নুমান ও শুবা ইসমাইল আল শুদ্দি হতে তিনি মোর্‌রাহ আল হামদানি হতে এই বর্ণনা শোনান যে, মোর্‌রাহ আল হামদানি বলেছেন এবং আবদুল্লাহ বলেছেন, মাওলা আলি (আ.) ও হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।'

কেন এতগুলো ডকুমেন্ট তথা দলিল-দস্তাবেজ পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম? তুলে ধরলাম এ জন্য যে, হজরত শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি যে আলিফ-লাম-মিম দ্বারা 'আলে মিম' তথা মোহাম্মদের বংশধরদেরকেই বোঝানো হয়েছে তার সুন্দর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলো দিয়েছেন তা সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। আবার আলি ইবনে আবু তালহা বলেছেন : উহা কসম বিশেষ। আল্লাহ ইহার দ্বারা কসম করেছেন। আসলে উহা আল্লাহ্‌র নাম। আবার হজরত ইকরামা হতে খালিদ আল হিজাহ, ইবনে আলিয়া, ইবনে জারির ও ইবনে আবু হাতিম বলেছেন যে হজরত ইকরামা বলেছেন : আলিফ-লাম-মিম একটি শপথবাক্য। অধম লিখক এইখানে একমত হতে পারলাম না। কারণ আলিফ-লাম-মিম-এর পরেই বলা হয়েছে জালিকাল কেতাব–তথা আলিফ-লাম-মিম ওইটাই হলো কেতাব। কেতাব কী করে শপথ হতে পারে ইহা আমার জানা নাই। কারণ আল্লাহ *কোরান*-এর আরও অনেক স্থানে কসম খেয়েছেন, কিন্তু এইখানে কসম খাবার নামগন্ধটিও নাই। তা হলে ইহা কেমন করে কসম হয়? কারণের মাধ্যমেই কার্যের প্রতিফলন ঘটে। কারণের মাধ্যমেই কর্মের বিকাশ ঘটে। সেই বিকাশটি চলমানই হোক, আর স্থিরই হোক, আর আপেক্ষিকতার অবগুণ্ঠনেই থাক, আর বিবর্তনবাদের ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে আল্লাহ্‌র শান-মান– জালুয়াগুলোর প্রকাশই হোক। কারণ আল্লাহ্‌র আরেক নাম জুলজালাল। ইহার ভাবার্থটি হলো পৃথিবী নামক গ্রহে এক সেকেন্ডে ৬০০ কোটি মানুষের চালচলন, প্রকৃতির জলবায়ুর রূপবদল, খাল-বিল-নদী-নালা সাগরের গহীনে মৎস্য নামক জীবদের চালচলন ইত্যাদি এক সেকেন্ডে, ধরে নিলাম ১০ হাজার কোটি, একেক রকম রূপ-রঙ-ঢং দেখানোর পর আর কোনোদিন কোনো কালেও সেই রূপটি দেখানো হয় না। তাই তিনি কারামতওয়ালা জুলজালাল। সম্ভবত সমগ্র *কোরান*-এ এটাই আল্লাহ্‌র সবচাইতে বড় অহঙ্কার (আল্লামা ইকবালের মতে)।

আবার অন্যত্র হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ রকম কথাও বলেছেন যে আলিফ-লাম-মিমের অর্থটি হলো, 'আনাল্লাহু আলামু' তথা 'আমি আল্লাহ অধিক জানি।' এই কথার সঙ্গে ইসলাম গবেষক

সাঈদ ইবনে জুবায়েরও একমত পোষণ করেন। এই কথাটিতে অধম লিখক মোটেই একমত হতে পারলাম না, কারণ আল্লাহই সব জানেন, এটা সাধারণ মুসলমান তো বটেই, অন্য ধর্মের অনুসারীরাও একমত। সূর্যের সাক্ষ্য এবং চাঁদের সাক্ষ্য দেবার মতো এই গ্রহে আর দ্বিতীয় সাক্ষীটি পাওয়া যায় না। ইহা বললেও যা, না বললেও তা। কিন্তু এই কথাটি কিছুটা হলেও মেনে নেওয়া যেত, যদি 'জালিকাল' কেতাব তথা ওইটাই কেতাব কথাটি না থাকতো। 'জালিকাল কেতাব' কথাটি *কোরান*-এ থাকাতেই বিশ্বমানবকে কেতাবের রহস্যটি উদঘাটন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমন– *'লা তাকরাবুস্ সালাতা'* তথা 'নামাজের ধারে কাছেও যেয়ো না' বলে বাক্যটি শেষ করা হয় নি, বরং পরের অংশটিতে বলা হয়েছে, *'ওয়া আন্তুম শুকারা'* তথা 'নেশাগ্রস্ত অবস্থায়' তথা মাতাল অবস্থায়। এই শেষের বাক্যটি না উল্লেখ করা হলে নামাজের বিষয়টি যে *কোরান*-এ ৮২ বার বলা হয়েছে উহার মূল্যায়নটি আর থাকছে কোথায়? সুতরাং আলিফ-লাম-মিম দিয়ে যদি বাক্যটি শেষ করা হতো তবে অধম লিখকের বলার কিছুই থাকতো না, কিন্তু চিন্তা করার প্রশ্নটি, ভেবে দেখার বিষয়টি তখনই আসে যখন বলা হলো : ওইটাই কেতাব।

নবি-রসুলদের কেতাব দান করা হয়েছে, কিন্তু আবদালদেরও যে কেতাব দান করা হয়েছে সেই কথাটি *কোরান*-এর বেশ কয়েকটি সুরাতে আমরা দেখতে পাই। হ্যাঁ, অবশ্যই মেনে নেব, আল্লাহ্র এই কেতাবে জ্ঞানের গভীরতার প্রশ্নে, ব্যাপকতার প্রশ্নে ছোট-বড় থাকতে পারে। যেমন, পাঁচ কেজি ওজনের মোমবাতি জ্বালালে যে আলো ছড়ায়, পাঁচ টাকা দামের মোমবাতিতে সে রকম আলো ছড়ানোর প্রশ্নই আসে না– অথচ উভয়টির উৎসই আলো, কিন্তু প্রকাশের প্রশ্নে, ব্যাপকতায় অনেক বড় হেরফের দেখতে পাই।

সুরা কাহাফে খিজিরের তিনটি ঘটনা জাঁদরেল নবি মুসা কালিমুল্লাহ (আ.), যাঁর নামটি *কোরান*-এ সম্ভবত ১৩৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে, সেই নবি খিজির নামক ওলির জ্ঞানের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না, বরং উল্টা-পাল্টা লাইন-ছাড়া ঘটনাগুলোর অবতারণা দেখে তিনবারই প্রশ্ন করে ফেলেছিলেন। শর্তও ছিলো, তিনবার যদি ধৈর্যধারণ করতে না পারেন তা হলে বিদায় নিতে হবে। তাই নবি মুসা (আ.) বিদায় নিতে বাধ্য হলেন। এখানে কয়েকটি বিশেষ রহস্যপূর্ণ কথা বলতে হয়। প্রথমেই বলতে হয়, সুরা কাহাফের কোথাও খিজির নামটি নাই, আছে 'আবদুহু'। এই আবদুহুরাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম পর্যায়ের সদস্য। এই আবদুহুদের উপর আল্লাহ আর কোনো জ্ঞানী তৈরি করেন নাই। সুরা বনি ইসরাঈলের প্রথম আয়াতটি ভালো করে বার বার পড়ে দেখুন তো! উহাতে কি নবি-রসুলের কথাটি বলা হয়েছে, না *'আসরা বে আবদিহি লাইলান্'* কথাটি বলা হয়েছে? তা হলে খিজির কথাটি কোথা হতে এল? খিজির শব্দের অর্থ হলো চিরস্থায়ী, চিরসবুজ। এই সবুজ কখনই বিবর্ণ রূপধারণ করে না।

তারপরের প্রশ্নটি হলো, মুসা (আ.)-র মতো জাঁদরেল নবির গুরু হয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ্‌র ওলি। আর সেই আল্লাহ্‌র ওলিদেরকেই ওহাবি এবং বাটালভি ফেরকার অনুসারীরা বেমালুম অস্বীকার করে যায়। মুসা নবির সামনে খিজির নামক আবদুহুর মর্যাদার স্থানটি কত উঁচুতে তা-ও কি বলে দিতে হবে? হাতের আঙুল কি কেউ আয়না দিয়ে দেখে?

মানুষের শেষ সম্বলটির নাম হলো বিবেক। সেই বিবেকটিকে নিরপেক্ষ না রেখে অহঙ্কারের বানানো অন্ধকার গর্তে যারা মাটিচাপা দিয়ে ফেলে তারা যেন নিজেরাই নিজেদের ডায়েরিতে লিখে রাখেন : আজ আমি পশুর চেয়েও অধমে পরিণত হয়ে গেলাম।

এখানে এসেই দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্দের কথাটি বার বার মনে পড়ছে, আর সেই কথাটি হলো : 'যিনি সব প্রশ্নের উত্তরগুলো গরগর গরগর করে দিয়ে ফেলেন, তিনি একজন বিপদজনক মানুষ। তার থেকে দূরে থেকো।' কেন এই কথাটি দার্শনিক সাহেব বললেন বললেন এই জন্য যে, এরা জ্ঞানের নামে অনেক রকম কথার নমুনা তুলে সরল মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে, দিশেহারা করে তোলে, সিদ্ধান্তহীনতার বিষণ্নতা নামক সাইকোলজিকাল রোগে ভোগায়। কারণ যে বা যিনি সব কিছু বুঝে গেছেন, জেনে গেছেন তাকে আর বোঝানোও যায় না, জানানোও যায় না। মনে হয় এদের অন্তরেই অজ্ঞতার অন্ধকারের অহঙ্কারের সিলমোহরটি আল্লাহ মেরে দিয়েছেন।

ইসলাম গবেষক আস্ শুদ্দি আবু মালেক এবং আবু সালেহ হতে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা এবং মুর্‌রাতুল হামদানি ইবনে মাসউদ-এর এবং অন্য এক সাহাবির বর্ণনাটি তুলে ধরেছেন। উহাতে বলা হয়েছে : 'আলিফ-লাম-মিম তিনটি বর্ণ আল্লাহ্‌র নাম।'

ইসলাম গবেষক আবু জাফর আর রাজি রবি ইবনে আনাস এবং তিনি আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেন : আল্লাহ্‌র কালামে আলিফ-লাম-মিম তিনটি অক্ষর আরবি ২৯টি অক্ষরের মধ্যেই অবস্থান করে। তবে উহাতে সব রকম রহস্যই লুকিয়ে আছে। আল্লাহ্‌র রহস্যের দরজা কেউ যদি খুলতে চায় তা হলে প্রতিটি অক্ষরই তালা লাগানো দরজায় চাবি। এই তিনটি অক্ষর বিশেষ চাবি। আবার, ইসলাম গবেষক ইবনে আবু হাতিম বলেছেন। 'আলিফ আল্লাহ্‌র নামের প্রথম অক্ষর, লাম আল্লাহ্‌র লতিফ তথা মেহেরবান নামের এবং মিম আল্লাহ্‌র মজিদ তথা মহিয়ান নামের প্রথম অক্ষর। আলিফ দিয়ে আলাউল্লাহ তথা আল্লাহ্‌র নিয়ামত, লাম দিয়ে লুৎফুল্লাহ তথা আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুকম্পা এবং মিম দিয়ে মাজুদউল্লাহ তথা আল্লাহ্‌র মহিমান্বিত উদারচিত্ততা প্রকাশ পায়।' তিনি আরও একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যে বিষয়টির আগা-মাথা অধম লিখক কিছুই বুঝতে পারি নি। আর তা হলো : আলিফ দিয়ে এক বছর, লাম দিয়ে তিরিশ বছর এবং মিম দিয়ে চল্লিশ বছর বোঝাতে চেয়েছেন।

এই যে 'আলিফ-লাম-মিম জালিকাল কেতাব' বাক্যটির একেক ইসলাম গবেষক একেক রকম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন, ইহাই গবেষণার প্রশ্নে চিন্তার স্বাধীনতার পরিচয় বহন করে। এমনকি মহানবির মহান কয়েকজন সাহাবার ব্যাখ্যাটিও তুলে ধরলাম। তুলে ধরলাম এই জন্য যে, যদি পাঠকেরা একটু খেয়াল করে দেখেন তা হলে দেখতে পারেন যে এই কথাগুলোর একটিও মহানবির বর্ণিত হাদিস

নয়। এই জন্য ইসলাম গবেষকদের এবং কয়েকজন মহান সাহাবাকে আমরা আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। আমরা আরও মোবারকবাদ জানাই এই জন্য যে, কোনো গবেষকই মহানবির হাদিস বলে উল্লেখ করেন নি, বরং নিজেদের আন্তরিক গবেষণার ফলটি অকপটে প্রকাশ করে গেছেন। সুতরাং যে যতটুকু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বোঝা বইবার উপযুক্ত, সে বা তিনি ততটুকুই বর্ণনা করতে পারেন।

পরিশেষে আরও একটু কথা থেকে যায় বলে পুনরায় বাধ্য হয়ে লিখতে হলো, আর সেটা হলো হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'আলিফ-লাম-মিম – আলিফ অর্থ আল্লাহ, লাম অর্থ জিবরাইল এবং মিম অর্থ মোহাম্মদ।' আবার এ-ও বলা হয়েছে যে, আলিফ দিয়ে আল্লাহ্‌র দানসমূহ, লাম দিয়ে তাঁর দয়া এবং মিম দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব বুঝানো হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলি তাঁর ইংরেজি ভাষায় রচিত বিশ্ববিখ্যাত *দ্য হোলি কোরান*-এ বলেছেন 'বাহ্যিক জ্ঞান দিয়ে রহস্যময় জ্ঞানের অর্থটি বোঝা যায় না, যদিও *কোরান* নিজেই ঘোষণা করেছে একটি প্লেইন বুক তথা সহজবোধ্য কেতাব হিশাবে। যদিও সহজবোধ্য কেতাব আল্লাহ বলেছেন তারপরেও একটি কথা থেকে যায় আর সেটা হলো, কত অল্প লোকেই না এটা বুঝতে পারে।' তিনি আরও বলেছেন, 'যিনি যতটুকু বুঝবার শক্তি অর্জন করেছেন, তার উপলব্ধির ব্যাপকতাও ততটুকু।'

পরম শ্রদ্ধেয় আবদুল মজিদ দরিয়াবাদি তাঁর *কোরান*-এর তফসিরে আলিফ-লাম-মিম বিষয়টিতে কিছু নূতন কথা যোগ করেছেন। উনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, মিস্টিসিজম তথা রহস্যবাদের দিকে অগ্রসর হবার জন্য আলিফ-লাম-মিম এই তিনটি অক্ষর সংকেত স্বরূপ। *কোরান* যদিও একটি সম্পূর্ণ জীবন-বিধান এবং একটি জীবন-দর্শন, তারপরও বলতে হয় যে *কোরান*-এ যে একটি রহস্যলোকের দর্শন রূপক ভাষায় দেওয়া হয়েছে উহাই সর্বপ্রথম বলা হয়েছে। পরম শ্রদ্ধেয় আবদুল মজিদ দরিয়াবাদি আরও একটি চমৎকার উদাহরণ টেনে বলেছেন যে, *ওল্ড টেস্টামেন্ট* তথা *পুরাতন নিয়ম* যে ভাষায় নাজেল হয়েছিল সেই ভাষাতেও এই রকম অক্ষরের সমাহার ছিলো। হিন্দুধর্মের *বেদ-পুরাণ* এবং *গীতা*-তে সংস্কৃত ভাষায় এই রকম অক্ষরসমূহ আছে কি না অধম লিখকের তা জানা নাই। যদি এই রকম সাংকেতিক অক্ষরের সমাহার থেকেই থাকে তা হলে কোনো হিন্দুধর্ম বিশেষজ্ঞ জানিয়ে দিলে কৃতার্থ হবো। তবে হিন্দু একজন মহাপুরুষ মহাদেব বলেছেন যে, যে-ধর্মে রহস্যলোকের কথা নাই তথা অধ্যাত্মবাদের শিক্ষা নাই, উহা কোনো ধর্মই নহে। উহা উদ্দেশ্যবিহীন সৈনিক ধর্ম পালন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটি কথা যদিও এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত নহে, তবু তিনটি ধর্মে এক রকম কথা পাবার মিলটি পাওয়া যায়, উহা আমার রচিত *সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ*-এর ৪র্থ খন্ডে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বলা হয়েছে। সেই কথাটি অতি সংক্ষেপে বলছি আর তা হলো, মহানবির কাছে নাজেল হওয়া *কোরান*-এর সর্বশেষ আয়াতটি: যদিও এই সর্বশেষ আয়াতটি একটি বিরাট সুরার চিপি-র ভেতর রেখে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : 'আজ তোমাদের ধর্মটিকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।' ঠিক এই রকম কথাটি

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন এবং ইসায়ি মুসলমান ধর্মের নবি হজরত ইসা (আ.) তথা যিশুখ্রিস্ট একই রকম কথা বলেছেন। যেহেতু *সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর* চতুর্থ খন্ডে এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে তাই এখানেই শেষ করলাম।

'আলিফ-লাম-মিম' সম্বন্ধে যত গবেষকেরা গবেষণা করে কিছু একটা লিখে গেছেন তার সামান্য কিছু নমুনা তুলে ধরার পর এবার অধম লিখকের গবেষণার ফলটি লিখছি। ***আলিফ অর্থ হলো পুরুষশক্তি, লাম হলো মিলন এবং মিম হলো নারীশক্তি। পুরুষ শক্তি এবং নারীশক্তির মিলনেই সৃষ্টিজগত প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে ছুটে চলছে।*** জিন, মানুষ, জীব-জন্তু, পাখি, মৎস্য ইত্যাদি সবই এই উভয় শক্তির মিলনের মাধ্যম দিয়ে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে ছুটে চলছে। এমনকি উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরাও বলে থাকেন যে, নর-নারী শক্তির মিলন ছাড়া উদ্ভিদের প্রকাশ ও বিকাশটি অসম্ভব। অধম লিখক নিজের চোখে দেখেছি, কাঁকরোল নামক একটি তরকারিতে কৃষক পুরুষ-পরাগটি দিয়ে প্রতিটি নারী-পরাগে স্পর্শ করাচ্ছে। প্রশ্ন করলাম : এ রকমটি কেন করা হচ্ছে? কৃষক বললেন : পুরুষ-পরাগের স্পর্শ ব্যতীত কাঁকরোল নামক তরকারিটি হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। যদিও বা কিছুটা হতে থাকে, কিন্তু পরে একদম পচে গিয়ে ঠাস করে মাটিতে পড়ে যায়।

আবার, বস্তুজগতের প্রশ্নেও দেখতে পাই, পজিটিভ আর নেগেটিভের খেলা, যেটাকে অনেক গবেষকই দ্বান্দ্বিক দর্শন বলে থাকেন। বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে নূতনের সমাহার আমরা দেখতে পাই, কিন্তু উহা কি উভয় শক্তির ফলেই হচ্ছে, নাকি দ্বান্দ্বিক দর্শনের কিছু একটা আছে, অধম লিখকের জানা নাই। তবে 'জালিকাল কেতাব' তথা ওইটাই কেতাব যাহা চলমান গতিতে ছুটে চলছে। কেতাবটি এখানে আল্লাহ্‌র সেফাত তথা গুণাবলি। কেতাব কখনও আল্লাহ্‌র জাত নয়; যদিও আল্লাহ্‌র জাত-রূপটি সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মাত্র তিনটি স্থানে দেখতে পাই : একটি লা-মোকাম, অন্যটি জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। তাই আল্লাহ জিন এবং মানুষের শাহারগের নিকটেই অবস্থান করেন। আল্লাহ্‌র এই অবস্থানটি সেফাত-রূপে নয়, বরং জাত-রূপে অবস্থান। কারণ সৃষ্টির আর কোনো জীবের সঙ্গে 'শাহারগের নিকটেই আছি' কথাটি পাওয়া যায় না।

আবার যদি 'আলিফ-লাম-মিম' দিয়ে 'আলে মিম' তথা মোহাম্মদের বংশধরদের বোঝায়, তা হলে ইহা নুরের বংশ। এই বংশ বলতে দেহধারী নবির বংশটি যদি কেউ বোঝাতে চায়, তা হলে ইহা নিছক মেজাজি বংশ। মোহাম্মদের নুরের বংশের পরিচয়টি আমরা সীমিত আকারে দেখতে পাই। দেহধারী আবু লাহাব যদিও রক্তের বংশধর, কিন্তু আমরা ভুলেও আবু লাহাবকে নবিবংশের বলে মেনে নেই না। একটি রুটিকে দুই টুকরো করলে দুই ভাগ হয় সত্যি, কিন্তু মূলে একই রুটি। আল্লাহ্‌র জাত নুর নিয়ে মহানবির অবস্থান। কারণ লা-মোকামে সৃষ্টিরাজ্যের কাউকে প্রবেশ করার অধিকারটি দেওয়া হয় নি। এমনকি মহাশক্তিশালী রুহুল আমিন নামক জিবরাইল ফেরেশতাটিও যাবার অনুমতি পান নি। জিবরাইল ফেরেশতা সিদরাতুল মুনতাহা তথা সৃষ্টি শেষ সীমায় গিয়ে থেমে যান, কিন্তু মহানবি লা-মোকামে প্রবেশ করলেন। এই প্রবেশটাই বুঝিয়ে দেয় যে মহানবি আল্লাহ্‌র জাতনুরে

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

তৈরি। মাহবুবে এলাহি নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা হজরত আমির খসরুর লা-মোকামে যাবার ঘোষণাটি জানতে পারি। আল্লাহ্‌র সঙ্গে মহানবির মিলনটি হয়েছে দুই ধনুকের ব্যবধানে অথবা আরও নিকটে। একটি ধনুক দেখতে একটি বৃত্তের অর্ধেকের মতো, দুইটি ধনুক দুইটি অর্ধবৃত্ত। দুইটি অর্ধবৃত্ত সমান-সমান একটি বৃত্ত। এই বৃত্তটি সম্পূর্ণ একত্র করার জন্য বলা হয়েছে, 'আও আদনা', তথা আরও নিকটে। দুইটি সেমি সার্কল সমান সমান একটি সার্কল। সুতরাং **অপ্রকাশিত রূপটির নাম আল্লাহ এবং প্রকাশিত রূপটির নাম নুরে মোহাম্মদ**। সুতরাং হজরত আবদুল্লাহ আলাইহেস সালাতুস্ সালাম এবং হজরত আমেনা আলাইহেস সালাতুস্ সালামের মিলনে যে মহানবির আগমনটি ঘটেছে উহা আল্লাহ্‌র জাতের একটি মেজাজি রূপ। তাই আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বের বড় বড় আল্লাহ্‌র ওলিরা বলে থাকেন : '*দোনো হিকা শেকেল এক হ্যায়, কিস কো খোদা কাহু?*' তথা 'দুইজনেরই চেহারা-সুরত একই, তা হলে কাকে খোদা বলবো?' বাউল সম্রাট লালন ফকির তো আরও এক ধাপ নিচে নেমে বলেছেন : 'যিনি মুরশিদ তিনিই রসুল খোদাও তিনি হন।' (হুবহু উদ্ধৃত নয়)।

আফসোস! আরবি ভাষা জানা আলেম-উলামারা (সবাই নন এবং আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারী আলেম-উলামারা নন) এত লেখাপড়া করেও অশ্বডিম্বটি প্রসব করেন আর বাউল সম্রাট লালন ফকির ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে সত্যকে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন।

আল্লাহ এবং মহানবি যে এক ও অভিন্ন নুর সেই বিষয়টি কোরান-এর ৪ নম্বর সুরা নেসার ১৫০ আয়াতে পরিষ্কার দেখতে পাই। '*ইন্‌নাল্‌লাজিনা*' : নিশ্চয়ই যাহারা, '*ইউক্‌ফুরুনা*' : কুফরি করে, '*বিল্লাহে*' : আল্লাহ্‌র সহিত, '*ওয়া রসুলিহি*' : এবং রসুলদের সাথে, '*ওয়া ইউরিদুনা*' এবং যাহারা এরাদা করে, '*আইউফারিক্‌কু*' : ভাগ করিতে চায়, '*বাইনাল্লাহে*' : আল্লাহ্‌র মধ্যে, '*ওয়া রাসুলেহি*' : এবং রসুলদের মধ্যে...... '*উলাইকা*': উহারাই, '*হুমুল কাফেরুনা*' : হইল কাফের, '*হাক্কান*' : পরিপূর্ণ তথা ১০০%।

(নিশ্চয়ই যাহারা কুফরি করে আল্লাহ্‌র সহিত এবং রসুলদের সাথে এবং যাহারা এরাদা করে ভাগ করিতে চায় আল্লাহ্‌র মধ্যে এবং রসুলদের মধ্যে উহারাই হইল পরিপূর্ণ তথা ১০০% কাফের)। (একদম হুবহু অনুবাদ, যাহা সবাই করেন না)।

কোরান-এর ৪ নম্বর সুরা নেসার ১৫০ নম্বর আয়াতটিকে একমাত্র আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীরা ছাড়া হুবহু অনুবাদটি করেন না। দলের তথা ফেরকার সাইনবোর্ডটি কাঁধে নিয়ে এই রকম হুবহু অনুবাদ করতে গেলে থলি হতে আসল বিড়ালটি বেরিয়ে যাবার বিপদজনক অবস্থাটি দাঁড়িয়ে যেতে পারে। এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, যারা কেবল মনে মনে এইটুকু ইচ্ছা পোষণ করলো যে, আল্লাহ আলাদা এবং রসুলেরা আলাদা, তারাই কাফের। কাফের বলেই শেষ করা হয় নি, বরং কাফেরের শেষে একটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে, তথা 'হাক্কান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তথা ১০০% কাফের তথা একদম খাঁটি কাফের তথা পরিপূর্ণ কাফের এবং এই রকম কাফের নামধারীদের

উপাসনাগুলো করা আর না করা সমান কথা, কারণ সেটা গাছের ভিত্তি তথা মূল শেকড় কেটে দিয়ে গাছের মাথায় পানি ঢালার মতো।

আজ পৃথিবীর বুকে ৫৭টি মুসলিম দেশের চেহারা-সুরত, নকশা-পড়চা, দাগ নম্বর-খতিয়ানগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, কোন পতনের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে পরাশক্তিগুলোর ধাবমান কুত্তা হয়ে গেছে। সব বাল্বেই একই আলো, তবে বাল্বের রঙ যদি লাল-নীল-সবুজ-বেগুনি-মার্কারি ইত্যাদি হয় তা হলে বাল্বের রঙেই আলোটি প্রকাশিত হয়। লাল বাল্বে লাল আলো, নীল বাল্বে নীল আলো, হলুদ বাল্বে হলুদ আলো, মার্কারি বাল্বে মার্কারির আলো, আবার আধুনিক এনার্জি সেভিং লাইটের আলো ইত্যাদি অনেক রঙের আলো দেখতে পাই– আসলে মূলে একই আলো।

অধিকাংশ গবেষক মনের অজান্তে বিরাট একটি ভুল করে বসেন আর সেই ভুলটি হলো রুহের মাগফেরাত চাওয়া। রুহ মারা যায় না, কারণ রুহ 'জন্মগ্রহণ করে না এবং জন্ম দেয়ও না।' রুহ ঘুমায় না, খাদ্য-পানি গ্রহণ করে না, ক্লান্ত হয় না, যৌনক্রিয়া করে না– তাই রুহের মাগফেরাত চাওয়াটা যে কত বড় এবং মারাত্মক ভুল ইহা হয়তো জেনেও না জানার ভান করে অথবা রুহের রহস্য বিষয়টি একেবারেই জানে না। যেখানে আদমকে রুহ ফুৎকার করা হলো সেখানে জানোয়ারের কাছে তথা হায়ওয়ানের কাছে রুহ কেমন করে ফুৎকার করা হলো ভেবে অবাক হই।

নাটোরের এক পীর সাহেব দুই খন্ডে রুহ আর নফ্সের কথাটি লিখতে গিয়ে জানোয়ারের রুহ তথা রুহে হায়ওয়ানির ব্যাখ্যাটিও মাসাল্লাহ লিখে ফেলেছেন। এদের কাছে ভক্ত মুরিদেরা কী শিখবেন, কী জানবেন? কারণ উনি নিজেই তো রুহ বিষয়টিতে একেবারেই অন্ধ। তাই এই অন্ধ পীর সাহেব যখন অন্ধ মুরিদদেরকে পথ দেখাতে শুরু করবেন তখন গর্তে পড়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা থেকে যায় এবং আত্মপরিচয়ের হাত-পা ভেঙে মরে যাবার সম্ভাবনাটি থেকে যায়, নতুবা মর্গে নিয়ে সুরতহাল তথা পোস্টমর্টেম করতে হয়। হায় রে পীর সাহেব, আর হায় রে মুরিদান! এ জন্যই বোধ হয় এই রকম পীরের চেহারা সুরত ও লিখনি পড়ে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তবলিগের গাট্টি নিয়ে আরামসে তবলিগ করে বেড়ায়। পাঠক, বুকে হাত রেখে বলুন তো, কাদেরকে দোষ দেবেন?

মরার স্বাদ গ্রহণ করে নফ্স। মোটা কথায় নফ্স মারা যায়। যে নফ্স মারা যায় সেই নফ্সের জন্য মাগফেরাত চাইতে হয়। ডাক্তারের কাছেই রোগী যায়, কোনো সুস্থ' মানুষ নয়। বাদী-বিবাদীই উকিলের কাছে যায়, আর যিনি বাদীও নন, বিবাদীও নন তার জন্য উকিলের প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনের আধিক্য যে রকম প্রয়োজনীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটায়, সেই রকম রোগীর ভালো চিকিৎসার প্রশ্নে প্রতিনিয়ত আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হচ্ছে। এই সমস্ত কথা, এই সমস্ত শাহা (বিস্তারিত) প্যাঁচাল সবই একমাত্র নফ্সের জন্য। রুহ এইসব বিশাল ঝামেলার ধারে কাছেও নাই। সুতরাং নফ্সের জন্য মাগফেরাতটি না চেয়ে রুহের জন্য মাগফেরাত চাইবার কথাটি যখন বড় বড় ইসলাম গবেষকেরা বলে বেড়ান তখন এতিমের মতো শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকি আর ভাবি : কোথায় নফ্স আর কোথায় রুহ! কোথায় আগরতলা আর কোথায় চকির তলা! কোথায় রানী ভবানী আর কোথায় বিছানায় মুতুনী! কোথায় গুপ্ত

অঙ্গের জোড়া আর কোথায় নারিকেলের জোড়া! অধম লিখক ভালো করেই জানে যে এইসব শ্রদ্ধেয় ইসলাম গবেষকেরা জাত সাপের ফণা তোলে : জাত সাপের চাষকারী খামারের মালিক তোতা মিয়া অবশেষে জাত সাপের কামড়েই মারা যান।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা বাকারার ৪৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো। (*ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ জাকাতা*)। এবং তোমরা রুকু করো রুকুকারীদের সাথে। (*ওয়ারকাউ মাআর রাকেঈনা*)।

ব্যাখ্যা

'এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো'– এই আয়াতটির আগে আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে একাকার করে দিয়ো না। সত্যকে সত্যের স্থানে রেখে দিয়ো এবং মিথ্যাকে মিথ্যার স্থানে। এই আদেশটি পালনে পিছপা হয়ো না, তথা সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য করার প্রশ্নে সত্যকে কখনো গোপন করতে যেয়ো না।

এখানে একটি প্রশ্ন থাকে যে,এই সত্যটির বেলাতেও মেজাজি সত্য এবং হাকিকি সত্যের প্রশ্নটি আসে। কেন আসে? একজন মৃত্যুপথযাত্রী ক্যানসার রোগীকে মেজাজি সত্যটিও বলা যায় না। কারণ, বলে দিলে একদম ভেঙে পড়বে এবং মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে অথবা আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। জীবন বাঁচানোর প্রশ্নে হারাম খাদ্যকেও গ্রহণ করা যায়। ইহা ইসলামেরই একটি উপদেশ। এ জন্যই মেজাজি সত্যটির প্রশ্নে সত্যটি প্রকাশ করা যেমন প্রায় ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়, আবার কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয়।

বুখারি শরিফ-এর ৯৫ নম্বর হাদিসে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) যে বলেছেন : আমি (আবু হুরায়রা) মেজাজি সত্যের যতটুকু আমার জানা আছে সবটুকুই প্রকাশ করে গেলাম,কিন্তু হাকিকি সত্যের প্রশ্নে যদি কিছু একটা বলতে যাই তো আমাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে তথা আরবি প্রবাদবাক্যে : কাটা যাইবে আমার এই গলা। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.), হজরত হুজায়ফা (রা.), হজরত আবুজর গিফারি (রা.)– কেহই হাকিকি সত্যের কথাটি বলে যান নি। সুতরাং সত্য বলতে কী বুঝায়? সত্য কত প্রকার ও কী কী? বাহিরের সত্য কয় প্রকার এবং ভেতরের সত্যটিই বা কয় প্রকার?

আল্লাহ্‌র আবদুহু, যাকে আমরা খিজির বলে থাকি, তিনি কিন্তু নবি নহেন, বরং মুসা নবি (আ.) তাঁকে মুরশিদরূপে, শিক্ষালাভ করার জন্য, আল্লাহ কর্তৃক দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রের নিকট হতে

পেয়েছিলেন। অবশ্য প্রশ্ন আসতে পারে, আল্লাহ্‌র ওলি খিজির কী করে জাঁদরেল নবি মুসা (আ.)-র মুরশিদ হতে পারেন, যেখানে মুসা নবি (আ.)-র নামটি *কোরান*-এ সবচাইতে বেশিবার উচ্চারিত হয়েছে : অধম লিখকের জানা মতে ১৩৫ বার (ভুলও হতে পারে)। সেই হজরত মুসা কালিমউল্লাহর (আ.) মুরশিদ হজরত খিজির জ্ঞানদান করার প্রশ্নে একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন, আর সেই শর্তটি ছিলো : তিনটি ঘটনার বিষয়ে একটি প্রশ্নও করা যাবে না, বরং ধৈর্যধারণ করে দেখে যেতে হবে।

আল্লাহ্‌র ওলি হজরত খিজির যখন দ্বিতীয় ঘটনাটির অবতারণা করলেন এবং সেই ঘটনাটি ছিলো : কিছু বাচ্চা ছেলেরা মিলেমিশে খেলা করছিল। আল্লাহ্‌র ওলি খিজির সেই খেলা করা বাচ্চাদের থেকে একটি বাচ্চাকে আছাড় মেরে হত্যা করে ফেললেন– এ দৃশ্য দেখে মুসা নবির মনে নানান রকম প্রশ্নের উদ্রেক হলো। মুসা নবি এই প্রশ্নগুলোর হিশাব মিলাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও হিশাব মেলাতে পারলেন না এবং বিরাট এবং তিক্ত ধৈর্যধারণটি করতে না পেরে প্রশ্ন করে ফেললেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র ওলিদের অনেক রকম উল্টাপাল্টা ঘটনা দেখে ধৈর্যধারণের প্রশ্ন তো অনেক পরে, বরং ওলি না বলে একদম ভন্ড, একদম যা-ইচ্ছা-তাই বলে মুখ ফিরিয়ে নেবার ঘটনাগুলো জানতে পারি। সুতরাং কোন সত্যটি প্রকাশ করার উপযুক্ত আর কোনটি অনুপযুক্ত উহা মাপবার যন্ত্রটি অধম লিখকের জানা নাই।

'অধম লিখকের জানা নাই'– এই কথাটির মধ্যেও যদি সত্যের একদম উলঙ্গ দৃশ্যগুলো বলতে যাই, লিখতে যাই, তা হলে বিরূপ মন্তব্যের শিকার হতে হবে। *কোরান* অতি সংক্ষেপে বলছে : 'তোমরা সত্য গোপন করো না এবং সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশিয়ে দিয়ো না।' সত্য-মিথ্যার বর্ণনাতে ভাষার বিভিন্নতা থাকতে পারে, অভিজ্ঞতার স্বল্পতা থাকতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টি একটিই, আর উহাই হলো : চাউল-গমের সঙ্গে পাথরের কণা মেশানোর মতো সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশিয়ে দিয়ো না। এইসব বাজে অভ্যাস হতে যদি মুক্তি পেতে চাও তা হলে সালাত কায়েম করো তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কেমন করে, কী উপায়ে, কার মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায় সেই প্রচেষ্টাটি অবিরামভাবে করে যাও।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, হাকিকি সালাতটি কায়েম হয়ে গেলেই জাকাত দেবার উপযুক্ততা অর্জন করতে পারে, নতুবা অসম্ভব। আবার পরক্ষণে মেজাজি সালাতের প্রশ্নে মেজাজি জাকাতটি দেবার কথাটিও বোঝানো হয়েছে। এই সালাত এবং জাকাতের প্রচলনটি মহানবির সময় হতে শুরু হয়েছে বলে যারা প্রচার করেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করেন, বরং প্রথম নবি আদম শফিউল্লাহ (আ.) হতে মহানবি পর্যন্ত সালাত কায়েম এবং জাকাত আদায়ের কথাটি আমরা দেখতে পাই। আমরা *কোরান* হতে এটুকু জানতে পারি যে, যাদের হাকিকি সালাতটি কায়েম হয়ে গেছে তাদের কপালে একটি সালাত কায়েমের চিহ্ন অবশ্যই ফুটে উঠবে। এই চিহ্নটিকে আরবি ভাষায় 'সিমা' বলা হয়। আনুষ্ঠানিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মেজাজি মসজিদের ফ্লোরে কপালে ঘর্ষণ-খাওয়া কালো কহরগুলোকে যদি কেহ সালাত কায়েমের চিহ্নটি তথা সিমাটি ফুটে উঠেছে বলতে চায়, তা হলেও অধম লিখকের বলার কিছু নাই, কারণ যে যতুটুকু বোঝে সে ততটুকু বলে।

জাকাত আর সালাত কায়েম করার কথাটি বলেই আয়াতটি শেষ করা হয় নি, বরং 'এবং' শব্দটি যোগ করে বলা হলো : 'তোমরা রুকু করো রুকুকারীদের সাথে।' আরবি ভাষায় : 'ওয়ারকাউ মাআর রাকেঈনা।' 'রুকু করো রুকুকারীদের সাথে' কথাটির মধ্যেও একটি মেজাজি রুকু এবং অপরটি হাকিকি রুকু রয়ে গেছে। মহানবির আমল হতে ওয়াক্তিয়া সালাতের রুকু করা এবং রুকুকারীদের সাথী হবার কথাটি যদি ধরে নিই, তা হলে এই আনুষ্ঠানিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মহানবি মেরাজে গমন করে উম্মতদের জন্য তোহফারূপে উপহার পেয়েছিলেন। তা হলে অন্যান্য নবীদের অনুসারীরা যে রুকু করেছেন, সেই রুকুগুলো কেমন? এবং সেই রুকুগুলোর ধরন-ধারনটাই বা কেমন ছিলো? ইহা অধম লিখকের জানা নাই।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৩

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা বাকারার ৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে এবং তোমরা সবর (ধৈর্য) এবং সালাতের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করো। (*ওয়াসতায়িনু বিস সাবরে ওয়াস সালাতে*) এবং নিশ্চয়ই উহা আল্লাহতে ভীতগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য অবশ্যই বড় কঠিন (*ওয়া ইন্নাহা লাকাবিরাতুন ইল্লা আনাল খাশেঈনা*)।

ব্যাখ্যা

এবার আমরা একই সুরার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সামান্য কিছু বলতে চাই। এখানে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। সাহায্য চাওয়াকে আরবি ভাষায় 'নাস্তাইন' বলা হয়। কাহার সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে? বলা হয়েছে : মস্তানের সাহায্য চাও। আল্লাহ্‌র যতগুলো অধিক প্রিয় নাম আছে তার মধ্যে অধম লিখকের মতে প্রথমটি হলো 'কাহহার', দ্বিতীয়টি হলো 'জুলজালাল' এবং তৃতীয়টি হলো 'মস্তান'। ইহারও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

ধ্বংসের মাঝেই গড়ার স্বপ্নটি লুকিয়ে থাকে, কিন্তু আমার মনে হয় এই অর্থে ইহা ব্যবহার না করে প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি ঘটনা ঘটিয়ে উহাকে ধ্বংস করে দিয়ে যে নব-নবরূপে নিত্য চলমান গতিতে এগিয়ে চলছেন সেই চলার নামই জুলজালাল। তাই জুলজালালের পরেই কারামত্‌ওয়ালা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি ঘটনার উদ্ভব ঘটিয়ে সেই মুহূর্তেই সেই কোটি কোটি ঘটনাগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে এই ধ্বংস আর গড়ার প্রতিটি মুহূর্তের চলমান গতি যিনি ঘটাচ্ছেন তিনি নিঃসন্দেহে কারামতওয়ালা তথা ইকরাম। তাই তিনি *জুলজালালুহুল ইকরাম*। প্রতিনিয়ত ধ্বংস, প্রতিনিয়ত গড়ার খেলাটি খেলে অসীম গতিতে অসীমভাবে ছুটে চলছেন সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ জাল্লাশানাহুর এই রহস্যময় ব্যাখ্যাগুলো লিখতে গিয়ে চমকে যেতে হয়।

এখানে মস্তানের সাহায্যটি চাওয়া হয়েছে। খান্নাসরূপী শয়তানের বন্ধনের বলয় হতে যারা মুক্তিপথের সাহায্যকারী তাঁরাই গুরু, তাঁরাই পীর, তাঁরাই মুরশিদ। এই সাহায্য, এই খান্নাসরূপী বন্ধনের বৃত্ত হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যারা বিচলিত হয়ে পড়েন তাদেরকেই বলা হয় মুরিদ, ভক্ত ইত্যাদি। তাই

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

সালাত– তা সেই সালাত ওয়াক্তিয়াই হোক আর দায়েমিই হোক– সেই সালাতের সঙ্গে আরেকটি কথা যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, সেই কথাটির নাম সবর তথা ধৈর্য। কারণ সত্যসাগরে অবগাহন করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সালাতের মধ্যে তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ প্রচেষ্টার মধ্যে অবশ্যই ধৈর্যের প্রয়োজন। ধৈর্য বিহনে এই খান্নাসের বলয় হতে মুক্তিটি অসম্ভব। তাই এই সালাত প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টায় যারা নিয়োজিত থাকেন তারা অবশ্যই বিনয়ী। আগুন যেমন কাঠ জ্বালিয়ে ফেলে দেয়, অহঙ্কার আর উদ্ধত আচরণ মানবীয় গুণগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেয়। তাই বিনয়, আজিজি, নম্রতা যাদের মধ্যে নাই তাদের জন্য সুফিবাদ হারাম তথা খান্নাসের বলয় হতে মুক্তি পাবার সম্ভাবনাটি তাদের এই জনমে আর থাকে না।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৪

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা বাকারার ৮৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন আমরা বনি ইস্রাইল হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম যে (*ওয়া ইজ আখাজ্‌না মিসাকা বানি ইস্রাইলা*) তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও এবাদত করিবে না (*লা তাআবুদুনা ইল্লাল্লাহা*) এবং পিতামাতার সাথে এহসান (ভালো ব্যবহার) করো। (*ওয়া বিল ওয়ালেদাইনে এহসানান*) এবং নিকট আত্মীয় এবং ইয়াতীম এবং মিসকিনদের সাথেও (*ওয়াজিলকুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকীনে*) এবং মানুষদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলো (*ওয়া কুলু লিন্নাসে হুসনান*) এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো (*ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ জাকাতা*)। তারপর তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক ব্যতীত সবাই মুখ ফিরাইয়া নিলে। (*সুম্মা তাওয়াল্লাইতুম ইল্লা কালিলান মিনকুম*) এবং (প্রকৃতপক্ষে) তোমরা তো মুখ ফিরানোকারীই ছিলে (*ওয়া আনতুম মুরেদুনা*)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতেও সালাত কায়েম ও জাকাত আদায়ের কথাটি বলা হলো। সঙ্গে 'এবং' শব্দটি দিয়ে আরও কিছু কর্তব্য যোগ করে দেওয়া হলো। সালাত এবং জাকাত এবং বাবা-মায়ের প্রতি এহসানের দৃষ্টি তথা ভালো ব্যবহার তথা কর্তব্য পালন করার কথাটি বলা হলো। কিন্তু সর্বপ্রথমেই বলা হলো, আল্লাহ ছাড়া আর কারও এবাদত না করার। এবং যারা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ তাদের এবং এতিম ও মিসকিনদের সাথে ভালো ব্যবহার করা তথা *কোরান*-এর বর্ণিত ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলোকে অনুসরণ করা এবং তারপরেও আরেকটি উপদেশ দেওয়া হলো আর সেই উপদেশটি হলো, মানুষের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলা তথা কর্কশ, রূঢ় আচরণ, অহঙ্কার প্রদর্শন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে বলা হলো। তারপর বলা হলো, সালাত কায়েম করার কথাটি এবং জাকাত আদায়ের কথাটি। তারপর বলা হলো এই রকম কাজগুলো তথা আদেশ-উপদেশগুলো মান্য করার মানুষ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক ছাড়া সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলো। এখানে মুখ ফেরানোর অর্থটি হলো আনুষ্ঠানিকতার স্বীকৃতিটি

হয়তো আছে, কিন্তু হাকিকি কর্তব্যের স্বীকৃতিটি খুব কম লোকেই পালন করে চলে। ইহা সব যুগেই সব কালেই কমবেশি দেখা গিয়েছে এবং দেখা যায় এবং দেখা যাবেও।

আয়াতটির প্রথমেই বলা হয়েছে– একবচনে আল্লাহ বলেন নি, বরং বহু বচনের রূপটি ধারণ করে বলেছেন যে, আমরা বনি ইস্রাইল তথা ইহুদিদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম তথা ইহুদিরা আমাদেরকে (আল্লাহ) কথা দিয়েছিলো আমাদের (আল্লাহ) দেওয়া আদেশ-উপদেশগুলো মেনে চলবে। কিন্তু ইহুদিরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো। কথা দিয়ে কথা রাখে নি। এটা খুব বেশি একটা নূতন কথা নয়, কারণ ইসায়ি-মুসলমানেরাও একই রকম অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তথা কথা দিয়ে কথা রাখে নি, যে রকম ইহুদি-মুসলমানেরা করেছিলো। তাই মহানবির অনুসারীদেরকেও পূর্ব ইতিহাসের একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, যাতে ইহুদি-মুসলমানদের মতো, ইসায়ি-মুসলমানদের মতো মহানবির অনুসারী মুসলমানেরাও একই রকম পথে না যায় সেই জন্য বার বার সতর্ক করে দেওয়া হলো। অবশ্য আমরা অবাক হই, সেই পূর্ব হতে অনেকেই সব বিষয়গুলো বুঝেও জেনেও অবহেলার ভয়াবহ পরিণামটি যে কী হতে পারে তা জেনেও না বুঝবার, না জানবার ভান করে গেছে যুগে যুগে এবং আজও এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে।

কেন এ রকমটি হয়? কেন একই রকম ঘটনা বার বার ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, অনেক রঙ ও রূপ নিয়ে ঘটে চলছে, ঘটে চলবেও? এর কি কোনো প্রতিবিধান নাই? এইসব বিষয়ের মানসিক রোগীদের কি কোনো চিকিৎসা নাই? এইসব ঘোর দুনিয়াদার মানুষদের দুনিয়া নামক মাদকদ্রব্যের নেশায় ডুবে থাকা হতে মুক্তি পাবার হাসপাতালগুলো কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? কবে এদের চিকিৎসা চলবে? আনুষ্ঠনিক ধর্মপালনে ইহুদিদের তো খুবই একাগ্রতা প্রদর্শন করার ইতিহাস জানতে পারি। তা হলে ইহুদিদের এত আনুষ্ঠানিক এবাদত-বন্দেগিগুলো কেন বেকার বলে ঘোষণা করা হলো? অবশ্য কিছু লোক ছাড়া। ইহুদিরা তো আনুষ্ঠানিকভাবে এক আল্লাহ্‌রই এবাদত করতো, তারপরেও কেন বলা হয় এক আল্লাহ্‌র এবাদত-বন্দেগি হতে বিচ্যুতির কথাটি? ইহুদিরা তো কোনো কল্পিত মূর্তি বানিয়ে সেই মূর্তির পূজা করতো না। আসলে প্রতিটি মানুষের নফ্‌সের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন, সেই খান্নাসই দুনিয়ার লোভ-মোহতে ডুবিয়ে রাখে। একটি মানুষের নফ্‌সের সহিত খান্নাস যতদিন থাকবে ততদিন তার এবাদত-বন্দেগি আল্লাহ্‌র দরবারে পরিপূর্ণরূপে গৃহীত হয় না।

‘*লা-তা বুদুনা ইল্লাল্লাহ*’ তথা ‘না এবাদত করো না’ হুবহু অর্থে দুইটি না যোগ করে বলা হচ্ছে, ‘ইল্লাল্লাহ’। এখানে ‘ইলাহ’ বলতে কর্তা, নেতা, অধিকারী নামক বহু ইলাহ্-র কথা বলা হয়েছে। মাটি বা পাথরের বানানো ইলাহ-র কথা এখানে বলা হয় নি। যদিও মাটি ও পাথরে বানানো মূর্তিগুলো মেজাজি ইলাহ আবার অনেক সময় এই মেজাজি ইলাহগুলো মোটেও মেজাজি ইলাহ নয় তাদেরই জন্য যারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, যারা নাস্তিক, যারা কমিউনিস্ট, যারা ধর্মই মানে না, যারা ধর্মের কথা শোনা তো দূরে থাক, যারা ধর্মের ধার কাছ দিয়ে ঘেঁষে না।

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

এশিয়া-ইউরোপের বহু কমিউনিস্ট দেশে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাথরে-ব্রোঞ্জে বানানো বিশাল বিশাল মূর্তিগুলো দেখা যায়। অধম লিখক প্রশ্ন করেছিলাম, এই মূর্তিগুলো কেন আপনারা রেখেছেন? মুচকি হেসে আমাকে বললো : ভয় পাবেন না এই ভেবে যে আমরা মূর্তিপূজা করি। কারণ আপনি যে আল্লাহ্‌র পূজা করছেন সেই আল্লাহকে আমরা মানা তো দূরের কথা, বরং বলে থাকি, মানুষের সবচাইতে বিস্ময়কর আবিষ্কারটি হলো, মানুষ আল্লাহ আবিষ্কার করতে পেরেছে। অনেকেই হয় তো ভাবতে চাইবেন ইহা ভগবান রজনীশের কথা। না, মোটেই না। তিনিও এদের কাছ থেকে ধার করে নিয়ে নূতন ভাষায় অলঙ্কার দিয়ে একটু সুন্দর করে বলেছেন। এখন চিন্তা করুন তো, যে-আল্লাহই অধম লিখকের পুঁজি, যে-আল্লাহ্‌র রহস্য জানার জন্য অধম লিখক সেইদিনের টাকায় লক্ষ লক্ষ টাকার বই ক্রয় করেছি। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই ছিলো যে বই সংগ্রকারীদের মধ্যে আমাকে চতুর্থ স্থানটি দিয়েছিলো। কত বই সংগ্রহ করতে পারলে সমগ্র বাংলাদেশে সংগ্রহকারীদের মধ্যে চতুর্থ স্থানে নামটি দিতে পারে? দ্বিতীয়-তৃতীয় স্থানটি যাঁরা পেয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা জানা থাকলেও বললাম না, কিন্তু প্রথম স্থানটি যিনি অর্জন করেছেন তাঁর নামটি অকপটে পাঠকদের জানিয়ে দিলাম। তাঁর নাম রুহুল আমিন নিজামী। চট্টগ্রামের মীরের সরাইয়ের অধিবাসী।

কেন এতগুলো প্যাঁচাল পারলাম? এত লেখাপড়া করার পরও ওই কমিউনিস্ট দেশের নাস্তিকেরা যে পথের মোড়ে মোড়ে মূর্তি দাঁড় করিয়েও মুর্তিপূজা তো দূরে থাক বরং আল্লাহকেই অস্বীকার করে, সে কথাটি শুনে কে না অবাক হবে? আসলে মূর্তি সামনে থাকলেই মূর্তিপূজা হয় না। দিলের ভিতরে, অন্তরের অভ্যন্তরে, নফ্‌সের সঙ্গে খান্নাস যে অনেক রকম লোভ আর মোহের মূর্তিগুলো পূজা করাচ্ছে এবং মনের অজান্তে পূজা করে চলছি এটাই হলো আসল মূর্তিপূজা, এটাই হলো হাকিকি মূর্তিপূজা।

‘আউজুবিল্লাহে মিনাশ শায়তোয়ানের রাজিম’ তথা ‘পাথরের আঘাত-খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাই’ বাক্যটি এক হাজারবার মুখে পড়লেও শয়তান আপনাকে মোটেই ছেড়ে দেবে না। কারণ মুখের পড়াটি হলো মেজাজি আর তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবাটি হলো হাকিকি।

অধম লিখক একজন হোমিও ডাক্তার। লজ্জা বা অহংকার ফেলে বলছি, আমাকে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথ বলা হতো। অভিজ্ঞতায় নারায়ণগঞ্জের নিতাইগঞ্জ নামক একটি বাজারের এক কোটিপতি দোকানদারকে সিগারেট খেতে মানা করেছিলাম। উনি একটার পর একটা সিগারেট খেতেন। ওনার নাম ছিলো রফিক। আমাকে মামা বলে ডাকতেন। ওনাকে সিগারেট খেতে মানা করলাম। বললাম: ‘মামা লাংস্ ক্যানসারও হতে পারে।’ উনি দাঁত খিচুনি দিয়ে আমাকে বললেন, ‘জীবনে যে সিগারেট খান নি, তার কেন লাংস্ ক্যানসার হয়?’ আমি কিছুক্ষণ নীরব থাকাতে তৃপ্তির হাসি দিয়ে আরামে সিগারেট টেনে চললেন। তারপর বললাম, ‘মামা, দুই ঘণ্টা দশটি মানুষ বৃষ্টিতে ভেজার পর দেখা গেল সাতজনের ঠান্ডা লেগেছে, কিন্তু তিনজনের লাগলো না কেন?’ বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি বললেন, ‘মামা রে, সিগারেট আমি খাই না, সিগারেটই আমাকে খেয়ে ফেলেছে।’ মাত্র তিন বছর পরে তার ছোট ভাইয়ের হাত ধরে জীর্ণ-শীর্ণ মামা রফিক, গলার মধ্যে একবস্তা তাবিজ-

তুম্বা ঝুলছে, ডিসপেনসারিতে আসলেন এবং বসলেন। লাংস্ ক্যানসারে যে উনি আক্রান্ত এটা উনি জেনে গেছেন। কিন্তু শেষ অবস্থায় যে অবস্থান করছেন সেটা হয়তো উনি জানেন না। আমি প্রচন্ড মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললাম : 'মামা আপনার কিছুই হয় নি। যে ডাক্তারেরা বলেছে ওরা এখনও ডাক্তারই হতে পারে নি। ওই রকম ১০/১৫টা ডাক্তার পকেটে নিয়ে আপনার মামা চলে।'– ইত্যাদি ইত্যাদি। মামা ভীষণ খুশি। চোখে মুখে জীবনের আলো ফুটে উঠলো। ওষুধ চাইলো। বললাম, 'ডাক্তারেরা যে ওষুধ দিয়েছেন তা ২১ দিন খাবার পর আমি সব ওষুধ আপনার ছোট ভাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।' ১৯ দিনের মাথায় মৃত্যুশয্যায় মৃত্যুর একটু আগে 'জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীর' বলে কেবল ডাকলেন। এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে আমার নামটি কেবল ছিলো। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, মর্মাহত হয়েছিলাম। স্মৃতিতে হয়তো লক্ষ লক্ষ রোগীর কথা কোনোদিনই মনে থাকবে না, কিন্তু এই বেদনাদায়ক স্মৃতিটি আজও আমি ভুলতে পারি নি।

সুতরাং যারা মাদক দ্রব্যের নেশার মধ্যে ডুবে আছে বা থাকে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া আর না দেওয়া সমান, বরং বকুনি ও মার খাওয়ার সম্ভাবনাটি থাকতে পারে। তাদেরকে সৌদি আরবের মতুয়াদের মতো জোর করে নিয়ে নেশা হতে মুক্তি পাবার হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। যেমন সৌদির মতুয়াদের কে নামাজ পড়লো না, কে রোজা রাখলো না এদেরকে ধরার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ***প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে কত রকম যে আশার মূর্তি ভেসে আছে সেইগুলোকেই 'ইলাহ' বলা হয় তথা মনের কর্তা বলা হয়।*** তাই এই মুর্তিগুলো তথা এই 'ইলাহ'গুলো বহু তথা অনেক তথা 'ইলাহা'। ***এই ইলাহগুলোকে ধ্যানসাধনা, মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে তাড়িয়ে দিলে তথা খান্নাসকে তাড়িয়ে দিলে আপন স্বরূপে আল্লাহ অন্তরটিকে তথা নফ্সটিকে গ্রাস করে ফেলেন। তখনই এক ইলাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাকেই ইল্লাল্লাহ বলা হয়।*** সেই ইল্লাল্লাহ্র জাগ্রত রূপটি যখন সাধকের ভিতরে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে পড়ে সাধক তখন নির্বাক হয়ে যান। কিছু একটা উপদেশ যখন সাধক দিতে থাকেন তখন খান্নাসওয়ালা মানুষগুলো কখনও গ্রহণ করে, কখনও গ্রহণ করে না। এ এক আজব খেলা। এই আজব খেলার অঙ্কের নিয়মে আগামাথা পাওয়া যায় না। যদিও অঙ্কের নিয়মটি অবশ্যই আছে।

খান্নাসই লোভ আর মোহের গুরুঠাকুর। এই খান্নাসই পবিত্র নফ্সটিকে কুমন্ত্রণা আর কুবুদ্ধি দিয়ে লোভ-মোহের বিষয়ে জর্জরিত করে ফেলে। এই খান্নাসওয়ালা মানুষগুলোকেই যিশুখ্রিস্ট মানুষের চেহারায়, মানুষের সুরতে, মানুষের নকশায় অসুর বলেছেন। আর খান্নাসমুক্ত নফ্সের অধিকারী মানুষগুলোকেই দেবতা বলা হয়েছে। সেমিটিক ধর্মগুলোতে নবি-রসুল আর ওলিদের অধিকাংশই পুরুষ। কিন্তু হিন্দুধর্মের তেত্রিশ কোটি অবতার- মুনি-ঋষিদেরকে দেব-দেবী বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে রমণীদেরকেও অবতাররূপে আমরা দেখতে পাই, যা সেমিটিক ধর্মগুলোর মধ্যে দেখতে পাই না। আবার হিন্দু ধর্মে বৈষয়িক সম্পদ বণ্টন করে দিবার প্রথাটি এবং আরও কিছু জটিল বিষয় নারীদের বেলায় মোটেও দেখতে পাই না। অবতারের রূপে নারীকে পরম মর্যাদাটি হিন্দুধর্ম দিয়ে গেছে, আবার

পরক্ষণে নারীদের সামাজিক জীবনে সম্পদের অধিকার হতে বঞ্চিত করার দৃশ্যগুলো দুঃখজনক হলেও দেখতে হয়। পক্ষান্তরে সেমিটিক ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র মহানবির ইসলামে নারী এবং পুরুষকে মোটেই সমান মর্যাদা দিয়ে যায় নি। অনেকেই সমান মর্যাদার ধুঁয়া তুলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে চায়, কিন্তু আসলে নারীর মর্যাদা ১০০ ভাগের মধ্যে ৭৫ ভাগ এবং পুরুষের মর্যাদা মাত্র ২৫ ভাগ। আমরা নারীকে মহানবির ইসলামে নবি-রসুলরূপে দেখতে পাই না সত্যি, কিন্তু নারীর পদতলেই সন্তানদের বেহেশত কথাটি দেখতে পাই। মহানবির ইসলামে নারীকে যৌতুক দিয়ে বিবাহ করতে হয়। ইহা মধ্যপ্রাচ্যে যারা গিয়েছেন তারা সবাই কমবেশি জানেন। অথচ আমাদের মতো গরিব মুসলমান দেশগুলোতে যৌতুক প্রথাটি ঠিক তার উল্টো। মহানবিকে এক মহান সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন, সবচাইতে সম্মানীয় কে? সাহাবা চারবার প্রশ্ন করেছিলেন, মহানবি তিনবার মা এবং পরে বাবার কথাটি বলেছিলেন।

যখন নিজেকে খান্নাসমুক্ত করতে পারেন তখনই সাধক বলে ফেলেন, *‘আনাল হক’* তথা ‘আমিই সত্য।’ তখনই জোনায়েদ বোগদাদি বলে ফেলেন, *‘লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহতাআলা’* অর্থাৎ ‘এই জোব্বার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নেই।’ ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি বলে ফেলেন, *‘আনা সুবহানি মা আজিমুশশানি’* তথা ‘আমিই সুবহানি সব শান আমারই।’ যুগে যুগে একই ধর্মের অনেক নবি-রসুলের আগমনের অনেক পরেও, অনেক নবি-রসুলের একই কথা প্রচার করা সত্ত্বেও, মানুষরূপী অসুরেরা অসুরই রয়ে গেল। এবং যাঁরা আল্লাহ জাল্লা শানাহু-র পথে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁরা অনেক রকম নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, ইহা অধম লিখকের কথা নয়, বরং ইহা ইতিহাসের একটি তিক্ত রায়।

এখানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা এ জন্যই করলাম যে অধিকাংশ মানুষ ভুল করে বসে, আর সেটা হলো পবিত্র রেজেক। *‘কুলু মিন তাইয়েবাতে মা রাজাকনাকুম’* অর্থাৎ ‘পবিত্র হইতে উপভোগ করো আমরা যে রেজেক তোমাদেরকে দিয়াছি।’

মেজাজি পবিত্র রেজেকটি হলো– খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য বিষয়বস্তু যাহা আমরা গ্রহণ করি তাহা তিন ভাগে ভাগ করা যায় : হারাম, হালাল এবং পবিত্র। যাহা ভোগ করতে মানা করা হয়েছে উহা হারাম, আর যাহা মানা করা হয় নি উহা হালাল। পবিত্র রেজেক বলতে এখানে আল্লাহ্‌র জাত-নুরে নুরময় করা বোঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহ্‌র ‘জাত’-নুর লা-মোকাম ছাড়া একমাত্র জিন ও মানুষের অন্তরের কাছেই ‘জাত’-রূপে অবস্থান করছেন। সুতরাং নফ্‌স যখন খান্নাসমুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র ‘জাত’-নুরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন, আপন পীরের নির্দেশিত নির্জন ধ্যানসাধনা ও মোরাকাবার মাধ্যমে, ইহাকেই বলা হয় পবিত্র রেজেক এবং ইহা আল্লাহ ‘আমি’-রূপ ধারণ না করে ‘আমরা’-রূপ ধারণ করে দান করেন।

একটি মহাপাপিষ্ঠ মানুষ যদি হালাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তাতে সে ওলি হয় না। আল্লাহ্‌র সাধারণ দানের মধ্যে হালাল-হারাম থাকতে পারে, কিন্তু ইহাতে কোনো বুজুর্গি বা শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য

নাই। হালাল সাবান দিয়ে গোসল করলেই বুজুর্গি পাওয়া যায় না, তবু মেজাজি অর্থে হালালকে হালালই বলতে হবে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর সেই বিষয়টি হলো, আল্লাহ *কোরান*-এ যতবার রেজেক দেবার কথাটি বলেছেন, ততবারই 'আমি' তথা একবচনে রেজেক বণ্টনের কথাটি বলা হয় নি, এখানে বহুবচন তথা 'আমরা'-রূপ ধারণ করে আল্লাহ রেজেক বণ্টন করেন। অধম লিখকের পনের পারা *কোরান*-এর অনুবাদ করতে গিয়ে মোল্লা-মুরিদদের সাহায্য নেওয়াতে 'আমরা'-কে আমি করে ফেলা হয়েছে। হয়তো ব্যস্ততার করণে উহা লক্ষ্য করতে পারি নি, কিন্তু পরের সংস্করণে নিজে দেখেই করতে হবে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা বাকারার ১১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং তোমরা সালাত কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর (*ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ জাকাতা*) এবং তোমাদের নফ্সের জন্য যাহা আগে হইতে পাঠাইবে উহাই অনেক ভালো। তোমরা (উহা) আল্লাহ্‌র নিকট পাইবে। (*ওয়ামা তুকাদ্দেমু লে আনফুসিকুম মিন খাইরীন তাজেদুহু এনদাল্‌লাহে*)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কর্মের বিষয়ে নিজের চোখে দেখেন। (*ইন্নাল্লাহা বেমা তামালুনা বাসিরুন*)।

ব্যাখ্যা

কোরান-এর সুরা বাকারার ১১০ নম্বর আয়াতটিতে আল্লাহ মারাত্মক একটি কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন আর সেই কথাটি হলো : বাকিতে কিছু পাবার কথা এখানে বলা হয় নি। বাকির নাম যে ফাঁকি এই আয়াতে সেটাও আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের নফ্সের জন্য যাহা কিছুই আগে থেকেই অর্জন করতে পারবে উহা তোমাদের জন্য খুবই ভালো। ভালো তখনই যখন আল্লাহ্‌র মনোনীত বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র নামে অর্জন করতে পারবে তথা পাঠিয়ে দিতে পারবে। এখানে নফ্সের অর্জন করাটাই আগে পাঠিয়ে দেওয়া বুঝানো হয়েছে। তাই উহার ফলাফল তথা ভালো-মন্দ– এবং বিশেষ করে এখানে ভালোটাই বলতে চাই– উহাই আল্লাহ্‌র নিকট পাবে। ইহা মরণের পরে পাওয়া বুঝানো হয় নি। কারণ মরণের পরে পাওয়াটাই একদম বাকি। এবং বাকির নাম ফাঁকি। এই মরণ মেজাজি মরণ, এই মরণ নফ্সের মেজাজি মরণ। কারণ মরণ দুই প্রকার : একটি মেজাজি মরণ, অপরটি হাকিকি মরণ। ***মেজাজি মরণ দেহত্যাগের মরণ, হাকিকি মরণ খান্নাসত্যাগের মরণ। তাই খান্নাসত্যাগের মরণকেই বলা হয়েছে, 'মুতু কাবলা আনতা মুত' তথা 'মরার আগে মরে যাও।'*** মেজাজি মরণের আগে হাকিকি মরণ বরণ করে নাও। তথা খান্নাসমুক্ত নফ্সটি কেমন করে অর্জন করা যায়, কেমন করে ধ্যানসাধনা, মোরাকাবার মাধ্যমে খান্নাসমুক্ত নফ্সের অধিকারী হওয়া যায় তথা মরার আগে মরে যাওয়া যায় তা শিখে নাও। তা হলেই আল্লাহ্‌র পুরস্কারটি পাবার কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে।

খেয়াল করুন, নফ্‌স হতে খান্নাসত্যাগ করার কথাটি বলা হয়েছে। খেয়াল করুন, রুহ হতে খান্নাসত্যাগ করার কথাটি বলা হয় নি। অথচ রুহ আমার শাহারগের নিকটেই আছেন। এখানে এসেই অনেকেই তালগোল পাকিয়ে নিজের ভুলে নিজেই জড়িয়ে পড়েন। এবং ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সহজ-সরল মানুষগুলোর পথগুলোকে আঁকাবাঁকা করে দেয়। খেয়াল করুন, নফ্‌সকে মরার আগে মরতে বলছে, তথা 'মুতু *কাবলা আনতা* মুত।' খেয়াল করুন, রুহকে মরার আগে মরার কথাটি বলা হয় নি। কেন বলা হয় নি? রুহ জন্মগ্রহণ করলে তো মারা যাবার প্রশ্ন আসে। নফ্‌স জন্মগ্রহণ করে, তাই মারা যাবার প্রশ্নটি আসে। নফ্‌স ঘুমায়, রুহ ঘুমায় না। নফ্‌স লোভ-মোহের ফাঁদে পড়ে যায়, আর রুহের বেলায় লোভ-মোহের ফাঁদের প্রশ্নই উঠে না। তাই *কোরান*-এ একটি বারও বলা হয় নি যে রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, বরং বলা হয়েছে নফ্‌স তথা প্রাণ তথা জীবাত্মা মৃত্যুর স্বাদটি গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে এইসব ঝুটঝামেলা আজে-বাজে সব রকম ফাং ফুং হতে রুহ সম্পূর্ণ মুক্ত। কারও যদি খান্নাসমুক্ত নফ্‌সটি অর্জন করার অদম্য ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে তা হলে তাকে সালাত কায়েম করতে হবে তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টাটি চালিয়ে যেতে হবে তথা আল্লাহ্‌র সংযোগ প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। এবং যেইমাত্র সালাতটি কায়েম হয়ে যাবে তথা যোগাযোগটি স্থাপিত হয়ে যাবে তখনই একটি নফ্‌স জাকাত দিতে পারে। এর আগে জাকাত দেওয়া একটি নফ্‌সের পক্ষে অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, মেজাজি জাকাত তথা মালের জাকাত যে কেহ অনায়াসে দিতে পারবে। মালের জাকাত দেবার প্রশ্নে অনেকে সালাতের খুব বেশি একটা ধার ধারে না। অথচ সুন্দর মালের জাকাত দিয়ে যাচ্ছে! এই মালের জাকাতকেই মেজাজি জাকাত বলা হয়। আর হাকিকি জাকাত হলো, খান্নাসমুক্ত নফ্‌স যখন আল্লাহ্‌র রহস্যলোকের দর্শন পায় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জাকাত দেবার যোগ্যতা অর্জন করে।

এই হাকিকি জাকাতটি দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। ইহা কোনো মামুলি বিষয় নয়। ইহা ক্যালকুলেটর মেশিনে মাথা খাটিয়ে মালের জাকাত দেওয়া নয়। ইসলামের কোনটা মেজাজি আর কোনটা হাকিকি ইহা না বুঝতে পারলেই যত রকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এই ফেরকাবাজি হতেই লাঠালাঠি, মারামারি, খুনাখুনি পর্যন্ত হতে দেখি এবং ইনশাল্লাহ আরও দেখতে হবে।

যেহেতু মানুষের নফ্‌সের সঙ্গে আল্লাহ রুহরূপে শাহারগের নিকটেই আছেন তাই সব কিছু প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র দেখাটা খুব বেশি একটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। আমরা আল্লাহকে সাত আসমানের উপরে তথা লা-মোকামে বসিয়ে রাখি, তাই *কোরান*-এর যত আজেবাজে তফসির, *কোরান*-এর 'আলুজালু মিরকাবালু'–মার্কা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দেখতে পাই।

মহানবি হেরাগুহায় পনেরটি বছর কেন একাকী একদম নির্জনে ধ্যান-সাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদাটি করলেন? এই ধ্যানসাধনাটি মোটেও মহানবির জন্য নহে, বরং তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেবার জন্য। যদি কেহ মনে করে– এই ধ্যানসাধনা মহানবির জন্যই, তা হলে আমি অধম লিখক তাহাকে ১০০% কাফের বলে ফতোয়া দিতে চাই। মহানবি তাঁর উম্মতদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে

বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন এই বলে যে : দ্যাখো, *কোরান* নগদই পেলাম, বাকিতে নয়; জিবরাইল আমিনের দেখাটি নগদই পেলাম, বাকিতে নয়; রেসালত, নবুয়ত, বেলায়েত এবং আবদিয়াত এই চারটি নগদই পেলাম, বাকিতে নয়।

নবি জাকারিয়ার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলো খানকার একটি রুমে তথা কক্ষে ওলি মা মরিয়ম ধ্যানসাধনা করে যে অসময়ের ফল (আনসিজনাল ফ্রুট) পাইতেন উহা দেখে নবি জাকারিয়া নিজেই চমকে যেতেন। নবি জাকারিয়া (আ.) ওলি মা মরিয়মের ধ্যানসাধনার কক্ষটির দোহাই দিয়ে আল্লাহ্‌র পাক দরবারে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান চাইলেন এবং আল্লাহ তা দিলেন। এই কথাগুলোর মধ্যে অনেক রকম রহস্য লুকিয়ে আছে যাহা মোটেই কাগজ-কালিতে লেখা যায় না। যেমন বলতে পারেন নি আসহাবে সুফ্‌ফার জলিল কদরের সাহাবা হজরত আবু হুরায়রা (রা.), যেমন বলে যেতে পারেন নি মহানবির চাচা ইবনে আব্বাস (রা.), যেমন বলে যেতে পারেন নি জলিল কদরের সাহাবা হজরত হুজায়ফা (রা.), যেমন বলে যেতে পারেন নি জলিল কদরের সাহাবা হজরত আবু জর গিফারি (রা.) এবং আরও অনেকে। আল্লামা ইকবাল বলেছেন : তোমার এই দেহটিতে যা আছে, তা আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। তোমার এই দেহটি মেরাজে যাবার বোরাক। তোমার এই দেহটি আল্লাহ্‌র সব রহস্যের মূল ভান্ডার এবং এটাই যদি খেয়াল করতে না পারো তা হলে কিছুই পাবার আশা করা যায় না। পশ্চিমা লেখকদের মধ্যে যারা মহানবির ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন তাদের মধ্যে জর্জ বার্নার্ড শ অন্যতম। সেই জর্জ বার্নার্ড শ-ই বলে গেছেন যে, যাদের আল্লাহ কেবলমাত্র আসমানেই থাকে তারা বড়ই ভয়ঙ্কর, তাদের থেকে যত দূরে থাকতে পারো ততই মঙ্গল।

যারা মেজাজি মরণের পর আল্লাহ্‌র মেজাজি পুরস্কার পাবার কথাটি বলে বেড়ান তাদেরকেও দোষ দিতে নাই। কারণ কয়েকটি কেয়ামতের মুখোমুখি হবার পরেই হাকিকি বিষয়গুলো ধরা দিতে থাকে। সুতরাং সবার উপলব্ধি ও দর্শনের ব্যাপ্তি কখনই সমান হয় না। তাই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ্‌র বড় বড় ওলিরা কখনও বলেছেন : তকদিরের খেলা, কখনও বলেছেন : আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দাও। কিন্তু মহানবি তাঁর নিজের জন্য ধ্যানসাধনা করেছেন বলে যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র সব ওলিরাই বিনা বাক্যে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। নবি হবার শর্তটি যে এলমে গায়েব জানতে হবে সেটা কাট্টা কাফের আবু জাহেলও জানতো। তাই হাতের ছোট পাথরের কণাগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে মহানবিকে বলেছিল, 'আমার হাতের ভিতরে কী আছে?' মুষ্টিবদ্ধ করার অর্থই হলো এলমে গায়েব জানার দলিল। এবং এলমে গায়েব জানাটি হলো নবি হবার একটি শর্ত। আবু জাহেলের মতো কাফের নবি হবার শর্তটি এলমে গায়েব জানতেই হবে বলে যেখানে বিশ্বাস করতো, সেখানে ওহাবি ফেরকা, বাটালভি ফেরকা এবং চক্রালভি ফেরকার অনুসারীদের অবস্থানটি আবু জাহেলের চেয়েও যে নিচে, অঙ্কের হিশাবে ইহা পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা বাকারার ১২৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন আমরা ঘরটিকে (কাবাকে) মানুষদের জন্য ঘাঁটি (মিলনকেন্দ্র) এবং নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্বাচন করিলাম (*ওয়া ইজ জাআলনাল বাইতা মাসাবাতান লিন্নাসে ওয়া আমনান*) এবং মাকামে ইব্রাহিমকে মুসাল্লা (সালাতের স্থান) রূপে গ্রহণ করিতে বলিলাম (*ওয়াত্তাখেজু মিন মাকামে ইব্রাহিমা মুসাল্লা*) এবং আমরা ইব্রাহিম এবং ইসমাইল হইতে তওয়াফকারী এবং এতেকাফকারী এবং রুকু সেজদাকারীদের জন্য আমার ঘরটিকে পবিত্র রাখার জন্য অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম (*ওয়া আহেদনা ইলা ইব্রাহিমা ওয়া ইসমাঈলা আন তাহ্হেরা বাইতিয়া লিত্তায়েফিনা ওয়াল আকেফিনা ওয়ার রুক্কে ইসসুজুদে*)।

ব্যাখ্যা

কোরান-এর এই আয়াতটি দিয়ে প্রথমেই একটি বিষয় প্রমাণিত করা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত সাহিত্যকর্ম একত্রিত করলেও এই আয়াতটির ভাষা ও শৈলীর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারীরা এবং দুনিয়ার বৈষয়িক জ্ঞানের অধিকারীরা আমার এইরূপ মন্তব্যে হয়তো মুচকি হেসে যা-তা একটা কিছু বলতে চাইবে এবং এ রকম কিছু একটা যে বলতে চাইবে ইহা বিদ্যাশিক্ষার কর্মফল হতেই অভিজ্ঞতাটি অর্জন করেছি। ভূতের দেশে কিছুদিন বাস করলেই পেত্নীদের চালচলন জ্ঞানবিদ্যার রঙ-ঢঙগুলো পরিষ্কার বোঝা যায়। কেন এতগুলো কথা বললাম? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ থাকতে পারে। আর সেই কারণটিই হলো, *কোরান* মেজাজি কাবা এবং হাকিকি কাবার সমন্বয়ে যে আয়াতটি নাজেল করেছেন তাকে মেজাজি অর্থেও গ্রহণ করা যায় আবার হাকিকি অর্থেও গ্রহণ করা যায়। তবে এই আয়াতের মূল বিষয়বস্তুটিতে হাকিকি কাবার কথাটিই বলা হয়েছে। কিন্তু মেজাজি কাবার অবস্থানটিকে অস্বীকার করলে কাবার মূর্তরূপটি আর থাকে না। মেজাজি কাবার মূর্তরূপটি আছে বলেই প্রতিবছর মেজাজি হজের বিরাট আয়োজন করা হয়। এখান থেকেই আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হাকিকি কাবার পরিচয়টি যে লুকিয়ে আছে উহা ধরতে পারে। অবশ্য শরিয়তের দৃষ্টিতে অধম লিখক মেজাজি কাবার মূল্যায়নটি বেশি করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ মূর্ত না থাকলে বিমূর্তের পরিচয় ধরা যায় না। মানবদেহ আছে বলেই নফ্‌সের পরিচয়টি বোঝা যায়। মোহরমের মাতম আছে বলেই কারবালার বিষাদময় ঘটনা এবং রসুলের আওলাদদের শহিদ হবার ঘটনা এবং বিশেষ করে শহিদে আজম ইমাম হোসেইন আলাইহেস সালাতুস্ সালামের ঘটনাটি প্রতিবছর মনে করিয়ে দেয়। প্রতিবছর মনটিকে বেদনায় ডুবিয়ে দেয়। যদি মোহরমের মাতমের ঘটনাটি না থাকতো তা হলে আওলাদে রসুলদের কারবালায় নির্মম শহিদ হবার ঘটনাগুলো কেবল ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকতো অথবা ফিল্ম বানিয়ে ছবি দেখানো যেত। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই মেজাজি কাবার মেজাজি হজটিকে খাটো করে দেখার অবকাশ নাই।

অধম লিখক ধরে নিলাম, এই ব্যাখ্যাটি তথা এই কথাগুলো মেজাজি কাবার জন্যই বলা হয়েছে। সেই কথাগুলো কী? হজরত হাসান বসরি বলেছেন : হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.)-

কে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নির্দেশটি হলো, কাবা ঘরটিকে দুনিয়ার বস্তু ও আবর্জনা হতে পবিত্র রাখা। সাঈদ ইবনে জরির বলেছেন যে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেন : *আন্ তাহেরান বাইতি* অর্থাৎ ঘরটিকে পবিত্র রাখো। এই 'পবিত্র রাখো' কথাটির দ্বারা কোনো কোনো তফসিরকারী মূর্তি হইতে পবিত্র রাখার কথাটি বলেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় : ইহা কি মাটি-পাথরের মূর্তি, না লোভ-মোহের দ্বারা তৈরি বিমূর্ত মূর্তি? যদি কেউ বলেন, ইহা মাটি-পাথরের মূর্তি, তা হলে ঠিক আছে; আবার কেহ যদি বলেন, ইহা লোভ ও মোহের দ্বারা নির্মিত বিমূর্ত মূর্তি, ইহাও ঠিক আছে। এই 'আন্ তাহেরান বাইতি' যাহা হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইহার অনেক রকম ব্যাখ্যা দেখতে পাই। অনেকেই বলেছেন : মূর্তি, পাপকর্ম, পাপকথা, মিথ্যা এগুলো থেকে ঘরটিকে পবিত্র রাখতে হবে। আবার অনেকে এই কথাটির উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা লিখেছেন যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহর স্থান নাই এ রকম ব্যাখ্যাটিও করেছেন। কারণ আল্লাহ্‌র ঘরে অন্য ইলাহ অবস্থান করলে শেরেক হয়ে যায় তথা অংশীদারিত্বের কথাটি মেনে নেওয়া হয়। অনেকে বলেছেন, আল্লাহ্‌র ঘরে কোনো মূর্তিরই থাকার স্থান হতে পারে না। সবচেয়ে যে বড় মূর্তিটি উহার নাম লোভ-মোহ তথা লাত্-মানাত।

হাকিকি কাবার কথাটি বলতে গেলে কাবাকে মানব দেহ এবং কলবের প্রতীক করা হয়েছে। মানব দেহটি নিরাপত্তাহীন। কারণ নফ্‌সের সঙ্গে খান্নাস আছে। খান্নাস থাকলেই মানব দেহঘরটি নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। এই মানব দেহের ভিতরে যে কল্‌ব নামক গোশতের টুকরা আছে উহা তখনই সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে যখন খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করে। যখন মানব দেহের এই কল্‌ব নামক গোশতের টুকরা হইতে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন সমস্ত মানব দেহ নামক কাবাটি পবিত্র হয়ে যায় আর খান্নাস থাকলে মানব দেহটি অপবিত্র হয়ে যায়। ***এই খান্নাসরূপী শয়তানই মানব দেহের অভ্যন্তরে কল্‌ব নামক স্থানে অবস্থান করে লোভ-মোহ নামক অনেক মূর্তির পূজা করায় এবং ঐ মূর্তিপূজা করাটিকেই বলা হয় শেরেক করা।*** সুতরাং শেরেক ভিতরের বিষয়, বাহিরের বিষয় নয়। খান্নাসমুক্ত মানব দেহটির অধিকারীরাই জগতগুরু, জগতপীর, জগত মুরশিদ, জগত সাঁই বাবা। হজরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হজরত ইসমাইল (আ.) জন্ম হতেই আজন্ম খান্নাসমুক্ত। কারণ তাঁরা নবি, তাঁরা জগত নামক বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। তাই 'তাঁহার মোকাম' তথা ইব্রাহিমের মোকাম তথা তাঁহার মর্যাদার স্তরের দিকে অগ্রসর হবার অনুশীলন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশের মূল বিষয়টি হলো সালাত তথা যোগাযোগ তথা সংযোগ। মোকামে ইব্রাহিম-কে মুসাল্লারূপে গ্রহণ করো– এরূপ কথাটি না বলে ইব্রাহিমের মোকাম হতে মুসাল্লা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসাল্লা শব্দটির অর্থ হলো সালাতের অবস্থান অথবা আসন, যে– আসন বা অবস্থান হতে সালাত নামক যোগাযোগের মাধ্যমে ধ্যানসাধনাটি করতে হয়। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর উচ্চতম মর্যাদার সালাতের যে উচ্চতম স্থান উহাকে মুসাল্লারূপে সহসা কেহই গ্রহণ করে নিতে পারবে না। এ জন্যই 'উহা হইতে আসন' গ্রহণ করবার নির্দেশটি দেওয়া

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

হয়েছে। এখন যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সেইরূপ মর্যাদা হতেই ততটুকু গ্রহণ করে নিতে পারবে। আরও একটি কথা থেকে যায় আর সেটা হলো, এই পথের পথিক হতে না চাইলে কাউকে খান্নাসমুক্ত করা যায় না।***'তওয়াফকারী' বলতে আত্মদর্শনের খান্নাসমুক্ত অনুশীলনকারীসাধকদেরকেই বোঝানো হয়েছে। তওয়াফ করতে করতে যখন খান্নাসমুক্ত হয়ে পড়েন তখন অনুশীলনকারী দেখতে পান যে তিনি জীবন্ত একটি কাবা।***

সেজদায় পৌঁছুবার জন্য রুকু করার অর্থটি হলো খান্নাসকে কলব হতে মুক্ত করার বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অনেকটা উপমার ছলে বলছি, সৈনিকদের আদর্শ সৈনিক হবার জন্য যে রকম অনেক সহজ ও কঠিন অনুশীলন করে যেতে হয়, সেই রকম রুকু-সেজদার মাধ্যমে খান্নাসকে তাড়াবার অনুশীলন করতে হয়। তবেই হাকিকি কাবার পরিচয়টি লাভ করা যায়। এই লাভ নগদ লাভ। এই লাভ বাকিতে নয়। কারণ বাকির নাম ফাঁকি। মেজাজি হাজিদের জন্য বাকিতে পাবার কথাটি খাটে, তবে ইহা ফাঁকি নয়; কারণ অনুশীলনের মর্যাদা অনুযায়ী দু'য়েকটি কেয়ামত দর্শনের পরই আত্মদর্শনটি হয়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা বাকারার ১৫৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে তোমরা যাহারা ইমান আনিয়াছ! আমাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হও, সবর (ধৈর্য্য) এবং সালাতের সাথে (মাধ্যমে)। (*ইয়া আইয়্যুহাল লাজিনা আমানুসতাঈনু বিস সাবরে ওয়াস সালাতে*)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের (ধৈর্যশীলদের) সাথেই থাকেন (*ইন্নাল্লাহা মাআস সাবেরিনা*)।

ব্যাখ্যা

ছোট্ট তিনটি আয়াত। ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গভীর। গভীরের চেয়েও অনেক বেশি গভীর। প্রথমেই আল্লাহ বলছেন : হে আমানুরা তথা হে ইমানদারেরা, তথা যারা ইমান এনেছে কেবল তাদেরকেই আল্লাহ বলছেন। এখানে মানবজাতিকে উল্লেখ করে বলা হয় নাই, তথা 'ইয়া আইউহান নাস' বলা হয় নাই। এখানে মুসলমানদের উদ্দেশ করে বলা হয় নি, তথা 'ইয়া আইউহাল মুসলেমুন' বলা হয় নি। এখানে মোমিনদের উদ্দেশ করে বলা হয় নি, তথা 'ইয়া আইউহাল মুমিনুন' বলা হয় নি। এখানে আলবাব এবং আফসারদের উদ্দেশ করে বলা হয় নি, তথা জ্ঞানীলোক এবং চিন্তাশীলদের লক্ষ করে বলা হয় নি, বরং একমাত্র তাদেরকেই বলা হয়েছে যারা ইমান এনেছেন। কী বলা হয়েছে? কী আদেশটি দেওয়া হয়েছে? কী উপদেশটি রাখা হয়েছে? বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও। সেটা কী সাহায্য? সেটা কি বিত্ত-বৈভবের সাহায্য? সেটা কি বিলাসিতায় চমকানো তথাকথিত সভ্যতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হবার সাহায্য? তা হলে এখানে আল্লাহকে আল্লাহরূপে পাচ্ছি না, এখানে আল্লাহকে রবরূপে পাচ্ছি না, এখানে আল্লাহকে রহমান ও রহিমরূপে পাচ্ছি না, বরং আল্লাহকে একটি বিশেষরূপে পাচ্ছি আর সেই রূপটির নাম হলো : 'মস্তান।'

খান্নাসমুক্ত নফ্‌সে রুহের উদ্ভাসিত রূপ যাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁকেই 'মস্তান' বলা হয়; তাঁকেই আবার 'ওয়াজহুল্লাহ' বলা হয় তথা আল্লাহ্‌র চেহারা বলা হয়; তাঁকেই আবার 'বান্দানেওয়াজ' বলা হয়, তথা যে বান্দার মধ্যে আল্লাহ্‌র নেওয়াজ তথা রহমতটি ফুটে উঠেছে। বাংলা ভাষায় বলা হয় নরের রূপে নারায়ণ তথা নরনারায়ণ। অন্যের গাত্রদাহ হবার প্রশ্নে বলছি না, বরং নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করে বলছি, যাঁরা খান্নাসমুক্ত নফ্‌সের অধিকারী তাঁরাই মস্তান। এক কথায় এঁরাই আল্লাহ্‌র ওলি।

এই মস্তানি সাহায্য চাইতে বলেছে *কোরান।* কিন্তু কাদেরকে বলা হয়েছে? যারা ইমান এনেছে তাদেরকে বলা হয়েছে। আর যাঁরা খান্নাসমুক্ত নফ্‌সের অধিকারী, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে মোমিন। মোমিনের উপরও খুব কম ছোটখাট কিছু আদেশ-উপদেশ দেবার কথাটি *কোরান*-এ পাই। আমরা পরে মোমিনদের উপর যে ছোটখাট আদেশ-উপদেশগুলো দেওয়া হয়েছে সেইগুলো *কোরান* হতে তুলে ধরবো এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবো। তবে অল্প কথায় বলছি, মোমিনদেরকে যে আদেশ-উপদেশগুলো দেওয়া হয়েছে সেই উপদেশগুলো ছোটখাট উপদেশ। দুঃখ হয় যখন অনুবাদক 'আমানু'-কে 'মোমিন' বলে অনুবাদ করেন। এই 'আমানু'-কে 'মোমিন' বলে অনুবাদ যারা করে তাদের এই অনুবাদের শ্রী দেখে *ইঞ্জিল* এবং *তাওরাত*-এর অনুবাদগুলোর বিকৃত, বানোয়াট এবং মনগড়া অনুবাদগুলো ধর্মের আসল বিষয়গুলোকে কতখানি চাপা দিয়ে ফেলেছে তা বোঝা যায়। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে *কোরান*-এর অনুবাদ পাই নি, বরং আল্লাহ্‌র নাজেলকৃত আরবি ভাষার *কোরান*-টিকে হুবহু পেয়েছি।

এই মস্তানি সাহায্যটি ইমানদারদেরকে চাইতে বলছেন আল্লাহ তাঁর *কোরানুল করিম*-এ। সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে খান্নাসমুক্ত নফ্‌সের অধিকারী হবার জন্য। *কোরান* বলছে, সবর এবং সালাতের মাধ্যমে সাহায্যটি চাইতে হবে। সবর অর্থ ধৈর্য আর সালাত অর্থ নামাজ তথা যোগাযোগ তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টা।

প্রথমে সবর তারপর সালাতের কথাটি বলা হয়েছে। কিন্তু এই কথাটি বলা হয় নি যে, প্রথমে সালাত তারপরে সবর। এখানে ওয়াক্তিয়া সালাতের চেয়ে দায়েমি সালাতের কথাটির প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই প্রথমে সবর তথা ধৈর্যধারণের কথাটি বলা হয়েছে। ওয়াক্তিয়া সালাতের মধ্য দিয়ে দায়েমি সালাতের দিকে অগ্রসর হতে হলে বিরাট ধৈর্যের প্রয়োজন তথা সবরের প্রয়োজন। কিন্তু শেষের আয়াতটি পড়ে চমকে যেতে হয়, অবাক হতে হয়, বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়, যখন দেখতে পাই আল্লাহ বলছেন, '*ইন্‌নাল্লাহা মা আস সাবেরিন*' তথা 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন' তথা যারা ধৈর্যধারণ করতে পারে তাদের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন বলে ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছে। মস্তানি সাহায্য চাইতে ইমানদারদেরকে বলা হয়েছে : সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও তথা ধৈর্য ও নামাজের মধ্য দিয়ে সাহায্যটি চাও। সাহায্যটি চাইবার প্রশ্নে এখানে আমরা দুটি শব্দ দেখতে পাই : একটি 'সবর', আরেকটি 'সালাত'। কিন্তু পরিশেষে আল্লাহ এই কথাটি বললেন না যে, *ইন্‌নাল্লাহা মা আস সাবেরিন ওয়া মাল মুসাল্‌লিন* অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে এবং নামাজিদের সঙ্গে আছেন তথা *ওয়ামাল*

মুসাল্লিন শব্দটি তথা নামাজিদের সঙ্গে আছি, কথাটি বলা হয় নি। এবং পাঠকেরা অবাক হবেন এই কথাটি শুনে যে, ***সমগ্র কোরানুল মজিদ-এর একটি আয়াতেও বলা হয় নি যে, আল্লাহ নামাজিদের সঙ্গে আছেন।*** কেন বলা হয় নি? লোক-দেখানো নামাজ এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগের নামাজের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। লোক-দেখানো নামাজের জন্য পুরস্কার পাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং ওয়াইল নামক দোজখে ফেলে দেবার কথাটিও জানতে পারি। আওলাদে রসুল, শহিদে আজম এবং 'আমা হতে হুসাইন এবং আমি হুসাইন হতে' তথা '*হুসাইনু মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হুসাইন*'–সেই আওলাদে রসুল ইমাম হুসাইনের তাঁবুতে কারবালার রণপ্রান্তরে নামাজ আদায় করার আজানের সুমধুর আহ্বানটি জানানো হচ্ছে : আবার নরপিশাচ এজিদের ধাবমান মনুষ্যরূপী কুত্তাদের তাঁবুতেও আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আওলাদে রসুল ইমাম হুসাইনের তাঁবুতে মহানবির জলিল কদরের সাহাবারা নামাজ-রুকু-সেজদা দিচ্ছেন : আবার নরপিশাচ এজিদের ধাবমান মনুষ্যরূপী কুকুরেরা, যারা এজিদের কাছে ইসলামের আদর্শ ফেলে দিয়ে বিবেকের শেষ সম্বলটুকুও বিক্রি করে দিয়েছে, তারাও নামাজ পড়ছে। মানুষের সর্বশেষ সম্বলটি হলো তার বিবেক। এই শেষ সম্বল বিবেকটুকু যারা বিক্রি করে দেয় তারা তো পশুর চেয়েও খারাপ। পশুরাও এদেরকে ঘৃণা করে। দুই দিকেই আজান, দুই দিকেই রুকু-সেজদা-নামাজ। তাই আল্লাহ *কোরান*-এর একটি আয়াতেও বলেন নি, 'আমি নামাজিদের সঙ্গে আছি।' তাই 'ওয়া মাল মুসাল্লিন' তথা 'এবং নামাজিদের সঙ্গেও আছি' এই কথাটি না বলে বলা হয়েছে 'ইন্নাল্লাহা মা আস সাবেরিন' তথা 'নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছি।'

আল্লাহ্‌র ওলিরা বছরের পর বছর ধরে ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে খান্নাসমুক্ত নফ্‌সের অধিকারী মোমিন হবার জন্য ধৈর্যধারণ করে থাকেন। সুতরাং ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন বা থাকেন কথাটি বলা হয়েছে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৮

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা বাকারার ১৭৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : 'তোমাদের মুখমন্ডলকে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে ফেরানোতে কোনো প্রকার পুণ্য নাই। (*লাইসালবেররা আন তুয়াল্লু উজুহাকুম কেবালাল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে*) বরং পুণ্য রহিয়াছে যে ব্যক্তি আল্লাহতে ইমান আনিয়াছেন এবং ইয়াওমিল আখেরে (পরকালের দিনের প্রতি) এবং ফেরেশতাগণের প্রতি কেতাব ও নবিগণের প্রতি ইমান আনে। (*ওয়া লাকিন্নাল বেররা মান আমানা বিল্লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ওয়াল মালাইকাতে ওয়াল কেতাবে ওয়ান নাবিয়্যিনা*)। এবং (আল্লাহ্‌র) ভালোবাসায় আত্নীয় এবং এতিম এবং মিসকিন এবং মুসাফির এবং সাহায্যপ্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য সম্পদ দান করে (*ওয়া আতাল মালা আলা হুব্বিহি জাভীল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকীনা ওয়াবনাস্‌সাবীলে ওয়াস্‌সায়েলীনা ওয়া ফিররেকাবে*)। এবং সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে (*ওয়া আকামাস সালাতা ওয়া*

আতাজ্‌জাকাতা) এবং আদায়কৃত ওয়াদাকে পরিপূর্ণ করে যখন ওয়াদা করা হয়। (*ওয়াল মুফুনা বে আহদেহীম ইজা আহাদু*)। এবং ধৈর্যধারণ করে দুঃখে কষ্টে এবং রোগে শোকে এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে। (*ওয়াসসাবেরীনা ফীল বাসায়ে ওয়াদ দাররায়ে ওয়া হিনাল বাসে*)। উহারাই তাহারা যাহারা সত্যবাদী, (*উলাইকাল্ লাজিনা সাদাকু*) এবং উহারাই তো হন মুত্তাকিন (খোদাভীরু), (*ওয়া উলাইকা হুমুল মুত্তাকুনা*)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতের প্রথমেই একটি গভীর রহস্যপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। সেই কথাগুলোর অনেক রকম অর্থ হতে পারে এবং নিরপেক্ষতা কতটুকু বজায় থাকে তা-ও বলা কঠিন ব্যাপার। তবে যতটুকু বুঝবার শক্তি দান করা হয়েছে ততটুকুর বেশি ব্যাখ্যা দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়। আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে কোনো প্রকার লাভও নাই, লোকসানও নাই; তথা পুণ্যও নাই, পাপও নাই। এখানে একটি কথা থেকে যায় যে উত্তর এবং দক্ষিণে চেহারাগুলো ফেরানোতে কোনো ভালোও নাই, মন্দও নাই– কেন বলা হলো না? উত্তর-দক্ষিণ কী এমন দোষ করেছে যে উত্তর-দক্ষিণ বাদ দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের কথা বলা হলো, তা-ও চেহারাগুলো পূর্ব-পশ্চিমে ফেরানোতে কোনো লাভও নাই, লোকসানও নাই–বলা হলো কেন? আর মুখমন্ডলগুলো কেনই বা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরানোর কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো? কী এমন পুণ্য আছে এই পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখমন্ডল ফেরানোতে? কী এমন অবহেলার বিষয় হলো উত্তর-দক্ষিণ দিকটির নাম উল্লেখ না করে? এই পূর্ব-পশ্চিম বলতে আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন? আবার উত্তর-দক্ষিণের কথাটি উল্লেখ না করেই বা কী এমন রহস্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে? যদি ব্যাখ্যার খাতিরে বলতে চাই যে, মেজাজি কাবাটি পশ্চিম দিকে এবং মেজাজি বায়তুল মোকাদ্দাসটি পূর্ব দিকে হবার কারণেই কি বলা হলো? আমরা ভালো করেই জানি যে হাকিকি কাবার অবস্থানটি মানুষের বাঁ দিকে তথা উত্তর দিকে অবস্থান করে বা করছে। এই কথাগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে বড়ই ঝুটঝামেলার গোলক-ধাঁধায় পড়ে যেতে হয়; তবু মেজাজি কাবা পশ্চিম দিকে হওয়াতেই বলা হয়েছে যে, পূর্ব-পশ্চিমে মুখ ফেরালেই পুণ্য হয় না। তা হলে কী কী কাজ করলে পুণ্য অর্জন করা যায়? আর সেই পুণ্য বলতেই বা কী বুঝায়? পুণ্যটিরও কি মেজাজি এবং হাকিকি অর্থ আছে?

কোরান বলছে, যে-মানুষটি আল্লাহতে ইমান এনেছে তথা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে এবং পরকালের দিনের প্রতি যে বিশ্বাস করেছে– এখানে পরকাল বলতেই বা কী বুঝানো হয়েছে? মৃত্যু-ঘটনার পর নফ্‌সের যে জীবনটি শুরু হয় উহাকেই পরকাল বলে জানি। এবং ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে। আমরা জানি, ফেরেশতাদের নফ্‌সও নাই, রুহও নাই, বরং ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র সেফাতি নুরের তৈরি। তারপর কেতাব ও নবিগণের প্রতি ইমান আনতে বলা হয়েছে। এখানেই শর্তটিকে শেষ করে না দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় আত্নীয়-পরিজন এবং এতিম এবং

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

মিসকিন এবং মুসাফির এবং যারা সাহায্য চায় তাদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্য সম্পদ দান করে। তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী এবং দাসমুক্তির কাজগুলো যারা করেন তারাই আল্লাহকে ভালোবাসেন।

প্রথম পাঁচটি বিষয়ের উপর ইমান আনার কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু পরের ছয়টি বিষয় আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাবার জন্য করতে বলা হয়েছে। অধম লিখকের মনে হয়, প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গেই মেজাজি এবং হাকিকি দুইটি রূপকে জড়িয়ে একত্র করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এরপরেই *কোরান*-এ বলা হয়েছে সালাত কায়েম করতে এবং জাকাত আদায় করতে। এবং আরও বলা হয়েছে যে, যদি ওয়াদা করে থাকে তা হলে সেই ওয়াদাটিও পূরণ করতে। এখানেও বিষয়টি শেষ করা হয় নি, বরং বলা হয়েছে, দুঃখ-কষ্টে, রোগ-শোকে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে ধৈর্যধারণ করে মোকাবেলা করতে। এই এতগুলো কাজ তথা নির্দেশ যাহা আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে, উহা পালন করলেই দু'টি খেতাবে আল্লাহ ভূষিত করেন : প্রথম খেতাবটির নাম হলো সত্যবাদী তথা সাদেক এবং দ্বিতীয়টি হলো খোদাভীরু তথা মুত্তাকিন। আয়াতের শেষ শব্দটি হলো মুত্তাকিন। এই এতগুলো গুণের অধিকারী যে বা যারা তারাই মুত্তাকিন এবং আল্লাহ মুত্তাকিনের সঙ্গে আছেন বা থাকেন এই কথাটিও *কোরান*-এ আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ্‌র দেওয়া এইসব কঠিন শর্তগুলো তখনই মান্য করা হয়, যখন প্রতিটি নফ্‌সের সঙ্গে যে শয়তানকে খান্নাসরূপে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে দেওয়া হয়েছে উহা হতে মুক্তিলাভ করা হয়।

এই এতগুলো কাজের নির্দেশ কোনো মানুষের পক্ষেই আন্তরিকভাবে করা মোটেই সম্ভবপর নয়, যে পর্যন্ত আপন নফ্‌স হতে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেওয়া না হয়। গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে বলছি যে, আল্লাহ্‌র বিশেষ কতগুলো বিষয় আছে যার আদেশ-নিষেধগুলো বার বার বিভিন্ন সুরার আয়াতে দেখতে পাই।

আমরা এ-ও জানি যে, আল্লাহ্‌র প্রতিটি আদেশ-নিষেধ, প্রতিটি এবাদত-বন্দেগির ভাগ করা বিষয়গুলোতে মাত্র একটি আদেশ, একটি নির্দেশ, একটি আহ্বান, একটি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আর সেটাই হলো নিজের নফ্‌সের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে কেবলমাত্র পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেয়া, বিতাড়িত করা। এই নফ্‌সের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার জন্য বার বার আল্লাহ বলছেন : সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও, রোজা রাখো, ইফতার করতে শেখো, হজ করো, কোরবানি দাও ইত্যাদি। সব কথাগুলো যেন যত সঙ্গীত আছে সব যেমন সাতপাকে বাঁধা, তথা সা- রে- গা- মা- পা- ধা- নি- র্সা-র মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে, সে রকম ***আল্লাহ্‌র সব আদেশ-নিষেধের শেষ কথাটি হলো নিজের নফ্‌সকে খান্নাসমুক্ত করা।***

এই খান্নাসের আবার চারটি রূপ আছে। এই খান্নাসই চারটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ-রঙ ধারণ করে দুনিয়ার জীবনটিকে লোভনীয়-শোভনীয় করে তুলছে। কত রকম যুক্তিতর্ক, কত রকম দার্শনিকদের দর্শন, কত রকম আইনের প্যাঁচ খেলা খেলছে একটি মাত্র খান্নাস চারটি রূপধারণ করে। অনেকটা বলা যায় যে, খান্নাসের এক অঙ্গে চারটি ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রতারণার ফাঁদ। এই প্রতারণার ফাঁদগুলো এতই

শক্ত, এতই মজবুত, এতই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে আর কোনো চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা করার অবকাশ নাই। এই খান্নাসের বিরুদ্ধে নফ্‌সের অবস্থানটিকেই বলা হয় জেহাদ। এই জেহাদ মোটেও যুদ্ধ নয়, এই জেহাদ মানুষের বানানো অস্ত্রের জেহাদ নয়, ইহা ধ্যানসাধনার জেহাদ, ইহা রেয়াজতের জেহাদ, ইহা মোরাকাবা-মোশাহেদার জেহাদ। এই জেহাদে যাঁরা শহিদ হয়ে যান তাঁদের আর মরণ নাই। এই জেহাদে যাঁরা শহিদ হয়ে যান তাঁদেরকে মারা গেছেন বলে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে *কোরান*-এ। এই জেহাদে যাঁরা শহিদ তাঁদের মৃত বলতে যেমন বারণ করা হয়েছে, তেমনি মৃত বলে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে। এই জেহাদে যাঁরা শহিদ হতে পারেন তাঁরাই আল্লাহ্‌র ওলি। এই জেহাদে যাঁরা শহিদ হয়েছেন আল্লাহ তাঁদেরকে গোপনে রেজেক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন (*বাল এনদা রাব্বিহিম এয়ার জাকুন*)। মৃত কোনো রেজেকই গ্রহণ করতে পারে না, তাই মরা মানুষ কোনোদিন আল্লাহ্‌র রেজেক গ্রহণ করে নিতে পারে না, তাই যাঁরা খান্নাসমুক্ত নফ্‌সের জন্য যুদ্ধ করে যায় তাঁরা শহিদ, তাঁরা কখনই মৃত নন। তাই *কোরান*-এ এই জাতীয় জেহাদের সঙ্গে একটি কঠিন শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, আর সেই শর্তটির নাম হলো *'ফি সাবিলিল্লাহ'*– একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য অথবা একমাত্র আল্লাহ্‌র মধ্যে।

দুনিয়ার জীবনে মানুষের মন ও মগজে কেবল বিত্ত-বৈভবের চিন্তাটি প্রাধান্য পায়। নফ্‌স সুখের উপরে সুখ দেখতে চায়। অনেক সুখ পেয়েছে, তারপর আরও সুখ। আরও সুখ পাবার পরেও কোথা হতে যেন নূতন ভাইরাস আগমনের মতো নূতন নূতন সুখের স্বপ্ন দেখাতেই থাকে। কোনো নফ্‌স, কোনো প্রাণ, কোনো জীবন, কোনো মানুষ ভাবতেই চায় না যে এই দুনিয়ার সব সুখভোগ, মোহ, মায়া সব কিছু ফেলে দিয়ে একদিন মৃত্যু নামক ঘটনার মুখোমুখি হয়ে আল্লাহ্‌র রহস্যজগতে প্রবেশ করতেই হবে। আল্লাহ্‌র এই রহস্যজগতে সবারই প্রবেশ করতেই হবে– এ প্রবেশটি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। সুতরাং বৈষয়িক সুখভোগ, বৈষয়িক সাফল্য অর্জনের প্রতিযোগিতা, মারামারি, খুনাখুনি সব কিছু এই খান্নাসই নফ্‌সের সাথে থেকে অনেক রকম ভাইরাস আর ব্যাক্টেরিয়া জন্ম দিয়ে করিয়ে থাকে।

সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতিটি আদেশ-নিষেধের মধ্যে দুইটি রূপ দেখতে পাই : একটি বাহিরের রূপ যাকে মেজাজি বলা হয়, আর একটি ভেতরের রূপ, যাকে হাকিকি বলা হয়। আল্লাহ্‌র এই মেজাজি রূপটি অনেকেই কমবেশি পালন করতে পারে, কিন্তু হাকিকি রূপের মাঝে অবগাহন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাঁরা মোরাকাবা- মোশাহেদার জেহাদে অবিরাম যুদ্ধ করে চলছেন তথা সাধনা করে চলছেন তাঁরাই মুত্তাকি। আর এই মুত্তাকিদের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন বা থাকেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৯

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা বাকারার ২৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সালাতের জন্য যত্নবান হও, সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তী সালাত) বিষয়ে এবং আল্লাহ্র জন্য দাঁড়াও অনুগত (বিনীত) ভাবে। (*হাফেজু আলাস্ সালাওয়াতে ওয়াস্সালাতীল উস্তা, ওয়াকুমু লিল্লাহে কানেতীনা*)।'

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ১০

কোরান-এর ২ নম্বর সুরা বাকারার ২৩৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং যদি তোমরা পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় (সালাত আদায় বিষয়ে) ভয় কর। (*ফাইন খেফতুম ফারেজালান আওরুকবানান*)। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে যখন নিরাপদ মনে করিবে তখন আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবেই স্মরণ করিবে। (*ফাইজা আমেনতুম ফাজকুরুল্লাহা কামা আল্লামাকুম*)। যাহা তোমরা জানিতে না। (*মা লাম তাকুনু তা আলামুনা*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ১১

কোরান-এর ৩ নম্বর সুরা আলে-ইমরানের ৩৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং যখন তিনি (জাকারিয়া) মেহরাবের (কক্ষের) মধ্যে সালাতে দন্ডায়মান ছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন (*ফানাদাত্হুল মালাইকাতু ওয়াহুয়া কায়েমুন ইউসাললী ফীল মেহেরাবে*) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুসংবাদ দিতেছেন (যিনি হইবেন) আল্লাহ্র কালামের সত্যানয়নকারী এবং নেতা এবং জিতেন্দ্রিয়। (*আন্নাল্লাহা ইউবাশ্শেরুকা বেইয়াহ্ইয়া মুসাদ্দেকান বেকালেমাতীন মিনাল্লাহে ওয়া সাইয়্যেদান ওয়া হাসুরান*)। এবং সালেহীনদের (সৎকর্মশীলদের) মধ্য হইতে নবি। (*ওয়া নাবীয়্যান মিনাস্ সালেহীনা*)।'

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ১২

কোরান-এর ৩ নম্বর সুরা আলে-ইমরানের ৪৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে মরিয়ম, তোমার রবের জন্য অবনত হও এবং সেজদা কর এবং রুকুকারীদের সহিত রুকু কর। (*ইয়ামারিয়ামুক নূতী লীরাব্বেকে ওয়াসজুদী ওয়ারকাঈ মাআর্ রাকেঈনা*)।'

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ১৩

কোরান-এর ৪ নম্বর সুরা নেসার ৪৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে তোমরা যাহারা ইমান আনিয়াছ! যখন তোমরা মোহগ্রস্ত থাক তখন সালাতের নিকটবর্তী হইও না এমতাবস্থায় যে তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার। (*ইয়া আইয়্যুহাল লাজিনা আমানু লা তাকরাবুস্ সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা হাত্তা তা আলামূ মা তাকুলুনা*)। এবং তোমরা সফররত অবস্থা ব্যতীত অপবিত্র অবস্থায় ও পবিত্র না হওয়া

পর্যন্ত। (*ওয়ালা জুনুবান ইল্লা আবেরিন সাবিলিন হাত্তা তাগ্তাসেলু*)। এবং যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও অথবা সফররত অবস্থায় থাক অথবা কেহ নারী স্পর্শ (গমন) করিয়া থাকে (*ওয়া ইনকুনতুম মারদা আও আলা সাফারীন আও জা-আ আহাদুন মিনকুম মিনালগায়েতে আও লামাসতুমুন নেসাআ*) সুতরাং যদি পানি না পাওয়া যায়। সুতরাং তোমরা পবিত্র মাটি দিয়া তাইয়াম্মুম করিবে। (*ফালাম্ তাজেদু মা-আন্ ফাতাইয়াম্মামু সায়ীদান তাইয়্যেবান*) সুতরাং তোমরা তোমাদের মুখমন্ডলকে এবং হাতগুলোকে মাসেহ করিবে। (*ফাম্সাহু বেউজুহেকুম ওয়া আইদীকুম*)। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপমোচনকারী (এবং) অত্যন্ত ক্ষমাশীল (*ইন্নাল্লাহা কানা আফুওয়ান গাফুরান*)।'

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১৪

কোরান-এর ৪ নম্বর সুরা নেসার ৭৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, তোমাদের হাতকে সংযত কর এবং সালাত কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর। (*আলাম্তারা ইলাল্লাজীনা কিলালাহুম কুফ্ফু আইদিয়াকুম ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ জাকাতা*)। সুতরাং যখন তাহাদের উপর লড়াইকে লিখিয়া দেওয়া হইল তখন তাহাদের মধ্য হইতে একটি দল মানুষকে এমনিভাবে ভয় করিতেছিল যেমনই আল্লাহকে ভয় করে অথবা তাহার চাইতেও অধিক ভয়। (*ফালাম্মা কুতীবা আলাইহীমুল কিতালু ইজা ফারীকুম মিন্হুম ইয়াখশাওনান্ নাসা কাখাশিয়াতীল্লাহে আও আশাদ্দা খাশ্ইয়াতান*)। এবং তাহারা বলিতেছিল, হে আমাদের রব! তুমি কেন আমাদের উপর লড়াই করাকে লিখিয়া দিলে? (*ওলা কালু রাব্বানা লেমা কাতাবতা আলাইনাল কেতালা*)। কেন তুমি আমাদেরকে আরও কিছুকাল (সময়) অবকাশ (সুযোগ) দিলে না? (*লাওলা আখ্খারতানা ইলা আজালীন কারীবিন*)। বল, দুনিয়ার ভোগ অল্পই এবং আখেরাত মুত্তাকিনদের জন্য কতই না উত্তম! (কুল মাতাউদ্দুনিয়া কালীলুন, ওয়াল আখেরাতু খাইরুন লেমানিত্তাকা) এবং তোমাদের উপর সামান্যতমও জুলুম করা হইবে না (*ওয়ালা তুজ্লামুনা ফাতীলান্*)।'

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ১৫

কোরান-এর ৪ নম্বর সুরা নেসার ১০১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন তোমরা পৃথিবীর (জগতের) মধ্যে ভ্রমণ করিবে সুতরাং তোমাদের উপর সালাত সংক্ষিপ্ত করাতে কোন গোনাহ হইবে না। (*ওয়া ইজা দারাব্তুম ফীল আর্দে ফালাইসা আলাইকুম জুনাহুন আন্ তাক্সুরু মিনাস সালাতে*)। যদি তোমরা কাফেরগণ কর্তৃক ফেৎনার আশংকা (ভয়) কর। (*ইন খেফ্তুম আন্ ইয়াফ্তেনাকুমল্ লাজীনা কাফারূ*)। নিশ্চয়ই কাফেরগণ হয় তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। (*ইন্নাল কাফেরীনা কানূ লাকুম আদুভ্ভ্যাম মুবিনান*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ১৬

কোরান-এর ৪ নম্বর সুরা নেসার ১০২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন তাহাদের (ইমানদারদের) মধ্যে অবস্থান করিবে এবং তাহাদের জন্য সালাত কায়েম করিবে (*ওয়া ইজা কুন্‌তা ফীহিম ফাআকাম্‌তা লাহুমুস সালাতা*)। সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে একটি দল যেন তোমাদের সাথে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়ায়। (*ফাল্‌তাকুম তায়েফাতুন মিন্‌হুম মাআকা ওয়াল ইয়াখুজু আস্‌লে হাতাহুম*)। সুতরাং যখন তাহারা সেজদা শেষ করিবে সুতরাং তাহারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান করে। (*ফাইজা সাজাদু ফাল্‌ইয়াকূনু মিন্‌ ওয়ারায়েকুম*)। এবং অপর দলটি, যাহারা সালাতে অংশগ্রহণ করে নাই তাহারা যেন তোমার সাথে সশস্ত্র এবং সতর্ক অবস্থায় সালাতে অংশগ্রহণ করে। (*ওয়াল তাতে তায়েফাতুন উখরা লাম ইউসাল্‌লু মাআকা ওয়াল্‌ ইয়াখুজু হেজরাহুম ওয়া আসলে হাতাহুম*)। এবং কাফেরগণ ইহা কামনা করে যে, তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং ধনসম্পদ বিষয়ে অসর্তক হও, যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একযোগে আক্রমণ করিতে পারে। (*ওয়াদ্‌দাললাজীনা কাফারূ লাও তাগফুলুনা আন্‌ আস্‌লেহাতেকুম ওয়া আম্‌তেআতেকুম ফাইয়ামিলুনা আলাইকুম মাইলাতান ওয়াহেদাতান*) এবং যদি তোমরা প্রাকৃতিক (বৃষ্টির) কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে কষ্ট পাও, তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো রাখিয়া দাও তাহা হইলে তোমাদের কোনো গোনাহ হইবে না। (*ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম ইন্‌কানা বেকুম আজান মিন্‌মাতারীন আওকুন্‌তুম মারদা আন্‌তাদূ আসলে হাতাকুম*)। এবং নিশ্চয়ই তোমরা (শত্রু বিষয়ে) সতর্কতা অবলম্বন করিবে (*ওয়াখুজু হেজ্‌রাকুম*)। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন। (*ইন্‌নাল্‌লাহা আ-আদ্‌দা লীল্‌ কাফেরীনা আজাবান মোহিনান*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ১৭

কোরান-এর ৪ নম্বর সুরা নেসার ১০৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং যখন তোমরা আল্লাহকে শুইয়া, বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া জিকির করিবে। (*ফাইজা কাদাহতুমুস্‌ সালাতা ফাজকুরুল্‌লাহা কেয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবেকুম*)। সুতরাং যখন তোমরা (যুদ্ধবিগ্রহ হইতে) নিরাপদ থাকিবে তখন তোমরা সালাত কায়েম করিবে। (*ফাইজাত মানান্‌তুম ফাআকিমুস্‌সালাতা*)। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা মোমিনদের উপর কর্তব্য। (*ইন্‌নাস সালাতা কানাত আলাল্‌ মোমিনীনা কেতাবান মাওকুতান*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ১৮

কোরান-এর ৪ নম্বর সুরা নেসার ১৪২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই মোনাফেকেরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চাহে অথচ তিনিই তাহাদেরকে এই ধোঁকাবাজির (শাস্তি) দিবেন। (*ইন্‌নাল্ মোনাফেকীনা ইউখাদেউনাল্‌লাহা ওয়াহুয়া খাদেউহুম)* এবং যখন তারা সালাতের দিকে উঠে দাড়ায়, খুবই অলসতার সঙ্গে দাড়ায়, মানুষকে দেখাবার জন্য।(*ওয়া ইজা কামু ইলাস সালাতে কামূ কুসালা ইউরাউনান্ নাসা)* এবং অন্তর তাদের আল্লাহকে স্মরণ করে না অল্প কিছু লোক ছাড়া। (*ওয়ালা ইয়াজ্‌কুরুনাল্‌লাহা ইল্‌লা কালীলান*)

ব্যাখ্যা

অর্থাৎ 'এবং যখন তারা সালাতের দিকে উঠে দাড়ায়, খুবই অলসতার সঙ্গে দাড়ায়, মানুষকে দেখাবার জন্য। অন্তর তাদের আল্লাহকে স্মরণ করে না অল্প কিছু লোক ছাড়া।'

পাঠক ভাই, আপনি প্রায় অনুবাদেই একটি ছোট্ট ভুল দেখতে পাবেন। ভুলটি হয়তো আপনার দৃষ্টিকে ফাঁকিও দিতে পারে, আবার একটু মনোযোগ সহকারে দেখলেই ছোট্ট ফাঁকিটা আপনার চোখে ধরা পড়ে যাবে। ফাকিটা ছোট হতে পারে, কিন্তু এর অর্থ হয়ে পড়ে মারাত্মক ঘোলাটে। 'ইজা কামু ইলাস সালাতে' যার হুবহু অর্থ হলো 'যখন সালাতের দিকে দাঁড়ায়', কিন্তু এর হুবহু অনুবাদ না করে তারা অনুবাদ করেন 'যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায়'। 'যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায়' যদি কোরান পাকে লিখা থাকত তা হলে ইহার হুবহু আরবি ভাষাটা হতো 'ইজা কামু লে সালাত'। কারণ, আরবি ভাষায় 'ইলার' অর্থ হলো দিকে এবং 'লে' অর্থ হলো জন্য। এখন আপনিই বলুন, কোথায় 'ইলা' আর কোথায় 'লে'। অথচ জোর করেই এ রকম হাজার হাজার উল্টাপাল্টা করে রাখা হয়েছে। অবশ্য পান্ডিত্যের অজুহাতে ব্যাকরণের ঘেউ ঘেউ আর চিল্লাচিল্লির দাঁত খিঁচুনির দর্শন মিলবে অনেক, আর বার বার চোখের কাছে আসবে ভিরমি এবং তাতে ভুলের গর্তে পা রেখে বিপদে পড়তে পারেন। সম্ভবত এ রকম ভুলের গর্ভে পা ফেলে এক ইসলামকে তেহাত্তর ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আরও মজার কথা কি, কোনো ওলি-দরবেশ, পীর-ফকিরের দ্বারা কিন্তু এক ইসলামকে এত ভাগে ভাগ করার মহান কর্তব্য সাধিত হয় নি। এত ভাগে ভাগ করার সাধনার ফলটি আমরা পেয়েছি আরবি-জানা বড় বড় পন্ডিতের মাধ্যমে। পীর-ফকির, ওলি- দরবেশরা মুসলমান বানিয়েছেন, আর আরবি জানা পন্ডিতেরা মুসলমানদেরকে তেহাত্তরটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন।

লাগ ভেল্কি লাগের মতো আপনার মনে, মাথায় আর চোখে সুন্দর ভেল্কি লাগিয়ে দেবে শ্রদ্ধেয় আরবি-জানা পন্ডিতেরা, অথচ অনুবাদ আর ব্যাখ্যাগুলো হবে লেজকাটা ।

সালাত বলতে যদি নামাজ পড়াটাকেই বলা হতো তবে 'যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায়' ইহাই হতো প্রকৃত অনুবাদ। কিন্তু তারা দাঁড়ায় সালাতের দিকে, এর কারণ, এই দাঁড়ানোটা হলো সালাতের দিকে অনুশীলন, যাকে আমরা ট্রেনিং নেওয়া হচ্ছে বলি। সুতরাং ইহা সালাত নয়, সালাতকে কামিয়াব করার

প্রস্তুতি গ্রহণ করা মাত্র। দেহের বিভিন্ন ওঠা নামা, বসা, হাত তোলা এবং মাথা নত করা ইত্যাদি অঙ্গভঙ্গিগুলো মোটেই সালাত নয়। কারণ, এই অঙ্গভঙ্গিগুলো যদি সালাতই হবে তবে 'মানুষকে দেখাবার জন্য' এই বাক্যটুকু কোরান পাক আমাদেরকে বলে দিতেন না। এই কথাটুকু বলার মধ্যে তেমন অর্থ বহন করতো না। কারণ, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যম ছাড়া মানুষকে কিছু দেখানো যায় না। ***আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করাকেই বলা হয় সালাত এবং এই সালাত তথা যোগাযোগকে করতে হয় কায়েম অর্থাৎ স্থায়ী।*** এই সালাত কায়েম করতে হয়, তাই বলা হয়েছে। 'ওয়াকিমুস্ সালাত' অর্থাৎ (আল্লাহ্‌র সঙ্গে) যোগাযোগ স্থায়ী করতে 'একরা' করতে নয়, অর্থাৎ পড়তে নয়। কারণ, 'একরা সালাত' অর্থাৎ সালাত পড় বলে কোরান পাকে একটি বারও বলা হয় নি। (তাই বলে কেউ যেন ভুল করে না বসেন যে, অধম লেখক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বারণ করছে। কারণ, এখানে নীতিনির্ধারণের আলোচনা হচ্ছে, প্রয়োগপদ্ধতির আলোচনা নয়)।

আল্লাহ্‌র কাছে দেহের হাজিরা দেওয়াটা হাজির হওয়া বলে বিবেচিত হয় না। মনের হাজিরা দেওয়াটাকেই আল্লাহ্‌র কাছে হাজির হওয়া বোঝায়। সুতরাং কেবলমাত্র দেহের হাজিরা দেওয়ার নামাজকে সালাত বলে গণ্য করা হয় না। কারণ, সালাত মনের সঙ্গে জড়িত এবং মন দিয়েই সালাতের কারবার। দেহ নিয়ে নয়। কারণ, দেহ মুসলমান এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুসলমান, কিন্তু মনটি মুসলমান বানাতে হবে। তারই জন্য সমগ্র *কোরান* পাক একটি উপদেশাবলির বিরাট গ্রন্থ। তাই অমুসলমান মনটির মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান দেহটিকে সাময়িক কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই মুসলমান দেহটি দিয়ে মানবজাতির কল্যাণেও আসতে পারে আবার অকল্যাণেও নিয়োজিত হতে পারে– ইহাই একটি মনের সাময়িক স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। তাই মনের চৈতন্যের সঙ্গে আল্লাহপাকের মহাচৈতন্যের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হলেই সালাতের আবির্ভাব হয় এবং তখনই হয় দুনিয়ার ষড়রিপুর মায়ায় তৈরি অচৈতন্যের তিরোভাব। মেরাজের অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে এই সালাতের কাছে এবং এই সালাতের যিনি সাথী তাকেই বলা হয় মোমিন। কারণ, মোমিনের সালাতই হলো মেরাজ। তা হলে প্রশ্ন আসে, যার সালাত কায়েম হয় নি তার কি মেরাজ হয়েছে? না। কারণ, তার সালাত হলো মানুষকে দেখাবার জন্য। মাত্র সামান্য কিছু লোক ছাড়া প্রায় সকলেই আল্লাহকে অন্তর দিয়ে স্মরণ করে না। এ কথা আমার কথা নয়, এ কথা স্বয়ং আল্লাহ পাকের কথা এবং স্পষ্ট ঘোষণা। সুতরাং অতি অল্প লোকেই কোরান পাকের গুপ্তরহস্য অনুধাবন করতে পারে এবং বাকি সবাইকে উহা বলে লাভ নেই। সবাই সত্যকে গ্রহণও করতে পারে না এবং সত্যকে উপলব্ধিও করতে পারে না, কেবলমাত্র অল্প কিছু লোক ছাড়া ইহাই কোরান পাক আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীলোকেরা এই কথার গুপ্তরহস্য বুঝতে পারেন।(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমার লিখিত ***'মারেফতের গোপন কথা'*** নামক বইটিতে)।

***কোরান*-এ সালাতের উল্লেখ : ১৯**

কোরান-এর ৪ নম্বর সুরা নেসার ১৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা জ্ঞানে পারদর্শী তাহারা এবং যাহারা ইমানদার এবং যাহারা তোমার প্রতি যাহা নাজেল করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্ব হইতে যাহা নাজেল করা হইয়াছে সবগুলোর প্রতি ইমান আনে। (*লাকিনীর রাসেখুনা ফীল এলমে মিন্‌হুম ওয়াল মোমেনুনা ইউমেনুনা বিমা উন্‌জীলা ইলাইকা ওয়ামা উনজীলা মিন কাবলেকা*) এবং যাহারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং ইয়াওমুল আখেরের (শেষ বিচার দিনের) প্রতি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ইমান আনয়ন করে। (*ওয়াল মুকিমিনাস্‌ সালাতা ওয়াল মূতুনাজ জাকাতা ওয়াল মুমেনূনা বিল্‌লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে*)। উহাদের জন্য আমরা অচিরেই সর্বোচ্চ বিনিময় প্রদান করিব। (*উলাইকা সানুতীহিম আজরান আজীমান্‌*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ২০

কোরান-এর ৫ নম্বর সুরা মায়েদার ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে তোমরা যাহারা ইমান আনিয়াছ! তোমরা যখন সালাত কায়েম করিতে উঠিয়া দাঁড়াইবে সুতরাং যখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাতসমূহকে কনুইসহ ধৌত করিবে। (*ইয়া আইয়্যুহাল লাজীনা আমানু ইজা কুমতুম ইলাস্‌ সালাতে ফাগ্‌সেলু উজূহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম ইলাল মারাফেকে*) এবং তোমাদের মাথাকে মাসেহ করো এবং টাখনুসহ পাগুলোকেও। (*ওয়ামসাহু বেরূউসেকুম ইয়া আরজুলাকুম ইলাল কাবাইনে*)। এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও, তাহা হইলে পবিত্র হইয়া নাও। (*ওয়া ইন্‌কুন্‌তুম জুনুবান ফাত্‌তাহ্‌হারূ*)। এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য হইতে কেউ যদি পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান হইতে আসে অথবা নারীকে স্পর্শ (মিলন) করে অতঃপর পানি না পাইবে (*ওয়া ইন্‌ কুন্‌তুম মারদা আও আলা সাফারিন আও জাআ আহাদুন মিন্‌কুম মিনাল গায়েতে আও লামাস্‌তুমুন নেসাআ ফালাম তাজেদু মাআন*) সুতরাং তোমরা তাইয়াম্‌মুম কর পবিত্র মাটি দ্বারা, অতঃপর তোমরা মাসেহ কর তোমাদের মুখমন্ডলকে এবং হাতসমূহকে উহা দ্বারা। (*ফাতাইয়াম্‌মামু সায়িদান তাইয়্যেবান ফাম্‌সাহু বেউজুহেকুম ওয়া আইদিকুম মিন্‌হু*)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্ট নির্বাচন (চাপাইয়া দিতে) করিতে ইচ্ছা করেন না। (*মা ইউরীদুল্‌লাহু লেইয়াজ আলা আলাইকুম মিন্‌ হারাজীন*) বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করেন এবং তোমাদের উপর তাহার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করিতে চাহেন। সম্ভবত তোমরা শোকর-গুজার হইতে পার। (*ওয়ালাকীন ইউরীদু লেইউ তাহ্‌হেরাকুম ওয়া লেইউতেম্‌মা নেয়েমাতাহু আলাইকুম লা আললা কুম তাশ্‌কুরুনা*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ২১

কোরান-এর ৫ নম্বর সুরা মায়েদার ১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং আল্লাহ বলিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথেই আছি (*ওয়া কালাল্‌লাহু ইন্‌নি মাআকুম*)। যদি তোমরা সালাত

কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর এবং আমার রসুলগণের প্রতি ইমান আন এবং তাহাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ) প্রদান কর। (*লা ইন্ আকাম্তুমুস সালাতা ওয়া আতাইতুমূজ জাকাতা ওয়া আমান্তুম বেরুসূলী ওয়া আজ্জারতুমুহুম ওয়া আক্রাদ্তুমুল্লাহা কারদান হাসানান*)। তাহা হইলে আমি তোমাদের পাপসমূহ মিটাইয়া দিব এবং অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল (প্রবেশ) করাইব। (*লা উকাফ্ফেরান্না আনকুম সাইয়্যেআতেকুম ওয়ালা উদ্খেলান্নাকুম জান্নাতীন*)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২২

কোরান-এর ৫ নম্বর সুরা মায়েদার ৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু হইলেন আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল এবং যাহারা ইমান আনয়ন করে, যাহারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং তাহারাই হইল রুকুকারী। (*ইন্নামা ওয়ালী ইয়্যুকুমূল্লাহু ওয়া রাসূলুহু ওয়াল্লাজীনা আমানূল্লাজীনা ইউকিমূনাম্ সালাতা ওয়া ইউতুনাজ্জাকাতা ওয়া হুম্ রাকেউনা*)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৩

কোরান-এর ৫ নম্বর সুরা মায়েদার ৫৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যখন তোমরা সালাতের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা উহাকে ঠাট্টা ও খেল-তামাশা মনে করে। (*ওয়া ইজা নাদাইতুম ইলাস্সালাতে ইততাখাজুহা হুজুওয়্যান ওয়া লায়েবান*)। উহা এই জন্য যে, নিশ্চয়ই তাহারা হইল নির্বোধ কাওম (জাতি)। (*জালীকা বেআন্নাহুম কাওমুন লাইয়াকেলূনা*)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৪

কোরান-এর ৫ নম্বর সুরা মায়েদার ৯১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মদ এবং জুয়ার মাধ্যমে শত্রুতা এবং হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াইতে ইচ্ছা করে। (*ইন্নামা ইউরীদূশ্ শায়তানু আন্ইউকেআ বাইনাকুমুল আদাওয়াতা ওয়াল বাগ্দাআ ফীল খাম্রে ওয়াল মাইসীরে*)। এবং আল্লাহ্র জিকির এবং সালাত (যোগাযোগ) হইতে তোমাদেরকে বিরত রাখিতে চাহে। (*ওয়া ইয়াসুদ্দাকুম আন্ জিক্রীল্লাহে ওয়া আনিস্সালাতে*)। *সুতরাং তবুও কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?* (*ফাহাল আন্তুম মুন্তাহুনা*)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ২৫

কোরান-এর ৫ নম্বর সুরা মায়েদার ১০৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে তোমরা যারা ইমান আনয়ন করিয়াছ! যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে অসিয়তের সময় সাক্ষী করিয়া লইবে। (*ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু শাহাদাতু*

বাইনেকুম ইজা হাদারা মাওতু হীনাল ওয়াসীয়্যাতে ইস্নানে জাওয়া আদ্লীন্ মিনকুম) অথবা তোমাদের সফরে কাহারও যদি মৃত্যুর বিপদ সময় উপস্থিত হয়, তখনও দুইজনকে সাক্ষী করিয়া লইবে। (*আও আখারানে মিন গাইরেকুম ইন আনতুম দারাব্তুম ফীল আরদে ফাআসাবাত্কুম মুসিবাতুল মাওতে*)। যদি তাহাদের (সাক্ষীদের) সম্পর্কে সন্দেহ হয় তাহা হইলে সালাতের (যোগাযোগের) পর তাহাদের দুইজনকে আল্লাহ্র নামে শপথ করাইবে..... (*তাহবেসূনা হুমা মিন্বাআদীস সালাতে.......*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ২৬

কোরান-এর ৬ নম্বর সুরা আন্আমের ৭২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং তোমরা সালাত কায়েম কর এবং তাঁহাকে (আল্লাহকে) ভয় কর এবং তিনিই তো সেই সত্তা যাঁহার দিকে তোমাদেরকে হাশর (একত্র) করা হইবে। (*ওয়া আন্ আকিমুস্সালাতা ওয়াত্তাকূহু ওয়া হুওয়াল লাজী ইলাইহে তুহ্শারূনা*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ২৭

কোরান-এর ৬ নম্বর সুরা আন্আমের ৯২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : ...... এবং যাহারা আখেরাতের প্রতি ইমান আনয়ন করিয়াছে তাহারা ইহার (কিতাবের) প্রতিও ইমান রাখে এবং তাহারা তাহাদের সালাতকে সংরক্ষণ করে। (*ওয়াল্ লাজিনা ইউমেনূনা বিল্ আখেরাতে ইউমেনুনা বিহী ওয়াহুম আলা সালাতেহীম ইউহাফেজুনা*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ২৮

কোরান-এর ৬ নম্বর সুরা আনআমের ১৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: বল, নিশ্চয়ই আমার সালাত এবং আমার পুণ্যকর্ম এবং আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু আল্লাহ্র জন্য যিনি রাব্বুল আলামিন। (*কুল, ইন্না সালাতি ওয়া নূসুকী ওয়া মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লীল্লাহে রাব্বিল আলামীনা*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ২৯

কোরান-এর ৭ নম্বর সুরা আরাফের ২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং তোমরা তোমাদের মুখমন্ডলকে প্রত্যেক সেজদার স্থানে (মসজিদে) প্রতিষ্ঠিত কর, এবং তাহার জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করিতে তাহাকে ডাক। (*ওয়া আকীমু উজুহাকুম ইন্দা কুললে মাসজেদীন ওয়াদ্উহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীনা*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৩০

কোরান-এর ৭ নম্বর সুরা আরাফের ৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক সেজদার স্থানে সুন্দর পোশাক গ্রহণ কর। (*ইয়া বানি আদামা খুজূ জীনাতা কুম ইন্‌দা কুললে মাসজেদীন*)। এবং খাও এবং পান কর এবং তোমরা অপচয় করিও না। নিশ্চয়ই (আল্লাহ) অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। (*ওয়াকুলূ ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরেফু, ইন্‌নাহু লাইউহেব্‌বুল মুস্‌রেফীনা*)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩১

কোরান-এর ৭ নম্বর সুরা আরাফের ১৭০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যাহারা কিতাবকে সত্যভাবে ধারণ করিয়াছে এবং সালাত কায়েম করিয়াছে, নিশ্চয়ই আমরা নেক্‌কারদের বিনিময় নষ্ট করি না। (*ওয়াল লাজীনা ইউমাস্‌সেকুনা বিল কিতাবে ওয়া আকামুস্‌সালাতা ইন্‌না লানূদীউ আজরাল মুসলেহীনা*)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩২

কোরান-এর ৭ নম্বর সুরা আরাফের ২০৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই যাহারা তোমার রবের নিকটে রহিয়াছে তাহারা তাঁহার (রবের) বান্দা হইবার বিষয়ে অহংকার করে না। এবং তাহারা তাঁহার তসবিহ পাঠ করে এবং তাঁহার সমীপে সেজদারত অবস্থায় থাকে। (*ইন্‌নাল্‌লাজিনা ইন্‌দা রাব্‌বেকা লা ইয়াস তাক্‌বেরুনা আন্‌ ইবাদাতীহী ওয়া ইউসাব্‌বেহুনাহু ওয়ালাহু ইয়াস্‌জুদূনা*)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৩

কোরান-এর ৮ নম্বর সুরা আনফালের ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যাহারা সালাত কায়েম করে এবং তাহাদেরকে যাহা আমরা রেজেক হিসাবে দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে। (*আল্‌লাজীনা ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্‌মা রাজাক্‌নাহুম ইউনফেকুনা*)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৪

কোরান-এর ৯ নম্বর সুরা তওবার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : অতঃপর যদি তাহারা (মুশরিকরা) তওবা করে এবং সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে। সুতরাং তাহাদেরকে তাহাদের পথে চলিতে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল (এবং) দয়ালু। (*ফাইন্‌তাবু ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আতুজ্‌জাকতা ফাখাললু সাবিলাহুম, ইন্‌নাল্‌লাহা গাফুরুর রাহীমুন*)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৫

কোরান-এর ৯ নম্বর সুরা তওবার ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : অতঃপর যদি তাহারা তওবা করে এবং সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে তাহা হইলে তাহারা তোমাদের দীনি ভাই। (*ফাইন্‌তাবু ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আতুজ্‌জাকাতা ফাইখ্‌ওয়ানুকুম ফীদ্‌দীনে*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৬

কোরান-এর ৯ নম্বর সুরা তওবার ১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহ্‌র মসজিদ তো সেই ব্যক্তিই নির্মাণ করিবে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং ইয়াওমুল আখেরাতের উপর ইমান আনিবে এবং যে সালাত কায়েম করিবে এবং যে জাকাত আদায় করিবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিবে না। (*ইন্‌নামা ইয়ামুরু মাসাজেদাল্‌লাহে মান্ আমানা বিল্‌লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ওয়া আকামাস সালাতা ওয়া আতাজ্‌জাকাতা ওয়া লাম ইয়াখ্‌শা ইল্‌লাল্‌লাহা*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৭

কোরান-এর ৯ নম্বর সুরা তওবার ৭১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং মোমিন পুরুষ এবং মোমিন নারী তাহারা পরস্পর একে অন্যের বন্ধু (ওয়াল মোমেনুনা ওয়াল মোমেনাতু বাআদ্‌হুম আউলীয়াউ বাদীন্)। তাহারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করে। এবং সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করে। (*ইয়ামুরূনা বিল্ মারূফে ওয়ান ইয়াহাওনা আনিল মুনকারে ওয়া ইউকীমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনাজ জাকাতা ওয়া ইউতী উনাল্‌লাহা ওয়া রাসুলাহু*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৮

কোরান-এর ১১ নম্বর সুরা হুদের ১১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং তুমি দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশের পর সালাত কায়েম করিও (*ওয়া আকিমিস্‌সালাতা তারাফীন্ নাহারে ওয়া জুলাফান মিনাল্ লাইলে*) নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ গোনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়। উহা তো জিকিরকারীদের জন্য একটি জিকির। (*ইন্‌নাল হাসানাতে ইউজহেবনাস্ সাইয়্যেয়াতে জালিকা জেক্‌রা লিজ্‌জাকেরীন*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৩৯

কোরান-এর ১৫ নম্বর সুরা হিজরের ৯৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং তুমি তোমার রবের তসবিহ ও প্রশংসা পাঠ কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (*ফাসাব্‌বেহ বেহাম্‌দে রাব্‌বিকা ওয়া কুন মিনাস সাজেদীনা*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪০

কোরান-এর ১৭ নম্বর সুরা বনি ইসরাইলের ৭৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সালাত কায়েম কর সূর্য ঢলিয়া পড়ার কারণে, রাতের অন্ধকারের দিকে এবং ফজরের *কোরান*! নিশ্চয়ই ফজরের *কোরান* হয় সাক্ষী স্বরূপ। (*আকিমিস সালাতা লেদুলূকিশ্‌শামসে ইলা গাসাকিল লাইলে ওয়া কোরআনাল ফাজরে ইন্‌না কোরআনাল ফাজরে কানা মাশ্‌হুদান*)।

ব্যাখ্যা

ইহার প্রচলিত এবং বিকৃত অনুবাদ করা হয় এইভাবে 'সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।' অনুবাদের চরিত্রই যখন বিকৃত তখন ব্যাখ্যার চরিত্র কেমন হবে? অধম লেখক এই আয়াতটুকুর ব্যাখ্যা দিচ্ছি: সূর্যকে এখানে একটি মানবজীবনের সঙ্গে তুলনা করে বলছে যে, সালাত কায়েম করো কারণ যখন সালাত কায়েম হয়ে যাবে তখনই দেখতে পাবে প্রথম কোরান-এর প্রথম পরিচয়। সূর্য যেমন উদয় হয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণতায় এসে পুনরায় অস্ত যেতে থাকে তথা ঢলে যেতে থাকে এবং একসময় রাতের আঁধার ঢেকে যায়, ঠিক একটি মানুষের জীবনসূর্যটারও ঐ একই গতি। বাল্যের জীবনসূর্যের উদয়ের মতো ধীরে ধীরে পূর্ণতায় এসে তথা পূর্ণ যৌবনে এসে পুনরায় বুড়ো হতে থাকে তথা ঢলে যেতে থাকে এবং একসময় মৃত্যুর আঁধারে ঢেকে যায়, সূর্য যেমন রাতের আঁধারে ঢেকে যায়। জীবনসূর্যটি যে থমকে দাড়িয়ে নেই। প্রতিটি মুহূর্তে এ যে ঢলে যাচ্ছে। কোথায়? এক ঘন অন্ধকারের মাঝে। তাই জীবনরূপ সূর্যের ঢলে যাবার কারণে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সালাত কায়েম করতে। কারণ, সালাত তথা যোগাযোগ কায়েম তথা স্থায়ী হয়ে গেলেই আপন পরিচয় প্রথম মেলে তথা ভোরের কোরান-এর যে রহস্য উহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। কোরান-এর সঙ্গে পরিচিত হবার কী সুন্দর এবং অপূর্ব ডাক দিচ্ছেন। এই কোরান কাগজ অথবা শিলালিপি অথবা চামড়া বা যে কোনো জিনিসের উপর কালির নকশা আঁকা কোরান নয়। কারণ, ইহা আসল কোরান-এর পরিচয় পাবার কতগুলো অক্ষরের বাঁধন। এই অক্ষরের বাঁধন, যেটাকে আমরা প্রায় সবাই কোরান বলে জেনে আসছি, উহা হলে, বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যম ছাড়া অসম্ভব। অথচ একজনও নবি বা রসুল মাদ্রাসায় অথবা এই জাতীয় কোনো বিদ্যালয় হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। তাঁরা উম্মি, তথা অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত নন। সুতরাং যাহার সঙ্গে নবি ও রসুলরা পরিচিত নন উহা কখনই একমাত্র ধর্তব্য হিশাবে গণ্যই করা যায় না অর্থাৎ এই জাতীয় বিদ্যালয় হতে শিক্ষা না নিলেও আসল কোরান-এর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। কারণ, আসল কোরান-এ কোনো অক্ষরের বালাই নেই। কারণ, উহা নুরি কোরান। তাই কোরান নিজেই ঘোষণা করছে যে, পবিত্র না হয়ে তথা আমিত্ব ত্যাগ না করে তথা যোগাযোগকে স্থায়ী না করে তথা সালাত কায়েম না করে কেহই কোরানকে বোঝা তো দূরে থাক, কেবলমাত্র স্পর্শ করারও কারো ক্ষমতা নেই। (লা ইয়ামাস্‌সুহু ইল্লাল্‌ মুতাহারুন)। এরপরেও কি আমরা কাগজের লিখিত কোরানকে আসল কোরান বলে

ভুল করবো? তাই অনেক সময় আমরা বিপাকে পড়ে যাই, যখন দেখতে পাই মাদ্রাসা অথবা বিদ্যালয়ে না-পড়া একজন নিরক্ষর (?) আল্লাহ্ ওলি বলে সুপরিচিত।

আমিত্বের অন্ধকার যখন সালাত কায়েমের দ্বারা দূর হয় তখনই প্রথম পরিচয় হয় আসল কোরান-এর তথা নুরি কোরান-এর। এখানে আসল কোরান বলতে বাধ্য হলাম। যদিও আসল বললে নকল কথাটি এসে পড়ে। প্রচলিত ভুল ধারণার জন্যই কোরানকে আসল বলতে বাধ্য হলাম। না হলে কোরান একটিই। যেহেতু কোরান একটিই সেহেতু আসল এবং নকল বলার প্রশ্নই আসতে পারে না। যেহেতু কোরান কাকে বলে বলতেই আমরা প্রায় সবাই ভুল করে বসি, কারণ ভুল ধারণাটাই আমাদের ভুল প্রচারণার দরুণ হয়েছে, সেহেতু 'আসল কোরান' শব্দটি ব্যবহার করতে অনেকটা বাধ্য হলাম।

আসল *কোরান*-এর সঙ্গে যখন প্রথম হয় পরিচিত সেই পরিচয় কতই না মধুর। রাতের আঁধার কেটে যখন দিনের আগমন হয় এবং সম্পূর্ণ দিনটির প্রথম আগমনীর বার্তাকে আমরা দিনের ভোরবেলা বলি। সে রকম সম্পূর্ণ *কোরান*টির প্রথম আগমনীর বার্তাকে বলা হয়েছে ভোরের *কোরান* তথা ফজরের *কোরান*। সালাত কায়েম করো ফজরের *কোরান*-এর জন্য কী অপূর্ব ভাষার লালিত্য! যারা মাদ্রাসায় পাঠ করেন নি অথবা অন্যকোথাও, তারা কী করে সালাত কায়েম করবেন? অথচ *কোরান* সবাইকে ডাকছে, সবাইকে বলছে প্রথম *কোরান*-এর দিদারের জন্য। প্রথম মানেই ভোরবেলার *কোরান*-এর জন্য। তাই ভোরবেলার *কোরান*কে পেতে চাইলে সবাইকে বলছে সালাত কয়েম করো তথা যোগাযোগ স্থায়ী করো। রাত পেরিয়ে যখন দিনের প্রথম আগমন হয় এবং সেই আগমনের সত্যতা যেমন যাচাই করার কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন ও প্রশ্নই থাকে না এবং উহা আপন মূর্তিতে সত্যসহ আপনা আপনি প্রমাণিত, ঠিক সে রকমভাবেই সাধনার দ্বারা আমিত্বের অন্ধকার পেরিয়ে আপন পরিচয়ের প্রথম পরিচয় লাভ করে, সেই পরিচয়ের আর একটি নামই হলো ফজরের *কোরান* এই *কোরান*-এর পরিচয়– যে লাভ করেছে তার আর সাক্ষী-প্রমাণের কোনো প্রয়োজন হয় না। কারণ, তার সাক্ষী ও প্রমাণ সে যে নিজেই। তাই ফজরের *কোরান* হলো সত্যরূপে প্রমাণিত। আর আমিত্বের বাঁধনে যারা জড়িয়ে আছে, যারা ছয়টি রিপুর তাড়নার তাড়া খেয়ে রিপুর কোলে ঘুমিয়ে আছে, তারা কি এই ফজরের *কোরান*কে পারবে স্পর্শ করতে? কারণ, এই *কোরান*-এর ওজন যে সাংঘাতিক ভারী তাই তো পাহাড়– পর্বত আর সাগর নিতে চায় নি *কোরান*-এর আমানত। মানুষ বোকা, তাই এর আমানত গ্রহণ করেছে। তাই হে মানুষ, তুমি যে *কোরান*-এর আমানত নিলে, তোমার যে জীবনসূর্য চলে যাচ্ছে মৃত্যুর আঁধারে, তাই কায়েম করো সালাতকে সালাত কায়েম হলেই *কোরান*-এর সুপ্রভাত হবে এবং এই *কোরান*-এর সুপ্রভাতের জন্য তুমিই সত্যরূপে তোমার নিজের কাছে প্রমাণিত এবং তখনই তুমি কোরানওয়ালা।

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

যে কোনো মানুষের জীবনে যদি 'ফজরের কোরান' তার রবের ইচ্ছায় তথা আল্লাহ্র ইচ্ছায় লাভ করতে পারেন তবে ইহাই তার জন্য 'মাকামে মাহমুদা'–তে তথা প্রশংসিত মাকামে স্থান পাবার সৌভাগ্য এনে দেয়। এখন সূরা বনি ইস্রাইলের আয়াতগুলো পড়ে দেখুন তো, মিল পান কি না ।

ওয়া মিনাল লাইলে ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাকা – আছা আইয়াবে আসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। (সূরা বনি ইস্রাইল : ৭৯)।

অর্থাৎ 'এবং রাত্রি হতে কিছু সময় সুতরাং উহাতে তাহাজ্জুদ কর– একটি লাভ তোমার জন্য– হয়তো অচিরেই এমনও হতে পারে যে, তোমার রব তোমাকে উঠিয়ে নেবেন মাকামে মাহমুদাতে।'

কাগজ, পাথর এবং চামড়ার উপর লিখিত *কোরান* যদি কয়েক মণ হতে হাজার মণের মতো ওজনও হয় এবং উহা পাহাড়-পর্বতে যদি রাখা হয়, তাতে কি পাহাড়-পর্বত ধ্বংস হবে অথবা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে? না, তা হবার প্রশ্নই আসে না। তা হলে *কোরান* পাক এ কেমন কথা বলছে? কাগজের *কোরান*কেই যদি ধরে নিলাম ইহাই একমাত্র *কোরান*, তা হলে তো পাহাড়-পর্বত এবং সাগরের এরূপ অবস্থা হতেই পারে না। যেহেতু এরূপ অবস্থা, যাহা *কোরান*-এ বর্ণিত হয়েছে, হতেই পারে না সেহেতু কাগজের *কোরান* *কোরান* নয়, বরং ইহা আক্ষরিক *কোরান*। **নুরি *কোরান*ই প্রকৃত *কোরান* এবং একমাত্র *কোরান* এবং ইহা আমিত্ব তথা স্বকীয়তা নামক অন্ধকার সালাত কায়েম দ্বারা দূর করে অর্জন করতে হয় এবং ইহা অর্জন যার হয়ে গেছে তার আত্মপরিচয় লাভ করা হয়ে গেছে।**

মাওলানা আবদুল হাকিম এবং মাওলানা আলি আহসান *কোরান*-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যাটি এমনভাবে বিকৃত করে ফেলেছেন যে অবাক হতে হয়। কত প্রকার অনুবাদ ও তফসিরের দোহাই যে উনারা দিয়েছেন নিজেদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে সহি বলে প্রমাণিত করার প্রয়াসে। অথচ ইনারা ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন রচিত অনুবাদের কঠোর এবং জঘন্য অপাঠ্য সমালোচনা করেছেন। উহা এই উভয় পন্ডিত কর্তৃক রচিত অনুবাদ হতে শতগুণে ভালো, যদিও ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের অনুবাদে হাজারো একই ভুল দেখা যায়। শ্রদ্ধেয় মাওলানা হাকিম ও আলি আহসান 'ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন' নামটিকে জনৈক বলতেও লজ্জা পান নি। এইবার এই উভয় মাওলানার অনুবাদ হুবহু তুলে দিলাম। পাঠকই ইহার বিকৃত করার নমুনাটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। 'সূর্য অস্ত-পথে অবনমিত হইবার পর রজনীর অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর এবং প্রভাতে *কোরান* পাঠ কর, এবং প্রভাতের *কোরান* পাঠ সাক্ষীস্বরূপ হইবে।' 'ফজরের *কোরান*' কে '*কোরান* পাঠ কর' নতুন মাল আমদানি করা হলো। এই বাক্য মাল কোথা হতে আমদানি করা হলো পাঠকের প্রশ্ন। ইহা তো গেল অনুবাদের শ্রী। এবার উভয় মাওলানা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাঞ্জেগানা ফরজ নামাজের কথা এই আয়াত হতে 'সোনার খনি পেয়েছি' বলার মতো আবিষ্কার করে ফেললেন। এই আবিষ্কারের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে গিয়ে বলেছেন যে, এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আবিষ্কার তারা করেন নি। ইহার আবিষ্কার করেছেন এত্যা বড় *তফসিরে ইবনে আব্বাস, তফসিরে জরির, তফসিরে কবির, তফসিরে হাক্কানি ও তফসিরে মোহাম্মদ আলি।* পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এই

আটাত্তর নম্বর আয়াত হতে পেয়ে গেছেন। ইহারই নাম বোধহয় আমাদের দুর্ভাগ্য। আটাত্তর নম্বর আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথায় যে কতখানি গোঁজামিল দেওয়া হয়েছে তার নমুনা তুলে ধরছি। এই সুরাটি তথা বনি ইস্রাইল সূরাটি মক্কাতে নাজেল হয়েছে এবং নাজেলের ধারাবাহিক নম্বর হিশাবে এই সূরার নম্বর হলো পঞ্চাশ এবং হজরত উসমানের দেওয়া ধারাবাহিক নম্বর হল সতের। আনুষ্ঠানিক পাঁচ অথবা (তাহাজ্জুদসহ) ছয় ওয়াক্ত নামাজ পড়ার আদেশ হিজরতের পর মদিনায় নাজেল হয়েছিল। যেহেতু আনুষ্ঠানিক পাঁচ অথবা ছয় ওয়াক্ত নামাজের আদেশ মদিনায় নাজেল হয়েছিল সেহেতু মক্কায় আনুষ্ঠানিক সালাত পালন করার আদেশ দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যদিও আমরা মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে সালাত কায়েম করার আদেশ অনেকবার পেয়েছি। কিন্তু এই সালাত কায়েম করার অর্থ নীতিগত সালাত, আনুষ্ঠানিক জমাতবন্দি সালাত নয়। এই নীতিগত সালাতের মতো জাকাত বিষয়টিও একই রকম নীতিগত জাকাত। আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ বিশেষ কয়টি মানবকল্যাণের জন্য ব্যয় করার যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, *কোরান* পাক ইহাকে জাকাত বলে নি। ***জাকাত বলতে মানবীয় আমিত্বের অথবা মানবের স্বকীয়তার পরিপূর্ণ উৎসর্গ বোঝায়*** এবং এই কারণে সালাত এবং জাকাত একসঙ্গে ঘোষণা করার কথা প্রায় ত্রিশবারের মতো পাওয়া যায়। এই নীতিগত সালাত এবং জাকাত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও নয় এবং আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ খাজনা আদায়ও নয়। ***শতকরা আড়াই ভাগ খাজনা, যাকে আমরা জাকাত বলে মনে করে থাকি, ইহার প্রচলন শুরু হয়েছে মদিনায় এবং এই প্রকার খাজনাওয়ালা জাকাতকে কোরান জাকাত নামটিও প্রদান করে নি, বরং সাদকা নাম দিয়েছে*** এবং যেখানেই খাজনার জাকাতের কথা পাবেন সেখানেই সাদকা শব্দটি অবশ্যই পাবেন, কিন্তু জাকাত শব্দটি একটি স্থানেও পাবেন না। পাঠক তাই, ইহা অভি চমকপ্রদ। একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করে দেখুন তো কোথায় জাকাত আর কোথায় হলো সাদকা। কিন্তু মাশাল্লাহ! ভুলের পাহাড়ে জাকাতের সৌন্দর্য ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং লেজকাটা রূপটি মুসলিম সমাজে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখনো চলে আসছে। এই সাদকাকেই জাকাত নাম দিয়ে রাষ্ট্রীয় খাজনাগুলোর একটি খাজনার নামকরণ করা হয়েছে অর্থাৎ সাদকাকেই খাজনাতে জাকাত এক নামে পরিচিত হয়েছে। দুই চোখই কানা অথচ পদ্মের মতো সুন্দর চোখের মালিক পদ্মলোচন নাম রাখা হয়েছে কানা ছেলের নাম। এখন চোখ না থাকুক নাম তো রাখা হয়েছে পদ্মলোচন! জাকাত এবং সাদকার ভুলটা অনেকটা এ রকম। 'জাকাত' নামের 'সাদকা' মানুষের স্বকীয়তার জাকাত তথা উৎসর্গ নয় ইহা মালের জাকাত। কারণ 'জাক্কা' শব্দ হতে জাকাত শব্দের উৎপত্তি। 'জাক্কা' অর্থ পবিত্রকরণ। সালাত এবং জাকাতের মতো *কোরান*কেও ঐ একই রকম অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে । অথচ *কোরান* যে নুরি *কোরান*, কাগজের *কোরান* নয়, এ কথা আমরা জানবার সুযোগ পেলাম না। পাহাড়কে ভয়ে বিচূর্ণ অবস্থায় দেখার প্রশ্নই আসতে পারে না যদি নুরি *কোরান*কে কাগজি *কোরান* বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সত্যিই যদি নুরি *কোরান*কে পাহাড় এবং সাগরে অথবা যে কোনো স্থানের উপর নিক্ষেপ করতেন তবে কী অবস্থা যে হতো উহার একটি নমুনা আমরা শুনতে পাই।

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

– শুনতে পাই যে, আল্লাহর নুরের অতি সামান্য একটু অংশ তুর পাহাড়ের উপর পতিত হবার পর তুর পাহাড়ের কী শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। অবশ্য কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, উহা তো আল্লাহর নূর এবং নুরি *কোরান* নয়, তা হলে অবশ্যই তার প্রশ্নের সঙ্গে আমিও একমত হতে বাধ্য হবো বিশেষ কয়টি কারণে। যদিও আগুনের শিখা আগুন হতে আলাদা নয়, তেমনি নুরি *কোরান* আল্লাহ্‌র নুরের সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা এবং মোটেই অবাক হবার কিছু নয় যদি আল্লাহ সত্যি সত্যিই *কোরান*কে পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করতেন। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমার লিখিত ***'মারেফতের গোপন কথা'*** নামক বইটিতে)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪১

কোরান-এর ১৭ নম্বর সুরা বনি ইসরাইলের ৭৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং রাতের অংশে তাহাজ্জুদ (সাধন প্রচেষ্টা) কর, ইহা তোমার জন্য অতিরিক্ত বিষয়। হয়তো তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। (*ওয়া মিনাল লাইলে ফাতাহাজ্‌জাদ্‌ বিহী নাফেলাতাল্‌লাকা আসা আন ইয়াবাআসাকা রাব্‌বুকা মাকামান্‌ মাহমুদান্‌*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪২

কোরান-এর ১৭ নম্বর সুরা বনি ইসরাইলের ১১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : বল, তোমরা আল্লাহকে ডাক অথবা রহমানকে ডাক, যে নামেই ডাক না কেন, সব সুন্দর নামই তো তাহার। (*কুলিদ উল্‌লাহা আভেদ্‌উর রাহমানা আইইয়ামান তাদ্‌উ ফালাহুল আসমাউল হুস্‌না*)। এবং তুমি তোমার সালাতকে প্রকাশ করিও না এবং গোপনও করিও না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিও। (*ওয়ালা তাজহার বেসালাতেকা ওয়ালা তুখাফেদবেহা ওয়াব্‌তাগে বাইনা জালীকা সাবিলান্‌*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৩

কোরান-এর ১৯ নম্বর সুরা মরিয়মের ৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: এবং যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। আমাকে আদেশ করিয়াছেন যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করিতে। (*ওয়া জ্বাআলানী মুবারাকান আইনা মা কুন্‌তু ওয়া আওসানী বিস্‌সালাতি ওয়ায্‌যাকাতি মাদুম্‌তু হইয়্যাও*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৪

কোরান-এর ১৯ নম্বর সুরা মরিয়মের ৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: তিনি (ইসা) তাঁর পরিবারকে নামাজ ও জাকাত আদায়ের আদেশ করিতেন আর স্বীয় রবের কাছে ছিলেন প্রিয়পাত্র। (*ওয়া কানা ইয়ামুরু আহলাহূ বিস্-সালাতি ওয়ায্যাকাতি ওয়াকানা ইন্দা রাব্বিহী মার্দ্বিয়্যা)*।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৫

কোরান-এর ২০ নম্বর সুরা ত্বা-হার ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমার এবাদত কর এবং সালাত কায়েম কর জিকিরের জন্য। (*ইন্নানী আনাল্লাহু লাইলাহা ইল্লা আনা ফাবুদ্নী ওয়া আকিমিস্ সালাতা লিযিকরী*)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৬

কোরান-এর ২০ নম্বর সুরা ত্বা-হার ১৩০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং রাতের মধ্যে এবং দিনের শেষ সীমায় তসবিহ পড়ুন। (*ওয়া মিন্ আনায়ি লাইলি ফাসাব্বিহ ওয়া আত্বরাফান নাহারি*)।

ব্যাখ্যা

কোরান-এর প্রতিটি আরবি শব্দের যথাসাধ্য হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক *কোরান* তফসির এবং অনেক আরবি লোগাত্ ও *কোরান*-এর লোগাতসমূহ বার বার ভালো করে একদম নিরপেক্ষ মন নিয়ে পড়ার জন্য একটু কষ্ট করতে হয় বৈকি! প্রতিটি শব্দের হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে যদি বুঝতে না পারি তো সোজা বলে দেই যে এ আয়াতের অর্থটি আমাদের জানা নাই। যার দরুন *কোরআনুল মাজীদ* নাম দিয়ে মাত্র ১৬ পারা হুবহু অনুবাদ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছি এবং এই ১৬ পারার হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে আমাকে অনেকবার এই কথাটি লিখতে হয়েছে যে, এই আয়াতের মর্মার্থটি অধম লিখকের জানা নাই। হুবহু এই জন্য রাখলাম যে আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেউ না কেউ এই আয়াতের মর্মার্থটি উদ্ধার করতে পারবে। সুসংবাদ এইটুকু যে এই ১৬ পারার অনুবাদের পুস্তকটি পাঠকদের কাছে প্রশংসাই পেয়েছে। এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে দিন দিনই পাঠকের সংখ্যা বেড়ে চলছে। পাঠক মনে করে যে সবাই যখন বুঝতে পেরেছে তখন এই অনুবাদক অকপটে অনেকবার স্বীকার করে নিয়েছে যে এই আয়াতের মর্মার্থটি আমার জানা নাই। এই 'জানা নাই' দুইটি শব্দ যে পাঠকের কাছে এতই প্রিয় হয়ে উঠবে তা অধম লিখকের জানা ছিল না।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৭

কোরান-এর ২০ নম্বর সুরা ত্বা-হার ১৩২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং আদেশ করুন আপনার আহালদের (পরিবার পরিজন)-কে সালাতের সহিত এবং অটল থাকুন উহার উপরে (*ওয়া মুর আহ্লাকা বিস্সালাতি ওয়াস্তাবির আলাইহা)*।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৮

_কোরান_-এর ২১ নম্বর সুরা আম্বিয়ার ৭৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং আমরা ওহি করিলাম তাহাদের উপরে খয়রাতের মধ্যে (দানের মধ্যে), নামাজ কায়েম করিতে এবং জাকাত আদায় করিতে এবং তাহারা আমাদের [এখানে একবচন তথা 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি] ইবাদত করিত। (_ওয়া আওহাইনা ইলাইহিম ফিলাল খাইরাতি ওয়া ইকামাস্ সালাতি ওয়া ইতায়ায্ যাকাতি ওয়া কানূলানা আবেদীন_)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৪৯

_কোরান_-এর ২২ নম্বর সুরা হজের ২৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং পবিত্র রাখো আমার ঘরকে তওয়াফকারীদের জন্য এবং কেয়ামকারীদের এবং রুকু-সেজদাকারীদের। (_ওয়া ত্বাহ্হির বাইতিয়া লিত্তায়িফীনা ওয়াল কায়িমীনা ওয়ার রুক্কাইস সুজূদ)_।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৫০

_কোরান_-এর ২২ নম্বর সুরা হজের ৩৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং সালাত কায়েম করে এবং যে রেজেক আমরা দান করিয়াছি [আল্লাহ একবচন ব্যবহার করেন নি] তাহা হইতে ব্যয় করে। (_ওয়াল মুকীমিস সালাতি ওয়া মিম্মা রাযাক্নাহুম ইয়ুনফিকুন_)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৫১

_কোরান_-এর ২২ নম্বর সুরা হজের ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যাহাদেরকে আমরা জমিনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, সালাত কায়েম করিতে এবং জাকাত প্রদান করিতে। (_আল্-লাজিনা ইম্ মাক্কানাহুম ফিল আরদ্বি আকামুস্ সালাতা ওয়া আতুয্যাকাতা_)।

ব্যাখ্যা

সালাত কায়েম তথা নামাজ কায়েম করার প্রশ্নে _কোরান_-এ যে ৮২ বার উল্লেখ করা হয়েছে উহাই কোথাও অতি সংক্ষেপে একটি পূর্ণ আয়াতের কিছু অংশ কাটছাঁট করে দেখিয়েছি, আবার কোথাও পূর্ণ আয়াতটিকে অনুবাদ করেছি। পাঠক যাতে অবাক না হন তারই জন্য এই কথাগুলো বললাম। আমার প্রধান উদ্দেশ্যটি হলো নামাজের কথাটি যে _কোরান_-এ ৮২ বার বলা হয়েছে উহাই অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৫২

_কোরান_-এর ২২ নম্বর সুরা হজের ৭৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে আমানুগণ, তোমরা রুকু করো, সেজদা করো, এবং তোমাদের রবের এবাদত করো, এবং সৎকর্ম করো যাতে সফলকাম হইতে পারো। (_ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানুর্কাউ ওয়াস্জুদু ওয়াবুদু রাব্বাকুম ওয়াফ্ আলুল খাইরা লাআল্লাকুম তুফ্লিহুন_)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৩

_কোরান_-এর ২২ নম্বর সুরা হজের ৭৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্ত করে ধরো, তিনি তো তোমাদের মাওলা, তিনি কতোই উত্তম মাওলা এবং উত্তম সাহায্যকারী। (_ফাআকীমুস্ সালাতা ওয়া আতুয্ যাকাতা ওয়া তাসিমু বিল্লাহি হুওয়া মাওলাকুম ফানিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির_)।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৪

_কোরান_-এর ২৩ নম্বর সুরা মুমিনুনের ১–২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : অবশ্যই মোমিনেরা সফল হইয়াছে, যাহারা তাহাদের সালাতের মধ্যে বিনয়ী। (_ক্বাদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযীনাহুম ফী সালাতিহিম খাশিউন_)।

ব্যাখ্যা

এই সুরাটিতে প্রথমেই মোমিন হবার তথা শর্ত মোমিনদের পরিচয়টি দেওয়া হয়েছে। সাবধান! ভুল করে যেন আমানুদেরকে মোমিনদের সাথে মিলিয়ে না ফেলেন। তা হলে ডাইলে-চাউলে খিচুড়ি হয়ে যাবে।

প্রথমেই মোমিন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ মোমিনদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন। সমগ্র _কোরান_-এ আল্লাহ যে চারজনের সঙ্গে থাকেন সেই চারজনের একজন হলেন মোমিন। সুতরাং মোমিনের দরজা মুক্তির দরজা। মোমিন জান্নাতুল ফেরদৌসে অবস্থান করা অধিবাসী। মোমিনদের বিশেষ কয়টি চারিত্রিক গুণাবলি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন : সালাত কায়েমে তাঁরা বিনয়ী। আজেবাজে কথা তথা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকেন। তাঁরা জাকাত আদায় করেন। তাঁরা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করেন, তবে নিজেদের স্ত্রীদের _এবং ডান হাতের অধিকারীদের_ সঙ্গে যৌনমিলন দোষণীয় বলে গণ্য হবে না। তাঁরা আমানত রক্ষা করেন এবং ওয়াদা করলে সেই ওয়াদা রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এই গুণগুলো যাঁদের মধ্যে আছে তাঁরা নিঃসন্দেহে _কোরান_ অনুসারে মোমিন। _কোরান_ বলছে মোমিনেরা বিজয় লাভ করেছে। যুদ্ধ থাকলেই বিজয়ের প্রশ্ন আসে। এই যুদ্ধটি তরবারির যুদ্ধ নয়, বরং আপন নফ্স হতে খান্নাসরূপী শয়তানকে তাড়িয়ে দেবার যুদ্ধে জয়লাভ করা। মোমিনেরা যে

নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানের হাতগুলো কেটে দেবার যুদ্ধ করেছেন এবং সেই যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন, সেই যুদ্ধটিকেই বলা হয়েছে জেহাদে আকবর তথা সবচেয়ে বড় জেহাদ। সুতরাং মোমিনের প্রকৃত পরিচয়টি না জেনে যারা মোমিনের আগে 'প্রকৃত' শব্দটি লাগায় তাদের আরও একটু নিরপেক্ষ গবেষণা করার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রকৃত মোমিন শব্দটি শুনতে অনেকটা সোনার পাথরের বাটি তথা আত্মবিরোধী তথা ডার্ক কনট্রাডিকশন মনে হয়। পচা-বাসি-ভেজাল খাদ্য খেলে যেমন অসুস্থ হবার সম্ভাবনাটি থেকে যায়, সে রকম এই জাতীয় কাঁচা হাতের লিখনি মানুষকে বিব্রতের অবস্থায় ফেলে দেবার সম্ভাবনাটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৫

কোরান-এর ২৩ নম্বর সুরা মুমিনুনের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং যাহারা তাহাদের সালাতের উপরে হেফাজতকারী। *(ওয়াল লাজিনা হুম আলা ছালাওয়া তিহিম ইউহাফিজুন)।*

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৬

কোরান-এর ২৪ নম্বর সুরা আন্-নূরের ৩৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : (সেইসব) লোকেরা তাহাদের বিরত রাখে না ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কেনা-বেচা আল্লাহ্‌র জিকির হইতে এবং সালাত কায়েম করা হইতে এবং জাকাত আদায় হইতে, তাহারা ভয় করে সেই দিনে যেদিন তাহাদের অন্তর ও চোখগুলি উল্টাইয়া যাইবে। [হুবহু রাখার দরুন বাক্যটিকে ইচ্ছা করেই সাজালাম না।] *(রিজালুন্ লাতুলহীহিম তিজারাতুঁও ওয়ালা বাইউন আন যিকরিল্লাহি ওয়া ইকামিস্ সালাতি ওয়া ইতায়িয্ যাকাতি ইয়াখাফুনা ইয়াওমান তাতাকাল্লাবু ফীহিল কুলুবু ওয়াল আবসার)।*

ব্যাখ্যা

সেইদিনটি হলো যেদিন মারা যাবে। কী অপূর্ব ভাষায় চোখ উল্টে যাবে বলা হয়েছে। কারণ এইসব লোকেরা বেচা-কেনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো নিতান্ত বৈষয়িক বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করেও আল্লাহ্‌র জিকির হতে বিরত থাকতো না। কেবল আল্লাহ্‌র জিকিরই নয়, বরং সালাত কায়েম এবং জাকাত আদায়ের বিষয়গুলো সব সময় পালন করতো। বেচা-কেনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যদিও দুইটি শব্দ, কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটি হলো এক। বৈষয়িক বিষয়ের প্রশ্নে কেনা-বেচার সময়ে আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল থাকা এবং সালাত আদায় করা এবং জাকাত আদায় করা– এই তিনটি বিষয় মোটেও সহজ কাজ নয়; তাই চোখ উল্টানো মরণকে এরা তো ভয় করেই না বরং মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভেবেই আলিঙ্গন করে নেয়। এবং আল্লাহ্‌র দরবারে উচ্চ মর্যাদার সম্মানিত আসনে সমাসীন হয়। [এই জিকির, এই সালাত, এই জাকাত দায়েমি তথা স্থায়ী। মহানবি বলেছেন, '*আস্ সালাতুদ্ দাওয়ামি আফজালুম মিনাল সালাতিল ওয়াক্তি*' অর্থাৎ 'ওয়াক্তিয়া নামাজ হতে দায়েমি সালাত তথা সর্বক্ষণ সালাতে থাকা অনেক মর্যাদাকর']। এই দায়েমি সালাতের কথাটি *কোরানুল হাকিম*-এ সুরা মারেজের ২৩ নম্বর

আয়াতেও বলে দেওয়া হয়েছে। *ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কেনা-বেচার সময়ে আল্লাহ্‌র জিকিরে থাকা কোনো মামুলি বিষয় নয়, ইহা কেবল উচ্চস্তরের আমানুগণের পক্ষেই সম্ভব।*

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৭

কোরান-এর ২৪ নম্বর আন-নূরের ৫৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং রসুলের অনুসরণ করো যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত পাইতে পারো। *(ওয়া আকীমুস সালাতা ওয়া আতুয্ যাকাতা ওয়া আতীউর রাসূলা লা আল্লাকুম তুর হামূন)।*

ব্যাখ্যা

এখানে তিনটি বিষয় পালন করার কথাটি বলা হয়েছে : একটি সালাত কায়েম, অপরটি জাকাত আদায় এবং অপরটি রসুলের এত্তেবা করা তথা আনুগত্য গ্রহণ করা। সালাত আদায় করাটিও রসুলেরই আনুগত্য গ্রহণ করা, আবার জাকাত আদায় কথাটিও একই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তা হলে আবার রসুলের আনুগত্য করার বিষয়টি বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে? আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধানগুলো আন্তরিকভাবে পালন করাতেই তো রসুলের আনুগত্য করা বুঝায়। একটু খেয়াল করুন, এখানে নবির আনুগত্য করার কথাটি বলা হয় নি। কেন এখানে 'নবি' শব্দটি ব্যবহার না করে 'রসুল' শব্দটি ব্যবহার করা হলো? 'খাতামান নবি' আমরা পাই, কিন্তু 'খাতামার রসুল' সমগ্র *কোরান*-এ একবারও বলা হয় নি। কেন বলা হয় নি? বলা হয় নি এ জন্য যে, রসুল শব্দটি সার্বজনীন। তাই মহানবি সার্বজনীন নামটিকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। আমরা *কোরান*-এ কয়েকটি সুরার কয়েকটি আয়াতে দেখতে পাই যে ফেরেশতারাও রসুল। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে সমগ্র *কোরান*-এর একটি আয়াতেও নবিরূপে দেখতে পাই না। ফেরেশতা যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, যত ক্ষমতাই তাকে দেওয়া হোক না কেন, কিন্তু ফেরেশতাদের নফ্‌সও দেওয়া হয় নি এবং রুহ তো দেবার প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু আদমের ভেতর আল্লাহ রুহ ফুৎকার করে দিয়েছেন সেই হেতু নফ্‌স-ও রুহ-বিহীন ফেরেশতাদেরকে সেজদা করতে তথা আনুগত্য গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। *কোরান*-এ একবারও বলা হয় নি যে 'নাহনু আকরাবু ইলাইহে মালাইকাতান, হাবলিল ওয়ারিদ,' অর্থাৎ ফেরেশতাদের শাহারগের নিকটেই আল্লাহ আছেন, তা-ও আবার 'আমি'-রূপে নয় তথা 'আনা'-রূপে নয়, বরং 'আমরা'-রূপে, বহুবচনে,' 'নাহনু'-রূপে। এরপরেও অনেক অনেক ভেদ-রহস্যের গুপ্তকথার ভান্ডারগুলো খুলে দেওয়া যায়, কিন্তু দিলাম না। ফেরেশতারা তো আল্লাহ্‌র সেফাতি নুরের তৈরি (জাতনুরের নয়)। ফেরেশতাদের যেখানে নফ্‌সও দেওয়া হয় নি এবং রুহও দেওয়া হয় নি এবং নির্বাচন করার ক্ষমতাটি পর্যন্ত দেওয়া হয় নি তাই ফেরেশতাদের তো শাহারগই নাই। তাই আল্লাহ্‌র 'জাত'-রূপে থাকার প্রশ্নটিও অবান্তর।

প্রত্যেকটি ইনসানে কামেল তথা পীরে কামেল তথা অতি উচ্চ স্তরের ওলিদের পায়রবি তথা যো-হুকুমের দারোয়ানরূপে ফেরেশতাদের দন্ডায়মান হবার কথাটি জানতে পারি। পীরানে পীর দস্তগীর

মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি গাউসে সামদানি শেখ সৈয়দ মাওলানা মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানিকে আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীরা অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে এবং ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা কাফেরে আকবর ও কাফেরে আউয়াল তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কাফের (?) বলে (নাউজুবিল্লাহ) এবং শিয়া ফেরকার অনুসারীরা 'ম্যাজিশিয়ান' তথা যাদুগীর বলে থাকে (নাউজুবিল্লাহ)। সেই বড়পীর সাহেব তাঁর লিখিত কেতাবে বলেছেন যে, কারবালায় শহিদে আজম ইমাম হুসাইনের রওজা মোবারকে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা কান্নাকাটি করেন এবং সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত অন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা কান্নাকাটি করেন। এখন বলতে চাই, এই ফেরেশতারাই রসুল হয়, কিন্তু নবি হয় না এবং নবি মানুষ হতেই হয়। তবুও এত কিছু জানার পরও আমরা কোনো ইনসানে কামেল তথা পীরে কামেলকে ভুলেও রসুল বলতে চাই না। (আকালমান্দকে লিয়ে ইশারাই কাফি)।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৮

কোরান-এর ২৪ নম্বর সুরা আন-নূরের ৫৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে আমানুগণ, যাহারা তোমাদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বালেগপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা তোমাদের অনুমতির জন্য তিন সময়ে (অপেক্ষা করিবে), ফজরের সালাতের পূর্বে এবং গরমের সময়ে দুপুরে যখন তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ এবং এশার সালাতের পর। [এই আয়াতের মর্মার্থ অধম লিখকের জানা নাই, তবে সদর উদ্দিন আহমদ চিশতির রচিত *কোরান দর্শন* নামক *কোরান* তফসিরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।] *(ইয়া আইউহাল্ লাজিনা আমানু লিইয়াস্তা যিন্কুমুল লাযীলা মালাকাত আইমানুকুম ওয়াল্লাজিনা লাম ইয়াব্লুগুল হুলুমা মিনকুম সালাসা মাররাতিন্; মিন্কাবলি সালাতিল ফাজরি ওয়া হীনা তাদ্বাউনা সিয়াবাকুম মিনাজ জোহিরাত ওয়া মিম বাদি সালাতিল ইশায়ি)।*

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৫৯

কোরান-এর ২৬ নম্বর সুরা শুয়ারার ২১৭-২১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং নির্ভর করুন আজিজরূপী (ভাসমানরূপী পরাক্রমশালী) রহিমের উপর যিনি আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেন এবং সেজদাকারীদের মধ্যে আপনার উঠা বসা দেখেন। *(ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল আযীযির রাহীম। আল্লাযী ইয়ারাকা হীনা তাকুমু। ওয়া তাকাল্লাবাকা ফিস্সাজিদীনা)।*

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬০

কোরান-এর ২৭ নম্বর সুরা নমলের ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যাহারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং যাহারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে। *(আল্লাজিনা ইউকীমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনায্ যাকাতা ওয়াহুম বিল আখিরাতি হুম ইউকিনুনা)।*

ব্যাখ্যা

এই আয়াতটির বিষয়ে কিছু কথা লিখতে গেলেই প্রথম দুইটি আয়াতে কী বলা হয়েছে উহা চিন্তা করার বিষয়। 'ত্বা-সীন ওইগুলো *কোরান*-এর আয়াত এবং সুস্পষ্ট কেতাব মোমিনদের জন্য হেদায়েত এবং সুসংবাদ।' তিলকা দু'টিকে অক্ষর না বলে শব্দই বললাম এবং ওই শব্দ দুইটি হলো *কোরান*-এর আয়াত এবং সুস্পষ্ট কেতাব। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় আর সেই প্রশ্নটি হলো এই দুইটি শব্দ যে *কোরান*-এর আয়াত এবং সুস্পষ্ট কেতাব ইহা কাদের জন্য? ইহা ইনসানের জন্য নয় তথা মানুষের জন্য নয়, ইহা মুশরিকদের জন্য নয়, ইহা মোনাফেকদের জন্য নয়, ইহা কাফেরদের জন্য নয়, ইহা আলবাবদের জন্য নয়, ইহা আফসারদের জন্য নয় এবং এমনকি ইমানদারদের জন্যও নয় তথা আমানুদের জন্যও নয়, কারণ এই এতগুলো শ্রেণীর মানুষদের পক্ষে তিলকা দু'টি শব্দ যে *কোরান*-এর আয়াত ইহা বোঝা মোটেই সম্ভবপর নয়। তাই সোজাসুজি বলা হয়েছে যে, এই তিলকার রহস্যটি একমাত্র মোমিনেরাই বুঝতে পারবেন। সুতরাং এই দু'টো শব্দ কেবলমাত্র মোমিনদেরকেই লক্ষ করে বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, বরং আমানুরাও ইহার বিন্দু-বিসর্গ বুঝতে পারবে না। এই তিলকা শব্দ দুইটি মোমিনের জন্য সুসংবাদ, কারণ মোমিনেরা এই শব্দ দুইটির অর্থ ও রহস্য ভালোভাবে জানেন বলেই ইহা সুসংবাদ এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পথে বিরাট একটি মহামূল্যবান পাথেয়, অনেকটা আমাদের দেশীয় ভাষায় যেমন বলা হয় : সবার জন্য জঙ্গলের খড়ি, কিন্তু মোমিনদের জন্য জরি। ডাক্তার-কবিরাজরা জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যে ঔষধি গাছটি রোগ নিরাময় করে সেই গাছটি খুঁজে নেন। ডাক্তার-কবিরাজের চোখে জরি আর সাধারণ মানুষের চোখে ওই গাছটি হলো জঙ্গলের খড়ি।

আল্লাহ কোনো কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। *কোরান*-এর এই শব্দগুলোকে আমরা না বুঝে *কোরান*-এর সাংকেতিক চিহ্ন নামের লেবেল এঁটে দিয়েছি এবং বুঝাতে চেয়েছি যে, এইগুলোর অর্থ এক আল্লাহই জানেন। যদি কারো-না-কারো জন্য এই শব্দগুলো রহস্য জানবার গুপ্ত ভাষা না হতো তা হলে মোমিনদের কথাটি উল্লেখ করা হতো না। যদি কেউ না কেউ বুঝতেই না পারে তা হলে এই শব্দগুলোর সার্থকতাটি কোথায় থাকে? আল্লাহ তো এমনিতেই সব কিছু জানেন : তা হলে না বুঝতে পেরে আল্লাহ্‌র ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস হয়ে যাবার কথাটি একদম মানায় না।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬১

কোরান-এর ২৯ নম্বর সুরা আনকাবুতের ৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: তেলাওয়াত কর যাহা তোমার দিকে আল কেতাব হইতে ওহি হয় এবং সালাত কায়েম কর, নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও অবিশ্বাস নিবারণ করে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র জিকির আকবর (শ্রেষ্ঠ)। আল্লাহ জানেন তোমরা যাহা বানাইতেছ। *(উত্‌লু মাউহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি ওয়া আকিমিস্‌ সালাতা; ইন্নাস্‌ সালাতা তান্‌হা আনিল্‌ ফাহ্‌শায়ি ওয়াল মুনকারি; ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবারু; ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাস্‌নাউন)।*

ব্যাখ্যা

নিশ্চয়ই সালাত তথা নামাজ অশ্লীলতা নামক মন্দ বিষয়গুলো এবং ছোট ছোট অবিশ্বাসগুলো দূর করে দেয়। এই দু'টো বিষয় হতে মুক্ত রাখে বলে 'নিশ্চয়ই' শব্দটি সালাতের আগে ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিষয়টি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক তথা পজিটিভ এবং নেগেটিভ দু'রকমভাবেই চিন্তা করা যায়। তবে ইতিবাচক দিকটি হলো, যারা অশ্লীল এবং মন্দ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের এই সালাত ধীরে ধীরে অশ্লীল ও মন্দ হতে মুক্ত করে দেয়। আমরা হজরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনাতে পাই যে, মহানবির সঙ্গে এক মহাপাপী নামাজ আদায় করতো। এই মহাপাপীর পাপের বিষয়গুলো মহানবিকে জানানোর পর মহানবি বললেন যে, এই নামাজই তাকে সমস্ত রকম পাপ কাজ হতে একদিন বিরত রাখবে এবং বাস্তবে তাই হয়েছিল। হজরত হাসানও বলেছেন, ***যে-নামাজ নামাজিকে তার পাপসমূহ হতে বিরত রাখে না, সেই নামাজ নামাজই নয়।*** তার ওই নামাজ পড়া আর না পড়া একই কথা। কারণ নামাজ যেখানে মন্দ কাজ হতে অবশ্যই বিরত রাখে বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে মন্দ কাজ হতে যদি বিরত না হতে পারে তো সোজা কথায় সেই নামাজ সম্পূর্ণ নিষ্ফল তথা বেকার। কচু কাটতে কাটতে যেমন ডাকাত হয় তেমনি নামাজ পড়তে পড়তে আল্লাহ্‌র ওলিও হয়। প্রথমটি নেগেটিভ তথা নেতিবাচক, পরে পজিটিভ তথা ইতিবাচক। বাস্তব জীবনে মানুষের উপর উভয় প্রকার কর্মফল দেখতে পাই।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬২

কোরান-এর ৩০ নম্বর সুরা আর রুমের ১৭-১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং আল্লাহ্‌র তসবিহ পাঠ কর সন্ধ্যায় ও ভোরে এবং তাঁরই জন্য একমাত্র প্রশংসা আকাশসমূহ এবং জমিনে এবং রাতের বেলায় ও দুপুর বেলায়। *(ফাসুবহানাল্লাহি হীনা তুমসুনা ওয়াহীনা তুসবিহূন। ওয়ালাহুল হামদু ফিস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া আশিয়্যাঁও ওয়াহীনা তুজহিরূন)।*

ব্যাখ্যা

প্রশংসা দুই প্রকার : একটি প্রশংসা মৌখিক, অপরটি আন্তরিক। একটি মেজাজি প্রশংসা, অপরটি হাকিকি প্রশংসা। দুটোরই প্রয়োজন আছে। মুখের প্রশংসাটির মূল্য কতটুকু তা আল্লাহই নির্ধারণ করবেন। এবং আন্তরিক প্রশংসা তথা হাকিকি প্রশংসা তখনই একজন সাধক করতে পারেন যখন আপন নফ্‌সের সঙ্গে পরীক্ষা করা জন্য যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এখানে একটি মজার কথা না বলে পারলাম না আর তা হলো, সমগ্র *কোরান*-এ 'খান্নাস' শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহার করা হয়েছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অথচ মাত্র একবার কেন বলা হলো জানি না। অনুরূপভাবে আরও দুইটি শব্দ, যাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, উহাও সমগ্র *কোরান*-এ মাত্র একবার ব্যবহার করা হয়েছে। একটি 'কাওসার', অপরটি হলো 'আহাদ'। 'আমার', 'আমি' হতে যখন সাধক খান্নাসটিকে বাহির করে দেয়, তথা মুসলমান বানায়, তথা সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলে, তখনই সাধক দেখতে পায়

যে একমাত্র প্রশংসাটি তো আল্লাহ্‌র জন্যই। আকাশসমূহ এবং জমিন, তথা সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য, তাঁরই গুণগান গাইছে তথা তাঁরই অনুগত, তাঁরই মুখাপেক্ষী, তাঁরই আয়ত্তাধীন এবং তৌহিদে বাস করছে। এখানে আরেকটু বলে নেওয়া ভালো যে, আকাশসমূহ বলতে মনোজগতকেও বুঝানো হয়েছে এবং 'আরদ্' বলতে পৃথিবী, জমিন মাটি ও দেহটিকেও বুঝানো হয়েছে। আরবি ভাষাটি, দুঃখ নিয়ে বলছি যে, একটি অত্যন্ত গরিব ভাষা। একই ওহি যাকে বাংলায় প্রত্যাদেশ বলা হয়, উহা যেমন নবি-রসুলের কাছে 'ওহি' হয়, তেমনি হজরত মুসা ও হজরত ইসা (আ.)-র মায়েদের কাছেও ওহি হয় এবং সুরা নহলের ৬৮ নম্বর আয়াতে আমরা দেখতে পাই, মৌমাছির কাছেও নাজেল হয়। শব্দটির বানান, জের-জবর একই, কিন্তু প্রকারভেদে তিন রকম হচ্ছে। মৌমাছির কাছে ওহি নাজেল হয় বলে কখনই মৌমাছির পরে 'আলাইহিস সালাতুস সালাম' ব্যবহারের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ মৌমাছি কেবল নফ্‌স তথা জীবাত্মার অধিকারী, কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মার প্রশ্নটিই ওঠে না। রুহ তথা পরমাত্মাটি সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে একমাত্র জিন এবং মানুষকে দেওয়া হয়েছে। তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তথা আশরাফুল মাখলুকাত। এই আয়াত দু'টোতে আর একটি কথা বলা হয়েছে আর সেই কথাটি হলো একমাত্র প্রশংসা। একমাত্র প্রশংসা বলতে কী বুঝায়? অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব এবং অবস্থান থাকলে প্রশংসার দাবি করতে পারে। একটি অণুর পরিমাণ ধুলিকণাও যদি আল্লাহ হতে আলাদা থাকতো তা হলে বিজ্ঞানীরা ওই ধুলিকণাটির প্রশংসা *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*-র চেয়েও বড় করে লিখতে পারতো। যেহেতু আল্লাহ্‌র সেফাত তথা গুণাবলি ছাড়া সৃষ্টিজগতে আর কিছুই নাই সেই হেতু প্রশংসাটিও হয়ে যায় একমাত্র তথা 'আল'। কেউ থাকলে তো প্রশংসাটি করা যায় এবং সেই প্রশংসাটি যত ক্ষুদ্রই হোক, কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ছাড়া সৃষ্টিজগতে আর কেহই নাই।

সুতরাং একমাত্র প্রশংসাটি তো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, একমাত্র প্রশংসাটি তো আল্লাহু জাল্লা শানাহুর। তাই সাধক মনে-প্রাণে দেখতে পান যে একমাত্র প্রশংসাটি আল্লাহ্‌রই, কারণ সাধক ধ্যানসাধনা, মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে, তথা দায়েমি সালাতের মাধ্যমে তথা অবিরাম সংযোগের মাধ্যমে, তথা নিত্য যোগাযোগের মাধ্যমে খান্নাসকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন। ইহাকেই বলা হয় হাকিকি প্রশংসা। এই হাকিকি প্রশংসাটি আল্লাহ্‌র সাধক ছাড়া অন্যের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যাহা সম্ভব উহা মেজাজি প্রশংসা। উহা খান্নাসকে সঙ্গে নিয়ে মৌখিক প্রশংসা।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৩

কোরান-এর ৩০ নম্বর সুরা আর রুমের ৩১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : পবিত্র মনে-প্রাণে এবং তাক্‌ওয়ার সহিত কায়েম কর সালাত এবং শেরেককারীদের দলভুক্ত হইও না। (*মুনীবীনা ইলাইহি ওয়াত্তাকূহু ওয়া আকীমুস্ সালাতা ওয়ালা তাকূনূ মিনাল মুশরিকীন*)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতটিতে পবিত্র মনে-প্রাণে তথা বিশুদ্ধ চিত্তে এবং তাক্ওয়ার সহিত সালাত কায়েম করার কথাটি বলা হয়েছে। পবিত্র চিত্তটি তথা পবিত্র নফ্সটি তখনই পবিত্র হয় যখন নফ্সের সাথে মিশে থাকা খান্নাসটি আর থাকে না। অনেকটা দুধে মাখন মিশে থাকার মতো খান্নাসের অবস্থান। দুধ দেখলে যে রকম দুধের সঙ্গে মাখন আছে বোঝা যায় না, সেই রকমভাবে আপন নফ্সের সঙ্গে খান্নাসের অবস্থানটিও বোঝা যায় না। দুধের উপর চরখার প্রচন্ড টানাটানিতে মাখন যখন ভেসে ওঠে তখন অবাক হয়ে যাই। বুঝতে পারি, দুধের ভিতরে মাখনটি যে লুকিয়ে ছিলো উহা চরখার অবিরাম টানাটানির পরই ভেসে উঠে তথা মাখনটি যে দুধেরই সঙ্গে মিশেছিল উহা ধরা পড়ে যায়। আল্লাহ্‌র সাধকেরা যখন দায়েমি সালাতের মাধ্যমে তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে খান্নাসটিকে বাহির করে ফেলে দুধের ভেতর হতে মাখন বাহির করার মতো, তখনই সাধকের চিত্তটি হয় বিশুদ্ধ, পুতঃপবিত্র। এই দায়েমি সালাতে মশগুল থাকাটাকেই বলা হয় তাক্ওয়া তথা তদ্গত হয়ে থাকা। খান্নাস যতদিন নফ্সের সঙ্গে অবস্থান করে ততদিন বিশুদ্ধ চিত্তটি অর্জন করা যায় না। তাই আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের তথা শেরেককারীদের দলে অবস্থান করো না। ***আমি এবং খান্নাস দুজনে থাকলেই হয় শেরেক। সুতরাং খান্নাসকে সঙ্গে রেখে দায়েমি সালাত তথা হাকিকি সালাতটি কায়েম করা যায় না।*** দুইয়ের অবস্থানকেই বলা হয় শেরেক। তৌহিদে দুই থাকে না এবং দুই থাকার বিধান নাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নবম শক্তিতে মূল ঔষধের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। তা হলে ২০০ শক্তিতে মূল ঔষধের আশা করাটা বৃথা এবং ১০,০০০ শক্তিতে আরও বৃথা। ভালো করে লক্ষ করে দেখুন, মূল ঔষধের যেখানে নবম শক্তিতে অস্তিত্বই থাকে না সেইখানে ১০,০০০ শক্তিতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। মূল ঔষধটি ১০,০০০ শক্তিতে নাই সত্য, কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিটি অবস্থান করছে। ঔষধের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শক্তির ভয়ঙ্করতা আছে। কী সূক্ষ্ম চিন্তার বিষয়। জ্ঞানীদের জন্য এই উপমাটি কাজে লাগতে পারে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর সেটা হলো, যখন দুধ হতে মাখন সম্পূর্ণরূপে ভেসে ওঠে তখন দুধ আর দুধ থাকে না, দুধ হয়ে যায় ঘোল তথা মাঠা। ঘোল দেখতে কিন্তু হুবহু দুধের মতো। চোখ বিশ্বাস করতে চায় না যে এটা ঘোল, কিন্তু পান করার সময় বোঝা যায় যে এটা দুধ নয়, আমি ঘোল পান করছি। ঠিক সে রকমভাবে দায়েমি সালাতের মাধ্যমে, আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে, খান্নাসটি যখন বাহির হয়ে যায় তখন সাধকের দেহ-মনটি দেখতে সাধারণ মানুষের মতোই, কিন্তু মোটেও সাধারণ নয়। 'আনা বাশারুম মিসলেকুম' তথা 'আমি তোমাদেরই মতো বাশার', অথচ সাধারণ বাশার মোটেই নয়।

পাঠক বাবারা এবং মায়েরা একটু লক্ষ করুন, তৌহিদের বাণী কিন্তু একটিই, কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের শৈলী অনেক। সঙ্গীত যে রকম মাত্র সাতটি পাকে বাঁধা থাকে, তথা সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা-র মধ্যে সব সঙ্গীত সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই সৃষ্টির শৈলী বহু রকম, কিন্তু সব সঙ্গীতই ওই একই সাতপাকে বাঁধা। সুতরাং *কোরান*-এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলো যদি একই রকম হয় তো অধম লিখকের

করার কিছু নাই। একই সঙ্গীতে যেমন বহু রাগ-রাগিনীর ঢং ও শৈলীর ঝঙ্কার দেখতে পাই, যেমন রাগে ভৈরবী, রাগে বেহাগ, রাগে ইমন, রাগে কাফি, রাগে মালকোষ, রাগে বাহার, রাগে কেদারা, রাগে ঠুমরি, রাগে ঝিনঝুটি, রাগে হংসধ্বনী, রাগে কিরবানী, রাগে মধুবসন্তী, রাগে কানাড়া, রাগে দরবারী, রাগে বাগেশ্রী, রাগে শাহানা, রাগে ভীম, রাগে মেঘমল্লার, রাগে সুরদাসী, রাগে মিয়া কি মল্লার, রাগে জয়ন্তী, রাগে হিন্দোল, রাগে দীপক, রাগে হিন্দোল বাহার, রাগে খাম্বাজ বাহার, রাগে পরজ, রাগে পাহাড়ী, রাগে খট্, রাগে রসিয়া, রাগে মালিগৌড়া, রাগে সাজগিরি, রাগে বরাটি, রাগে জৈৎসী, রাগে রেবা, রাগে ত্রিবেণী, রাগে কৌমারিকা, রাগে মালসী, রাগে বল্লারী, রাগে চন্দ্রমধু, রাগে সাবেরী, রাগে মালবগৌড়, রাগে মায়ূরী, রাগে সুখাবতী, রাগে শঙ্করাভরণ, রাগে নারায়ণী ইত্যাদি অনেক অনেক রাগ-রাগিনী ওই একই সাত পাকে বাঁধা মাত্র, অথচ মনে হয় কত গান, কত কথা, কত সুর, কত মূর্ছনা– আসলে সবই তো ওই সাত পাকেই বাঁধা। জ্ঞানীদের জন্য এই উপমাটি কাজে লাগতে পারে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৪

কোরান-এর ৩১ নম্বর সুরা লুকমানের ১–৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আলিফ লাম মীম। ওইগুলি কেতাবুল হাকিমের আয়াত। মুহসিনিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। যাহারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে তাহারাই তাহাদের রবের উপর হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারাই সফলকাম। (*আলিফ লাম মীম। তিলকা আয়াতুল কিতাবিল হাকীম। হুদাঁও ওয়া রাহমাতাল্লিল মুহসিনীন। আল্লাযিনা ইউকীমুনাস্ সালাতা ওয়া ইউতুনায্ যাকাতা ওয়াহুম বিল্ আখিরাতি হুম ইউকিনূন। উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফ্লিহূন*)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা লিখতে গেলে প্রায় একই রকম বক্তব্যটি দিতে হয়। কিন্তু এখানে এই 'আলিফ লাম মিম' তিনটি শব্দকে আয়াত বলা হয়েছে। *কোরান* শব্দটি ব্যবহার না করে কেতাবের আয়াত বলা হয়েছে, আবার কেতাবের সঙ্গে 'হাকিম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'হাকিম' অর্থই হলো বিজ্ঞানময় রহস্যপূর্ণ। আবার বলা হয়েছে : 'যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য এই আলিফ লাম মিম আয়াতটি হেদায়েত ও রহমত বহন করে।' অথচ এই কথাগুলো না বুঝতে পেরে সাংকেতিক চিহ্নের ঝুড়িতে রেখে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে ইহার অর্থ আল্লাহই জানেন। অর্থাৎ জানবার আগ্রহটি এবং গবেষণা করার বাসনাটির উপর দেয়াল তুলে দেয়। নিজেরা না বুঝতে পারুক, কিন্তু সবার জন্য পাইকারিভাবে দেয়ালটি দাঁড় করানো মোটেই সমীচীন মনে করি না। নিশ্চয়ই অধম লিখকের এই 'আলিফ লাম মিম' আয়াতটির বিজ্ঞানময় অর্থটি জানা আছে, কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া ঠিক মনে করলাম না। কারণ ইহা মাথার অর্জিত জ্ঞান দিয়ে বুঝবার উপায় থাকে না। যারা সিনার এলেম কিছুটা হলেও হাসিল করতে পেরেছে তারাই এর মর্মার্থ কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন। তাই এই জ্ঞানকে কেতাবের জ্ঞান বলা হয়েছে এবং সেই কেতাবটির শেষে হাকিম শব্দটি ব্যবহার করা

হয়েছে তথা বিজ্ঞানময় রহস্যপূর্ণ কেতাব বলা হয়েছে। রহস্যের কেতাব রহস্য দিয়েই জানতে হয় : মাথার এলেম দিয়ে জানা যায় না। *কোরান*-এর সবচাইতে বড় আকারের যে বিশাল তফসিরটি ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি করে গেছেন তিনি মুরিদ হবার জন্য হজরত নজমুদ্দিন কোবরার কাছে গিয়েছিলেন। হজরত নজমুদ্দিন কোবরা ইমাম রাজিকে মুরিদ করেন নাই, বরং একটি কথাই বলেছিলেন যে, 'তুমি কলম দিয়ে ঘষে ঘষে কাগজের উপর অনেক কথা লিখেছ, আর আমি নফ্‌সের উপর জিকির-আজকারের রেয়াজত করে কল্‌বি জ্ঞান হাসিল করেছি। তোমার জ্ঞান মাথার জ্ঞান, আর আমার জ্ঞান সিনার জ্ঞান। তাই তোমাকে মুরিদ করতে পারলাম না। তবে রহমতের নজর হতে বঞ্চিত হবে না। বাবা রাজি, মনে রেখো, সিনার এলেম হাসিল করতে হলে কালি-কলম ও কাগজের দরকার হয় না।'

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৫

কোরান-এর ৩১ নম্বর সুরা লুকমানের ১৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : হে আমার পুত্র, সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই ওইসব সাহসিকতার কাজ। (*ইয়া বুনাইয়া আকিমিস্ সালাতা ওয়ামুর বিল মারুফি ওয়ান্ হা সালাতা ওয়ামুর বিল মারুফি ওয়ান্ হা আনিল্ মুনকারি ওয়াস্‌বির আলা মাআসাবাক; ইন্‌না জালিকা মিন আজমিল উমুর।*)

ব্যাখ্যা

এখানে হজরত লোকমান তাঁর ছেলেকে সালাত কায়েমের উপদেশ দিচ্ছেন। সালাত অর্থ হলো আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগটিকে চিরস্থায়ী করা। এই মহান যোগাযোগটি তথা সালাতটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন আর খান্নাসরূপী শয়তানের কোনো কার্যকারিতা থাকে না এবং তখনই মানুষ মহৎ হয়ে যায়, পবিত্র হয়ে যায়। নিজে মহৎ না হয়ে অপরকে মহৎ হবার উপদেশ দেওয়া মোটেই মানায় না এবং ইহা তৌহিদের শিক্ষা নয়। সালাত কায়েম হয়ে গেলে মানুষ যে সব রকম পাপ কাজ এবং ফায়েসা থেকে মুক্ত হয়ে যায় সেটাও *কোরান*-এ অন্যত্র বলা হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে যার সালাত কায়েম হয়ে গেছে তিনি মন্দ কাজ এবং সব রকম ফায়েসা হতে মুক্ত হয়ে গেছেন এবং যিনি মুক্ত হয়ে গেছেন তিনিই মহৎ। তাই হজরত লোকমান ছেলেকে বলছেন যে, ভালো কাজ করার আদেশ দিয়ো। এই আদেশটি কাদেরকে দিতে বলেছেন? হয়তো আপনজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং আম-জনতাকে। এবং একইভাবে আদেশ দিচ্ছেন মন্দ কাজগুলো করতে বারণ করতে। এখানেও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, ভালো কাজগুলো বলতে কী বুঝায়? এবং ভালো কাজগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা দরকার। আবার মন্দ কাজগুলো বলতে কী বুঝায়? মন্দ কাজগুলোরও একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা থাকা প্রয়োজন। কারণ একটি কাজ কারও কাছে ভালো এবং কারও কাছে মন্দ। সমাজ জীবনে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। নতুবা এই ভালো-মন্দের তর্কযুদ্ধে ফেরকাবাজি হতে পারে। বিষয়গুলো দেখতে মনে হয় খুবই সোজা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বড়ই জটিল,

কারণ সমাজ জীবনে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই রকম দৃশ্যগুলো আমাদের অহরহ দেখতে হয়। কথায় কথায় বলতে হচ্ছে যে, আহলে সুন্নাতুল জামাতের অনুসারীরা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), ফারুকে আজম ওমর ফারুক (রা.) এবং জুন্নুন্নারাইন হজরত ওসমান গনি (রা.)-কে উচ্চ স্তরের সাহাবা বলে মেনে নেয়, অথচ শিয়া ফেরকার মুসলমানেরা এই তিন মহান সাহাবার বিরুদ্ধে অনেক রকম কুৎসা রটনা করেন এবং এই কুৎসা রটনায় শিয়া ফেরকার মুসলমানেরা সুন্নিদের হাদিস হতে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। বাগে ফেদাক, সাকিফার তর্কবিতর্ক, দোয়াত কলমের হাদিস ইত্যাদি ধারালো যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তুলে ধরেন যা অনেকেরই অনুভূতিতে আঘাত করে। এখন প্রশ্নটি হচ্ছে, কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ? আবার ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা মহানবির নামে মিলাদ পড়া, মহানবির নামে দাঁড়িয়ে কেয়াম করা এবং পাঁচজন বড় বড় ওলি যথা : গাউসুল আজম বড় পীর সাহেব, স্পেনের মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, মিশরের আহমেদ রেফায়ি, ইরান বা তুরস্কের মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি এবং হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালিকে তথা এই বিশ্ববিখ্যাত আল্লাহ্‌র পাঁচ ওলিকে কাফের (?) বলে ওহাবিদের গুরুঠাকুর আবদুল ওহাব নজদি ঘোষণা করেছে। এবং শুধু ঘোষণাই করে নি, বরং বলেছে, যারা এদের কথা মতো চলবে বা চলে তাদেরকে কতল করা (খুন করা) ওয়াজিব। এখন পাঠকদেরকেই প্রশ্ন করি যে ওহাবিদের গুরুঠাকুর আবদুল ওহাব নজদির কথাগুলোকে ভালো বলবো, না মন্দ বলবো? সুতরাং মানব জীবনের চলার প্রতিটি ধাপে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ এটা নির্ধারণ করাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এখানে সুফিবাদের চরম পর্যায়ের কথাগুলো বলছি না। এখানে সুফিবাদের দর্শনের ব্যাখ্যাও লিখছি না, বরং একদম সাদামাটা ভাষায় সমাজ জীবনের পথে চলতে গিয়ে প্রশ্নগুলো এসে দাঁড়ায়। এখানে আমরা ইমামুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামির সুফিদর্শনের অতি উচ্চ স্তরের কথাগুলো, যেমন বায়েজিদ বলেছেন, '*মান আরাফাল্লাহা, কাল্‌লা লেসানাহু।*' 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করেন তথা মারেফতের সাগরে অবগাহন করেন, অবশ্যই সেই ব্যক্তিটি নির্বাক হয়ে যান তথা হতভম্ব হয়ে পড়েন।' বুকে হাত রেখে বলুন তো, ওহাবি ফেরকা, শিয়া ফেরকা, বাটালভি ফেরকা, চক্রালভি ফেরকার অনুসারীরা কি ইমামুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামিকে আল্লাহ্‌র ওলি বলে মেনে নেবে? যাকে আপনি-আমি সারাটি জীবন আল্লাহ্‌র একজন মহান ওলি বলে পরম শ্রদ্ধাভরে মেনে চলছি তাকেই এতগুলো ফেরকার অনুসারীরা মানা তো দূরে থাক, বরং হি হি করে হাসবে। সুতরাং ভালো এবং মন্দের পার্থক্যটি করাও সমাজ জীবনে ভয়ঙ্কর জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এই ছোট ছোট আপেক্ষিক দর্শনের গুঁতাগুঁতি, মারামারি, বক্সিং এবং মল্লযুদ্ধের ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজ জীবনের মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ে। কে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আপন নফ্‌স হতে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন, আর কে পারেন নি এটা চোখে দেখা যায় না, অন্তর দিয়েও বোঝা যায় না, এমনকি গবেষণা করেও এর আগামাথা পাওয়া যায় না। তা হলে? তা হলে বলতে হয় যে আল্লাহ যে বলেছেন, 'আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দুনিয়াতে পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছি'– এই কথাটিরও চির অবসান হয়ে যায়। যদি ধরাই যেত যে কে আল্লাহ্‌র ওলি আর

কে আল্লাহ্‌র ওলি নয়, তা হলে সব বিষয়ের কিস্‌সা খতম। সুতরাং কাকেই বা দোষ দিতে যাব? শুধু বলতে পারি, অদৃশ্য সুতায় বাঁধা তকদিরটি নিয়ে, প্রত্যেকে তকদিরের কর্মফল নিয়ে এই মর্ত্যমঞ্চে নেচে চলছে। তা হলে কাকে দোষ দেব? হজরত লোকমান জানতেন যে তাঁর ছেলে যখন ভালো কাজের আদেশ দেবেন এবং মন্দ কাজ করা হতে নিষেধ করবেন তখনই অনেক রকম বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। তাই বিপদে ধৈর্যধারণ করার উপদেশটি প্রেসক্রিপশনরূপে পুত্রের হাতে তুলে দিয়েছেন।

হজরত লোকমানের পরের (আয়াতে) উপদেশটি হলো : অহঙ্কার-বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। আসলে শব্দটির হুবহু অর্থটি হলো, 'তিনি তাঁর মুখ ফিরাইয়া লইলেন।' যদিও অধম লিখক হুবহু শব্দটি ব্যবহার করি, কিন্তু এইখানে ইচ্ছা করেই তা করলাম না। কেননা আরবি ভাষায় এই শব্দটিকে বাগধারারূপে তথা ইডিয়মরূপে ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষাতেও এই রকম বাগধারা আছে। যেমন, যিনি সব সময় হালে থাকেন সেই হালের মানুষটির সামনে যদি ব্যান্ডপার্টির বাজনা বাজানো হয় তো হালে বিভোর হয়ে বৈতালিক নৃত্যে মত্ত হয়ে যাবে। এটাকেই বাংলা ভাষার বাগধারায় বলা হয়ে থাকে : এমনিতেই নাচুনি বুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি। ইংরেজি ভাষাতেও আমরা এ রকম বাগধারা দেখতে পাই। যেমন অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে-কে ইংরেজিতে বলা হয় : রেইন ফলস্ ক্যাট্‌স অ্যান্ড ডগ্‌স। আসলে হজরত লোকমানের ছেলের কোনো অহঙ্কারই থাকতে পারে না, কারণ সালাত কায়েম হয়ে গেলে আর কোনো অহঙ্কারই থাকে না। তখন আল্লাহকে নিয়ে অহঙ্কার করা যায়, কিন্তু নিজে নিজে অহঙ্কার করা যায় না। ধরে নিলাম আল্লাহকে নিয়েই অহঙ্কার করছেন, তা হলে মানুষকে অবজ্ঞা আর অবহেলা করার প্রশ্নটিও আপেক্ষিক। সেই সঙ্গে উদ্ধতভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করার কথাটিও আপেক্ষিক। কিন্তু আল্লাহ যে কোনো উদ্ধত অহঙ্কারীকে মোটেই পছন্দ করেন না সেই কথাটি হজরত লোকমানের ছেলের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্য কথাটি বলা হয়েছে। 'আপনার আগের গুনাহসমূহ এবং পেছনের গুনাহসমূহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন'– কথাটি মহানবির সাহাবাদের বেলায় প্রযোজ্য, কিন্তু মহানবির জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়। কারণ *কোরান*-এর সুরা নজমে আল্লাহ বলেছেন যে, 'মহানবি জীবনে একটি কথাও নিজ হতে বলেন নি, বরং আমি আল্লাহ যা বলতে বলেছি তাই বলেছেন।' সুতরাং মহানবির জন্য গুনাহ করার প্রশ্নই ওঠে না।

খিজিরের মতো আবদুহু যখন হজরত মুসা (আ.)-র সামনে নতুন নৌকাটির ছোট্ট একটি অংশ খুলে ফেলে পানিতে ডুবিয়ে দিলেন তখন হজরত মুসা (আ.)-র কাছে আবদুহু খিজিরের এই কর্মকান্ডটি মোটেই পছন্দ হয় নি। কিন্তু হজরত মুসা (আ.) জানতেন যে দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে পাওয়া আল্লাহ্‌র আবদুহুকে কিছুই বলা যাবে না। আবদুহু খিজিরের পর পর তিনটি কর্ম হজরত মুসা (আ.)-এর কাছে অসহ্য, অশোভনীয় বলে প্রতীয়মান হলেও কোনো প্রকার মন্দ মন্তব্য করেন নি, কারণ হজরত মুসা (আ.) জানতেন যে তিনি আবদুহু খিজির, এবং চরম ঊর্ধ্বের মারেফতি জ্ঞান অর্জন করার জন্য আগেই

তাঁকে গুরুরূপে মেনে নিয়েছেন এবং এ-ও বলেছেন যে, 'আপনি (খিজির) আমাকে ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই পাবেন।' বাহিরের দৃষ্টিতে আত্মবিরোধ, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে মহৎ কাজ। সুতরাং ভালো-মন্দের আপেক্ষিকতার ঘূর্ণায়মান মঞ্চে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে নিজের কাছেই ফেরত আসে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৬

কোরান-এর ৩৩ নম্বর সুরা আহজাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো এবং জাহেলি যুগের মতো চাকচিক্য প্রদর্শন করিও না, সালাত কায়েম করো, জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অনুসরণ করিবে। (*ওয়া কার্‌না ফী বুইউঁতিকুন্না ওয়ালা তাবার্‌রাজনা তাবার্‌রুজাল জাহিলিয়াতিল উলা ওয়া আকিম্‌নাস্ সালাতা ওয়া আতিনায্ যাকাতা ওয়া আতিনাল্লাহা ওয়া রাসুলাহু*)।

ব্যাখ্যা

এই অত্যাধুনিক যুগে এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাই। তবে যদিও এই আয়াতের আদেশগুলো মহানবির স্ত্রীদেরকে তথা সমগ্র মুসলিম জাহানের মায়েদের দেওয়া হয়েছে, তবু উপদেশটি মুসলিম নারীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে মহানবির স্ত্রী তথা মুসলমানদের মাতাদেরকে লক্ষ করে যে আদেশটি দেওয়া হয়েছে উহা যেন মুসলিম নারীরাও অনুসরণ করতে পারে। উচ্চ এবং সর্বোচ্চ আদালতের বিচার তথা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের চলাফেরার উপর বিশেষ কতগুলো নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। মহানবির স্ত্রীদের তথা মুসলমানদের মাতাদের যে উপদেশগুলো দেওয়া হয়েছে উহা অনেকটা উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের চলাফেরার উপর বিধি-নিষেধ দেওয়ার মতো বলা যায় কি না বিজ্ঞ আলেম-উলামাদের উপরেই এই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম। কারণ হিশাবে এই বলতে চাই যে, এই অত্যাধুনিক যুগে ঘরের ভেতর অবস্থান করতে গেলে জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নে বাহিরে আসতেই হবে। চাকুরির প্রশ্নে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রশ্নে, আইনজ্ঞদের প্রশ্নে এবং ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্নে নারীদেরকে ঘর হতে বাহির হতেই হবে। সুতরাং আমার মনে হয় (আমার ভুলও হতে পারে) এই রকম কড়াকড়ি ব্যবস্থাপত্রটি মহানবির স্ত্রীদের বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য। তবে মুসলিম নারীরা যেন বেহায়াপনার পোশাক-আশাক না পরে শালীনতার পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে বাহির হয়। এমন এক অত্যাধুনিক যুগে নাটক-সিনেমায়, নারীদের অবস্থানটি কী হবে তা আমার পক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হলো না। তবে এক কথায় যুগের চাহিদা অনুযায়ী নারীদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে শুধু একটি কথাই বলতে চাই আর সেই কথাটি হলো, বেহায়াপনা করাটি মোটেই ঠিক নয়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৭

কোরান-এর ৩৪ নম্বর সুরা সাবার ৪৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরকে শুধু একটি উপদেশই দিতেছি আর তাহা হইতেছে এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াও (সালাতে) প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় (দুইজন করিয়া) এবং তাহার পর একা একা। তোমরা ফারাক করিয়া দেখ তোমাদের সাহেব জিনগ্রস্তদের মধ্যে নহেন। নিশ্চয়ই তিনি তো সতর্ককারী তোমাদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে। (*কুল ইন্‌নামা আইজুকুম বিওয়াহিদাতিন আন্ তাকমু লিল্‌লাহি মাস্‌না ওয়া ফুরাদা সুম্মা তাতাফাক্‌কারু মা বিসাহিবিকুম মিন্ জিন্নাতিন; ইন্‌হুয়া ইল্‌লা নাযীরুল্লাকুম বাইনা ইয়াদাই আজা বিন শাদীদি*)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাঁর রহস্যলোকের গোপন বিষয়গুলো কী করে জানতে পারবে এবং কী ব্যবস্থা করা দরকার সেই বিষয়টি, প্রচ্ছন্নভাবে বলে দিয়েছেন। আয়াতের প্রথমেই লক্ষ করে দেখুন, কী অপূর্ব ভাষার শৈলীতে আল্লাহ বলছেন, 'আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরকে শুধু একটি উপদেশই দিতেছি।' এই রকম ভাষার শৈলীতে আহ্বান জানানোটি কমই পাওয়া যায়। আল্লাহ বলছেন : তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াও (সালাতে) প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় (দুইজন করিয়া) অর্থাৎ দুইজনে দাঁড়াও, কিন্তু তিনজন অথবা চারজন অথবা আরও অনেকে দাঁড়াও এই কথাটি বলা হয় নি। কেন সালাতের জন্য তথা আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়াতে বলা হলো? আরও তো অনেক সংখ্যা ছিলো। সেই সংখ্যাগুলোর উল্লেখ না করে কেবল জোড়ায় জোড়ায় সালাতে দাঁড়াবার কথাটি বলবার মধ্যে একটি সাঙ্ঘাতিক গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে, যা সবার পক্ষে ধরার তো প্রশ্নই আসে না, বরং অনেক ইসলাম গবেষকও এই বিষয়টি ঠাহর করতে পারেন না। সালাতের হাকিকি বিষয়টি জানেন সেই রকম একজনকে শিক্ষকরূপে, গুরুরূপে, মুরশিদরূপে, পীররূপে গ্রহণ করে নেবার উপদেশটি প্রচ্ছন্নভাবে দেওয়া হয়েছে।

এই আয়াতটির গোপন রহস্যগুলো যিনি সবচাইতে ভালো করে বুঝতে পেরেছেন তিনিই এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে বিশাল একটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সেই বিশাল গ্রন্থটির মর্যাদা এতই ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে যে সেই গ্রন্থটিকে মানুষের রচিত ফারসি ভাষার *কোরান* বলা হয়। সেই বিশাল গ্রন্থটির নাম *পবিত্র মসনভি* তথা *মসনভি শরিফ।* যিনি লিখেছেন তিনি আহলে সুন্নাতুন জামাতের অনুসারীদের কাছে প্রাণপ্রিয় পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির শিক্ষক তথা গুরু তথা মুরশিদ তথা পীরের নামটি হলো বিশ্ববিখ্যাত ওলিয়ে কামেল বাবা শামসে তাব্রিজ। এই শামসে তাব্রিজকে নিয়ে কেমন করে হাকিকি সালাতটি কায়েম করা যায় সেই শিক্ষাটি হাসিল করতে গিয়ে বছরের পর বছর বিরাট ধৈর্য ও কঠোর রেয়াজতে মশগুল ছিলেন। তাই তিনি এই কথাটিও তাঁর *মসনভি শরিফ*–এ লিখে গেছেন যে, ***মাওলানা রুম নিজে নিজে কামেল হতে পারেন নি, যে পর্যন্ত না বাবা শামসে তাব্রিজের গোলামি গ্রহণ করেছেন।***

ওহাবি ফেরকার অনুসারীদের মাথার মগজে এই কথাগুলোর রহস্যটি আঘাত করতে পারে না, বরং ওহাবিরা শামসে তাব্রিজের গোলামি গ্রহণ করাটিকে সরাসরি শেরেক বলে ফেলে। স্থূল বিষয়গুলো তথা একদম সাদামাটা বিষয়গুলো ওহাবিরা গ্রহণ করে থাকে, তাই তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলো শিশুসুলভ আচরণে ও কথায় ভরপুর।

সালাতে দাঁড়াও জোড়ায় জোড়ায়, তারপর একা একা। বাক্যটি যেন কেমন! তার উপর তার উপর 'উপদেশ দিচ্ছি' বলা হয়েছে এবং তার উপর আবার বলা হয়েছে : একটি মাত্র উপদেশ দিচ্ছি। এখানে আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াতে বলা হয়েছে, কিন্তু 'সালাত' কথাটি নাই; সালাত কথাটি আমরা ব্রাকেট লাগিয়ে বাক্যটির ভাবকে পরিষ্কার করার অভিপ্রায়ে দিয়ে থাকি।

বার বার বলেছি যে, সালাতের হুবহু বাংলা অনুবাদটি হলো যোগাযোগ তথা সংযোগ। এই যোগাযোগটি কি দুনিয়ার সঙ্গে না আল্লাহ্‌র সঙ্গে? দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগে যারা মহাব্যস্ত থাকেন তাদেরকে 'মরদুদ' বলা হয়েছে। সুতরাং 'আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াও' কথাটির সঙ্গে যোগাযোগ শব্দটিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু *কোরান*-এর হুবহু অনুবাদে আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াতে বলা হয়েছে এবং সালাত শব্দটি উল্লেখ করা হয় নি। *কোরান*-এ উল্লেখ না করলেও অন্তত এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে যোগাযোগের জন্য তথা সালাতের জন্য দাঁড়াতে বলা হয়েছে।

লক্ষ করার বিষয়টি হলো, এখানে নফ্‌সটিকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে তথা জীবাত্মাটিকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে এবং এই দাঁড়ানোটা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্‌র আদেশটির নাম রুহ। আল্লাহ্‌র আদেশ কখনও আল্লাহ হতে আলাদা নয়। আমরা বাংলা ভাষায় রুহের প্রতিশব্দটি ব্যবহার করেছি পরমাত্মা। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের শাহারগের তথা জীবন-রগের নিকটেই আছেন। সুতরাং নফ্‌সের তথা জীবাত্মার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য বলা হয় নাই, বলা হয়েছে নিরেট আল্লাহ্‌র জন্য। তাই 'একটিমাত্র উপদেশ দিচ্ছি' কথাটি বলা হয়েছে।

মানুষের নিজের মধ্যে যখন নফ্‌সটি মোৎমায়েন্না হয়ে যায় তথা পবিত্র হয়ে যায়, তখনই আল্লাহ্‌র রুহরূপটি বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ে নিজের মধ্যে। অন্য মানুষদের থেকে আল্লাহ্‌র এই জাগ্রত ও প্রকাশিত ও বিকশিত রূপটিকে ধরে ফেলার বিধানটি আল্লাহ নিজেই রাখেন নি। যদি সবাই এই রূপটি ধরতেই পারতো বা বুঝতেই পারতো তবে জগতে একজনও কাফের বা মুনাফেক থাকতো না। এবং 'আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি' কথাটির সার্থকতা থাকতো না। যদি এই আয়াতটির কেহ ভুল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকে তা হলে তাকেও আমরা দোষারোপ করতে চাই না। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিটি হলো মানুষ সব কিছু বুঝে যেতে চায়। বুঝতে না পারলেও গোঁজামিলের গদা ঘুরাতে থাকে। কেন এ রকম হয়? প্রতিটি মানুষের নফ্‌সের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে, তাই পরে বলা হয়েছে যে তোমাদের সাহেব জিনগ্রস্ত নন তথা জিনটিকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন; কারণ খান্নাস মানেই হলো জিন। তাই মহানবির মোহাম্মদ নামটি এখানে উল্লেখ না করে এখানে সাহেব শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যিনি জিনরূপী খান্নাসকে আপন

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

নফ্‌স হতে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন তিনিই সাহেব, তিনিই ওলিয়ে কামেল, তিনিই পীর। এই পীর শব্দটির সার্থকতা অর্জন করতে হলে নির্জনে ১৫টি বছর ধ্যানসাধনা করতে হয়। ইহা নামের পীর নয়, ইহা উপাধির পীর নয়, ইহা বিএ পাশ করা প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি নয়। এই রকম উচ্চ মার্গের অধিকারীদেরকেই পীর বলা হয়। আমরা ঘোল-মার্কা পীরের সঙ্গে থেকে খাঁটি দুধ-মার্কা পীরকে মাপতে গিয়েই যত ভুল করি। আমরা মুফতি-মোল্লা দিয়ে মোহাম্মদকে বিচার করে ভুল করি। আমরা পোপ-পাদ্রী দিয়ে যিশুখ্রিস্টকে বিচার করে ভুল করি। আমরা খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে বিচার করে ভুল করি। আমরা পান্ডা দিয়ে ভগবান কৃষ্ণকে বিচার করে ভুল করি। আমরা রাব্বি দিয়ে মুসা কালিমুল্লাকে বিচার করে ভুল করি। কেন ভুল করি? ভুলটি তখনই করি, যখন আপন নফ্‌সের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানকে রেখে বিচার করি। তাই এখানে সুন্দর করে কী অপূর্ব ভাষায় *কোরান* বলছে : তোমাদের সাহেবের মাঝে জিন নাই, তথা তোমাদের সাহেব জিনগ্রস্ত নহেন। যদি মহানবি মোহাম্মদের নামটি এখানে উল্লেখ করা হতো তা হলে আল্লাহ্‌র এই উপদেশগুলো সীমাবদ্ধতার বলয়ে বাঁধা থাকতো। আল্লাহ্‌র জন্য তথা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য সবাইকে 'আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াও' বলা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে টিচার তথা শিক্ষকটির কথা বলেছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাঁকে। এই শিক্ষককে নিয়েই তথা এই শিক্ষক হতেই কেমন করে ধ্যানসাধনা, মোরাকাবা-মোশাহেদার বিষয়গুলো জেনে নিতে পারবো তারই জন্য জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়াতে বলা হয়েছে। তথা একজন পীর, অপরজন মুরিদ; একজন শিক্ষক, অপরজন ছাত্র। এই ছাত্র তথা এই মুরিদ যখন ধ্যানসাধনার মাধ্যমে জিনগ্রস্ততা হতে তথা খান্নাস হতে মুক্তিলাভ করে তখন আর পীরের প্রয়োজন হয় না, তখন আর শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না; তাই *কোরান* বলছে: তারপর তো একা একা।

এই পীরের এতই প্রয়োজন যে পীরের শিক্ষা ছাড়া একা হওয়া যায় না। আর একা হলে পীরের আর দরকার হয় না। এই পীর বিষয়টি তথা শিক্ষকটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি যিনি দিয়ে গেছেন (আমরা নিজস্ব মতে) ওনার নাম, বিশ্ববিখ্যাত ওলিয়ে কামেল মুজাদ্দেদে আলফেসানি সেরহিন্দ। হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানি সেরহিন্দ তো আপন পীরকে তথা হজরত বাকি বিল্লাহকে প্রথম মাবুদ বলেছেন। লক্ষ করুন, শেষ মাবুদ বলেন নি, কারণ শেষ মাবুদটি আপন নফ্‌সের উপরেই বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তাই হজরত মুজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, *পীরে তাস্‌ত আউয়াল মাবুদ তাস্‌ত* অর্থাৎ 'তোমার পীরই তোমার প্রথম মাবুদ।' (*মাতলাউল উলুম* ৮৬ পৃ)। হজরত হাফিজ সিরাজিও এরকম কথাটিই বলেছেন, তবে ভাষাটি অন্যরূপ। হজরত হাফিজ সিরাজি বলেছেন, আপন পীরের ধ্যানে-নিরিখে-বরজখে, বছরের পর বছর নির্জনে ধ্যানসাধনা করার পর যখন আপন পীরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ফানা হয়ে গেলাম এবং কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না, তখনই দেখতে পেলাম : আমার পীরও আমি, আমার মুরিদও আমি। ফারসি ভাষায় বাক্যটি এই রকম : '*চু খুদরা বিনগারাম*

দিদাম হামু নাস্ত, জামালে খুদ জামালে ইয়ারে দিদাম।' অন্যত্র হজরত হাফিজ সিরাজি, যাঁর নামাজে জানাজা সেই দিনের মোল্লারা পড়ে নি, সেই হাফিজ সিরাজি ফারসি ভাষায় বলছেন, '*নামাজে মোল্লা মেহরাবে মিম্বার, নামাজে আশেকা বারদারে দিদাম।'* অর্থাৎ 'মোল্লার নামাজ মেহরাব থেকে মিম্বারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর প্রেমিকেরা নামাজ পড়েন ঠাট্টা-তামাশার শূলের উপর দাঁড়িয়ে।'

আরও উল্লেখ করা যায় যে, হজরত হাফিজ সিরাজি তাঁর রচিত বৃহৎ *দিওয়ান*-টির প্রথমেই উল্লেখ করেছেন : শুরু করলাম আপন পীর ও মুরশিদের নামে। এত বড় সাহসী পীর-পূজারি খুব কমই হন, খুব কমই সাহস করে এ রকম কথা লিখে গেছেন। তবে বাংলার বুকে মাওলাউল আলা বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তাঁর অমর গ্রন্থ *নুরে হক গঞ্জে নুর*-এ লিখে গেছেন :

না বল খোদার নাম না বল রসুল।
এক চিতে পীর মুখে বোলাও কেবল॥
মোর্শেদ হাসরে গতি খলিফা নবীর।
শত নবি সাথী নহে, কিন্তু নিজ পীর॥

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পীর মাওলানা জাফর শাহ ফকিরের দাদাপীর হলেন বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী। তাই আমরা দেখতে পাই, ওহাবি ফেরকার অনুসারীদের কাছে বাবা জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী পটাশিয়াম সায়ানাইডের মতো ভয়ঙ্কর বিষ। এই 'পীর মুখে বোলাও কেবল' কথাটির ভাষাটি হলো, 'আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াও জোড়ায় জোড়ায়।' এই গুপ্ত রহস্যটি সবার চোখে তো ধরা পড়ার প্রশ্নই ওঠে না, বরং বড় বড় গবেষকদের মাথাও ঘুরে যায়। যেমন আইনস্টাইনের সূত্রগুলো অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মাথাগুলোকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। জ্ঞান অসীম, যদিও বৈজ্ঞানিকেরা প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতির গাড়ি হাঁকিয়েও নিউট্রন নক্ষত্রটির দূরত্বের হিশাবটি ছয় হাজার কোটি আলোকবর্ষ বলে ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন ইহা অসীম। তা হলে অধ্যাত্ম জ্ঞানের রাজ্যটি আরও কত বড়, কত বিরাট অসীম হতে পারে? মাথার কম্পিউটারগুলো ফটফট শব্দ করে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। তাই মানুষ কখনই আল্লাহ হয় না, বরং আল্লাহ্‌র মহা আলোর পবিত্রতায় সম্পূর্ণ ডুবে যায়। যেমন পানিতে চিনি মিশে যায়। মনেই হয় না পানির মধ্যে চিনির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু গবেষণার ল্যাবরেটরিতে কেমিক্যাল টেস্ট করলেই চিনির অস্তিত্বটি ধরা পড়ে যায় তথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

পরিশেষে, এই আয়াতটির শেষ অংশে বলা হয়েছে : তোমাদের অতি নিকটে কঠিন শাস্তিটি যে লুকিয়ে আছে উহা বলে দেবার জন্যই সাহেবকে তথা মহানবিকে সাবধানকারী তথা সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছে মাত্র। এই মাত্র শব্দটি দিয়েও ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা মহানবিকে আল্লাহ্‌র জাত নুরে তৈরি না বলে মাটির তৈরি সাধারণ মানুষ বলে থাকে। মাত্র শব্দটি কী উদ্দেশে বলা হয়েছে, আর ওহাবিরা তার কী ব্যাখ্যা লেখে!

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৮

কোরান-এর ৩৫ নম্বর সুরা ফাতিরের ১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করে না, এবং যদি ভারী বোঝা বহনকারী একজন তাহার ভারের দিকে ডাকে তাহা হইলে কেউ তাহার বোঝা হইতে কিছু বহন করে না, যদিও সে নিকটের অধিকারী (আপনজন, নিকটাত্মীয় হয়)। আপনি কেবল তাহাদেরকেই সাবধান করুন, যাহারা তাহাদের অপ্রকাশ্য রবকে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে এবং যে পবিত্র করে তবে সে তার নফ্সের জন্যই পবিত্র করে, সুতরাং আল্লাহ্র দিকেই ফিরিয়া যাওয়া। (*ওয়ালা তাযিরু ওয়া যিরাতুঁও য়্যিয্রা উখরা ওয়া ইন্ তাদ্উ মুস্কালাতুন ইলা হিম্লিহা লা ইউহ্মাল মিন্হু শাইয়ুও ওয়ালাও কানা যাকুরবা; ইন্নামা তুনযিরুল লাজিলা ইয়াখ্শাওনা রাব্বাহুম বিল্ গাইবি ওয়া আকামুস ছালাতু, ওয়া মান্ তাযাক্কা ফাইন্নামা ইয়াতা যাক্কা লি নাফ্সিহি, ওয়া ইলাল্ লাহিল্ মাসির*)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই যে প্রশ্নটি আসে সেই প্রশ্নটি হলো, এই বোঝা বহন করা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ইহা কীসের বোঝা? ইহা কি পাপের বোঝা? প্রশ্ন আসে, পাপ বলতে কী বুঝায়? কী কী রকম পাপের বোঝা হতে পারে তার তালিকাটি দেওয়া হয় নি। সুতরাং কেউ যদি ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে ধনসম্পদের বোঝা অথবা ধর্মরাশির মোহের বোঝায় ভারাক্রান্ত হওয়াটাকে বোঝায়, তা হলেও বলার কিছু থাকে না। কারণ যে যেভাবে বুঝতে পেরেছে সে সেইভাবেই ব্যাখ্যা লিখে যাবে। এর কমও নয়, এর বেশিও নয়। আপন চৈতন্যের অনুভূতির প্রখরতার গভীরতা যার যত বেশি তার ব্যাখ্যাটিও তত সুন্দর ও সাবলীল হয়। যে-নফ্সটি তথা জীবাত্মাটি একটি মানবদেহে অবস্থান করে, ধাপে ধাপে সে যখন যৌবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখনই নফ্সের ভেতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসটি তার অনেক রঙ-ঢঙের শাখা-প্রশাখাগুলো মেলে ধরে। ইহাকেই প্রলোভন অথবা মোহ বলতে চাই। ধনসম্পদ অর্জন করা মোটেই কোনো খারাপ বিষয় নয়, বরং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহাকে সুন্নতও বলা যায়। কিন্তু যখন এই ধনসম্পদ অর্জনের পেছনে লোভ-মোহটি শত শত জিহ্বা বের করে আপন নফ্সের বিবেকটিকে নাড়া দিতে থাকে তখনই সেই ধনসম্পদ অর্জন বিষয়টি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই লোভের বোঝাটি প্রতিনিয়ত মনটিকে দহন করতে থাকে। ইহাকেই চিত্তদাহ বলা হয়। পাপ-পুণ্যের সংশয়ে প্রতিনিয়ত চিত্তদাহ হতে থাকে। অবৈধ লোভ-মোহ যখন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদি বিষয়গুলোতে অবৈধ কিছু করে ফেলে তখনই আপন নফ্সে পাপ-পুণ্যের সন্দেহ এবং সংশয়, যাকে উচ্চাঙ্গ ভাষায় নিহুবে চিত্তদাহ বলা হয়, উহাই বিবেকের শরীরে আঘাত করতে থাকে। অবশ্য যত আঘাতই করুক না কেন, সমাজ-জীবনে চলার পথে সততার বোরখাটি পরতে বাধ্য হয়। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে যে তার বিবেকের ঘাড়ের উপর একটি পাপের বোঝা সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো

বসে আছে, কিন্তু প্রকাশ করতে নারাজ সে, কারণ, সমাজের বুকে ছোট হয়ে যাবার সমূহ ভয় থাকে। সাধু হতে পারে না, কিন্তু সাধু সাজতে বাধ্য হয়।

অন্য মানুষের এবং পাড়া-পড়শি ও নিকটাত্মীয়দের ধনসম্পদ মেরে দিলে অথবা আমানত খেয়ানত করলে আল্লাহ মাফ করে দেবার বিধানটি রাখেন নি। যাদের হক আত্মসাৎ করা হয়েছে তারা যে পর্যন্ত মাফ না করবে সেই পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করার বিধানটি রাখেন নি। এই একটি মাত্র বিষয়ের জন্য অধিকাংশ মানুষকে যে জাহান্নামে যেতে হবে ইহা সবাই কমবেশি বুঝতে পেরেও বুঝতে পারেন না। অনেকটা যেমন ধূমপানকারী জানে যে ধূমপান শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, কিন্তু জানবার পরেও ধূমপান করে। মাতাল জানে যে মদ একটি ক্ষতিকারক বিষ, তারপরেও জেনেশুনে মদ পান করে। আরেক ধাপ নেমে যদি বলি যে যারা এতিমের হক মেরে দেয় তারা প্রথমেই ইসলাম হতে বাদ তথা খারিজ, আর যে ইসলাম হতে খারিজ সে তো মুসলমানই নয়।

আনুষ্ঠানিক এবাদত-বন্দেগির ফরজ ও সুন্নতগুলো পালন করাটা অনেকটা গাছের গোড়া কেটে মাথায় পানি ঢালার মতো। এ জাতীয় মানুষদের এবাদত-বন্দেগিগুলোকে *কোরান* লোক-দেখানো এবাদত-বন্দেগি বলে বার বার সতর্ক করে দিয়েছে। এই জাতীয় পাপের বোঝাগুলো তাকেই বহন করতে হবে এবং অন্যে বহন করবে না। এমনকি এই বোঝার কিছুটা বহন করার জন্য যদি সে অন্যকে ডাকে অথবা পরম নিকটাত্মীয়দেরকেও ডাকে, তবু এই বোঝার অংশীদারিত্ব নিতে কেউ রাজি হবে না।

আবার এই বোঝার বিষয়টির অন্যরকম ব্যাখ্যাও লেখা যায়। যেমন প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানব তথা পরিপূর্ণ মানব হজরত আদম (আ.) এবং মা হাওয়াকে জান্নাতে আল্লাহ গন্ধম খেতে মানা করেছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন যে, যদি ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করে তো দুনিয়া নামক কারাগারে ফেলে দেওয়া হবে। আদমের অন্তরে খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটি থাকুক অথবা না-ই থাকুক অথবা জান্নাতের বাহিরেই থাকুক, এই শয়তানের কুমন্ত্রণায় অথবা প্ররোচনায় অথবা ইচ্ছা করে, অথবা দুনিয়ায় মানুষের অবস্থান করার অভিপ্রায়টি পূর্ণ করার তরে আল্লাহ্‌র প্রেমে মত্ত হয়ে জেনেশুনে নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ নামক বিষটি পান করলেন।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আদমের ইচ্ছাটি কোরবানি করে দেবার নামই হলো প্রেম তথা ইশ্‌ক। আল্লাহ্‌র প্রেমে, আল্লাহ্‌র ইশ্‌কে হজরত আদম (আ) এতই মাতোয়ারা ছিলেন যে কঠিন শাস্তিগুলো হাসিমুখে মাথা পেতে নিলেন। আইনের যেখানে কবর ভালোবাসার সেখানে শুরু। তাই আমরা ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামির মতো বিরাট আল্লাহ্‌র ওলির মুখে বলতে শুনি, '*মান আরাফাল্লাহা কাল্‌লা লেসানাহু*' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করেন তিনি নির্বাক হয়ে যান।' অবশ্য আমি অকপটে স্বীকার করব এবং মাথা নত করে মেনে নেব যে, এই কথাগুলো সবার পাতে দেওয়া যায় না। যাদের হজম করার শক্তি আছে তারাই নিতে পারবে। যদি কাষ্ঠ প্রকৃতির মন-মানসিকতা নিয়ে আল্লাহকে প্রশ্ন

করি– শয়তানের প্ররোচনায় তথা শয়তানের কুমন্ত্রণায় জান্নাতে আদম এবং হাওয়া যে নিষিদ্ধ বৃক্ষটির আস্বাদ গ্রহণ করেছেন এবং এই আস্বাদ করার অপরাধে দুনিয়া নামক জেলখানায় ফেলে দেওয়া এবং বহুদিন দুজনের বিচ্ছেদের বিরহজ্বালার কান্না এবং অনেক বছর পর উভয়ের মিলন হওয়াটি দুনিয়ার দৃষ্টিতে একটি বেদনাদায়ক কাহিনী, একটি আঘাত করা ইতিহাস– যদি প্রশ্ন করি আদম এবং হাওয়া জান্নাতে মানা-করা কাজটি করার দরুনই দুনিয়া নামক জেলে ফেলে দিয়ে আল্লাহ সূক্ষ্ম বিচারটিই করেছেন তথা আল্লাহ যে 'আদিল' ইহাই প্রমাণ করেছেন। নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদটি দুনিয়াতে নয়, বরং জান্নাতে গ্রহণ করার দরুনই দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। অধম লিখক এবং পৃথিবীতে বাস করা ছয় শত কোটি মানুষের একজনও তো জান্নাতে যায় নি, নিষিদ্ধ বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করা তো বহু দূরের কথা : তা হলে আমরা কেন আদম আর হাওয়ার অমান্য করার বিষয়টি বহন করার জন্য দুনিয়াতে এলাম? ধরে নিলাম আল্লাহ্‌র মহব্বতেই আদম আর হাওয়া ইচ্ছা করেই গন্ধমটি খেয়েছেন, কিন্তু আমরা তো জান্নাতেই যাই নি, গন্ধম খাওয়ার প্রশ্নটি বহু দূরের কথা– তা হলে জান্নাত-জাহান্নামে যাবার প্রশ্নে এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি আমরা কী কারণে হলাম? হজরত আদম (আ.) -হাওয়া আল্লাহ্‌র প্রেমে ইচ্ছা করেই গন্ধম খেলেন, কিন্তু আমরা যদি ইচ্ছা করে গন্ধমটি না খাই তথা আইনজ্ঞের ভূমিকাটি পালন করি, তা হলে এর উত্তরটি কী হবে? ধরে নিলাম, আমরা কেউ ইচ্ছা করে খাবো না, তা হলে কী হবে?

'যে কেহ নিজের নফ্‌সকে পবিত্র করে সে তো পবিত্র করে নিজেরই নফ্‌সের মঙ্গলের জন্য।' আল্লাহ্‌র এই কথাগুলো ব্যাখ্যার পরিণামটি আমার মনে হয় সুফিবাদেরই ইঙ্গিত বহন করে।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৬৯

কোরান-এর ৩৫ নম্বর সুরা ফাতিরের ২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : নিশ্চয়ই যাহারা তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র কেতাব এবং সালাত কায়েম করে এবং ব্যয় করে যে রেজেক আমরা দিয়াছি গোপনে এবং প্রকাশ্যে তাহারাই এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে যাহার লোকসান নাই। (*ইন্‌নাল লাজিনা ইয়াত্‌লুনা কিতাবাল্লাহি ওয়া আকামুস সালাতা ওয়া আন্‌ফাকু মিম্‌মা রাজাক্‌নাহুম সির্‌রাও ওয়ালা নিয়াঁতাইঁ ইয়ার্‌জুনা হিজারাতাল্লান তাবুর*)।

ব্যাখ্যা

এখানে একটি বিষয় লক্ষ করার মতো আর উহা হলো 'কোরান তেলাওয়াত করে' না বলে 'কেতাব তেলাওয়াত করে' বলা হয়েছে। 'কেতাব' শব্দটির দ্বারা প্রধানত দুই রকম অর্থ করা যায় : একটি *কোরান* আর অপরটি আল্লাহ্‌র প্রতিনিয়ত বিকাশমান সৃষ্টিজগতের রহস্যটিকে তেলাওয়াত করা তথা পাঠ করা। এই পাঠ করাটিকেও আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : একটি মুখে উচ্চারণ করে পাঠ করা এবং বিজ্ঞানীদের প্রকৃতির বৈচিত্র পাঠ করা, অপরটি ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নুরে নুরময় হয়ে আল্লাহ্‌র চলমান বিকাশ ও প্রকাশকে পাঠ করা। একটি চোখ খুলে পড়া যায় অথবা কণ্ঠস্থ থাকলে চোখ বন্ধ

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

করেও পড়া যায়। উহাই *কোরানুল মবিন*। এই *কোরান*-কে মৌখিকভাবে পাঠ করতে হলে আরবি ভাষাটি জানতে হয় অথবা যে কোনো ভাষায় ইহার উচ্চারণগুলো লিখে পাঠ করা যায়। *কোরান* পাঠ করার বিষয়টিতে সার্বজনীনতা থাকলেও আরবি ভাষায় কিছুটা আক্ষরিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তাই আল্লাহ্‌র সার্বজনীনতার ভাবটি তুলে ধরার জন্য কেতাব তেলাওয়াত করতে তথা পাঠ করতে পারে যারা, তাদের কথাটি এখানে বলা হয়েছে। মেজাজি অর্থেও ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। আবার হাকিকি অর্থের ব্যাখ্যটি হলো আসল ব্যাখ্যা, যদিও হাকিকি ব্যাখ্যাটি অসীম এবং দুনিয়ার সব গাছগুলো যদি কলম হয় তবুও– হাকিকি কেতাবের কিছুটা তেলাওয়াত করা যায়– কিন্তু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাটি প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়।

আল্লাহ্‌র *কোরান* যে বিস্ময়ের বাবার বাবা এবং জগতের একটি অতুলনীয় গ্রন্থ (ধর্মের সাইনবোর্ড ফেলে নিরপেক্ষ হয়ে লিখছি) ইহা গভীর মনোযোগ সহকারে একাগ্রচিত্তে ৩০/৪০ বছর পাঠ করলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। অধম লিখক প্রায় ৪০টি বছর বহু *কোরান*-এর তফসির, বহু আরবি ডিকশনারি এবং বহু *কোরান*-এর লোগাত পাঠ করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এবং *কোরান* বার বার পাঠ করে একটি মূল্যবান বিষয় জানতে পেরেছি আর সেই বিষয়টি হলো, অধম লিখক *কোরান*-এর কিছুই বুঝতে পারি নি। অবশ্য প্রথম ১০/১২ বছর *কোরান* পাঠ করে এবং *কোরান*-এর বিভিন্ন তফসির ঘেঁটে এই মনে হয়েছিল যে, *কোরান* বিষয়টিতে ভালো জ্ঞান অর্জন করেছি। অধম লিখকের এই কথাগুলো মোটেই রূপক ভাষার আশ্রয় নিয়ে বলছি না, অথবা জ্ঞানীদের মতো বিনয়ের ভাষায় বলছি না, অথবা দার্শনিক সক্রেটিস এবং বিজ্ঞানী নিউটনের মতো করে মোটেই বলছি না, বরং একদম সাদামাটা ভাষায় সরল মনে মনের কথাগুলো তুলে ধরলাম।

এই আয়াতে সালাত তথা যোগাযোগ তথা সংযোগটি যারা কায়েম করে এবং পরে বলা হয়েছে, 'এবং আমরা (এখানে আল্লাহ বহুবচন ব্যবহার করেছেন একবচন নয়, কারণ রেজেক দেবার সময় *কোরান*-এর প্রতিটি স্থানে আল্লাহকে বহুবচনে পাওয়া যায়, একবচনে নয়।) যে রেজেক তাহাদেরকে দিয়াছি উহা হইতে ব্যয় করে।' রেজেক বিষয়টিতেও মেজাজি রেজেক এবং হাকিকি রেজেক দুইটিই পাওয়া যায়। ***মেজাজি রেজেক বলতে আমরা ধন-সম্পদকেই বুঝে থাকি। কিন্তু হাকিকি রেজেক বলতে একটি মানুষকে অন্ধকার জগত হতে নুরানি জগতে নিয়ে আসা বুঝায়।*** কারণ *কোরান*-এর অনেক স্থানে অনেকবার আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি বেহিশাব রেজেক দান করেন। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ্‌র *কোরান* মানুষের কথা নয়, সুতরাং *কোরান*-এর প্রতিটি শব্দের ভেতর কিছু না কিছু রহস্য লুকিয়ে থাকে। দুনিয়ার বৈষয়িক ধনসম্পদ কখনই বেহিশাব তথা হিশাব ছাড়া হতেই পারে না। কারণ সমগ্র পৃথিবীতে কত কোটি টন চাউল, কত কোটি টন গম, আলু, কাসাভা, শাক-সব্জি, মাছ-মাংস ইত্যাদির হিসাবটি এই আধুনিক যুগে দেওয়া একটি মামুলি ব্যাপার– যেখানে দুনিয়ার

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ওজনটি কতটুকু তারও হিসাবটি পাই, সুতরাং 'বেহিশাব রেজেক দেওয়া হয়' কথাটিতে মেজাজি রেজেকের কথাটি বলা হয় নি বলেই মনে হয় (আমার ভুলও হতে পারে)।

এখানে আরেকটু বলে রাখা ভালো যে, মেজাজি রেজেকটি প্রকাশ্যে ব্যয় করা যায়, কিন্তু হাকিকি রেজেকটি গোপনে ব্যয় করতে হয়। হাকিকি রেজেকটি প্রকাশ্যে ব্যয় করার বিধানটি নাই। তাই আমরা এখানে দেখতে পাই যে, মেজাজি রেজেক এবং হাকিকি রেজেক দুটোরই উল্লেখ করা হয়েছে। অধম লিখকের জানা মতে, দুনিয়াতে এমন কোনো ব্যবসা নাই যে-ব্যবসা লোকসান তথা ক্ষতির মুখোমুখি না হয়। সুদের ব্যবসাটিকে ব্যবসা নাম দিয়ে ব্যবসাটিকে অপবিত্র করতে চাই না। কারণ যারা আসল সুদখোর (ব্যাংকের মুনাফার কথাটি বলছি না) তাদেরকে কীটপতঙ্গও ঘৃণা করে। যদি অধম লিখককে পরীক্ষা করতে চান তা হলে একটু পরীক্ষা করেই দেখুন। সুরা বনি ইসরাইলের ৭৮ নম্বর আয়াতটি লিখে তিনজন সুদখোরের নাম (ব্যাংকের মুনাফাখোরদের কথা নয়, যারা প্রতি মাসে ১০০ টাকার সুদ ১০/১৫ টাকা করে নেয়, এরাই আসল সুদখোর) তাদের মায়ের নামসহ একটি কাগজে লিখে সেই কাগজটি ডালিম গাছে, কদবেল গাছে, গরুর খুরায়, পোকা লাগা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে ঝুলিয়ে দেন, দেখতে পাবেন গাছের এবং গরুর খুরা হতে পোকাগুলো সরসর করে নেমে গেছে। অধম লিখক এই কাজটি করার পর কাজের ফলটি দেখে অনেকটা নির্বাক হয়েছিলাম। সুতরাং যে ব্যবসায়ে লোকসান হবার প্রশ্নই ওঠে না সেই ব্যবসাটি হলো হাকিকি ব্যবসা, যা আল্লাহ্‌র ওলিরা করে থাকেন। তাই বলা হয়ে থাকে যে আল্লাহ্‌র ওলিদের দিয়েই আল্লাহ্‌র পরিচয় কিছুটা জানা যায়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭০

কোরান-এর ৩৯ নম্বর সুরা যুমারের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি রাত্রির প্রতিটি প্রহরে সেজদায় থাকিয়া এবং দাঁড়াইয়া এবাদত করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তাহার রবের রহমত আশা করে, বলো, যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান? উলুল আলবাব্‌রাই (জ্ঞানী সম্প্রদায়ের লোকেরাই) তো উপদেশ গ্রহন করে। (*আম্মান হুওয়া কানিতুন আনায়াল লাইলি ছাজিদাও ওয়া কায়িমাই ইয়াহ্‌যারুল আখিরাতা ওয়া ইয়ার্‌জু রাহমাতা রাব্বিহি কুল হাল ইয়াস্তাওয়িল লাজিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাজিনা লা ইয়ালমুনা, ইন্‌নামা ইয়াতাযাক্কারু উলুল আলবাব*)।

ব্যাখ্যা

এখানে একটু ভালো করে লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন এবং মাথার মগজে একটি চৈতন্যের মৃদু আঘাত লাগবে যখন দেখতে পাবেন যে, এবাদত-বন্দেগি এবং সেজদার অবস্থা তথা আনুগত্যের হালের অবস্থানটি দিনের বেলায় বর্ণনা করা হয় নি। কারণ দিনের বেলার এবাদত-বন্দেগি দেখা যায়, অথবা অন্য কিছু অজ্ঞাত গোপন বিষয় আছে যার জন্য দিনের বেলায় এবাদত না করে রাত্রির প্রতিটি প্রহরের

কথা বলা হয়েছে। দিনের বেলায় বৈষয়িক বিষয়ের দৃশ্যগুলো আপন নফ্সের উপর অনেক রকম আঘাত দিতে পারে। ষড়রিপুর ডিশ অ্যান্টেনাগুলো বৈষয়িক বিষয়গুলোকে দিনের বেলায় তাড়াতাড়ি আঘাত করে। তাই আমরা দেখতে পাই, যত এবাদত-বন্দেগির কথা বলা হয়েছে এবং মেরাজে গমনের কথাটি বলা হয়েছে এবং কদর তথা শক্তিশালী দিনের কথা না বলে কদর তথা শক্তিশালী রাত্রির কথা বলা হয়েছে। মেজাজি দৃষ্টিভঙ্গিতে দিনের বেলাতেও এবাদত-বন্দেগি করার কথাটি পাই। কিন্তু রহস্যলোকে প্রবেশ করার জ্ঞানটি অর্জন করার জন্য রাত্রির প্রতিটি প্রহরে এবাদত-বন্দেগি করার উপদেশটি দেওয়া হয়েছে। হাকিকি এবাদত তথা ধ্যানসাধনাটি অন্ধকারে একদম নির্জন স্থানে একাকী করতে হয়। সেই মহা উদাহরণটি, মহানবি জাবালুন নুর পর্বতের আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে হেরাগুহায় পনেরটি বছরের ধ্যানসাধনাটি করার মাধ্যমে উম্মতদের জন্য এবং জ্ঞানী লোকদের জন্য রেখে গেছেন।

মহানবি কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। যিনি কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন তাঁর জন্য শিক্ষকের তথা পীরের কোনো প্রয়োজন হয় না। আবহাওয়াবিদেরা বলেন যে, ঝড়ের মূল কেন্দ্রে কোনো ঝড় থাকে না। পাথরের তৈরি ডাল ভাঙার জাতাকলের মাঝখানে কোনো ডাল ভাঙে না। তারপরেও মহানবি তাঁর উম্মতদের শিক্ষা দেবার জন্য, নিজে প্রথমে পনেরটি বছর নির্জন হেরাগুহায় ধ্যানসাধনা করেছেন। এই ধ্যানসাধনাটি মহানবির জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়, বরং তাঁর উম্মতদের শিক্ষা দেবার জন্য প্রযোজ্য। কারণ মহানবি তখনও নবি যখন আদি পিতা আদম (আ.) ও আদি মাতা হাওয়া মাটি ও পানিতে অবস্থান করেছেন। ৪০ বৎসর বয়সে মহানবি যে নবুয়ত পেয়েছেন ইহা অতীব সত্য, কিন্তু ইহা মেজাজি সত্য, হাকিকি সত্য নয়। কারণ *কোরান* যেখানে বলছে যে মহানবি জীবনেও একটি কথা নিজের পবিত্র নফ্স হতে বলেন নি, বরং আল্লাহ যা বলতে বলেছেন তাই তিনি বলেছেন, সুতরাং মহানবির জাহেরি জাত-নুরের দেহটিতে যতদিন অবস্থান করেছেন ততদিনই তিনি নবি। সুতরাং মহানবির জাহেরি জন্মটিতেই তাঁর আজন্ম নবিত্বের পরিচয় পাই।

আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় আর সেই প্রশ্নটি হলো, মহানবি কি একটি দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? যেখানে বিশ্ববিখ্যাত ওলি-আল্লাহ হজরত বাবা আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি বলছেন, *‘খুদবা খোদ আজাদ বুদি খোদ গেরেফতার আমুদি’* অর্থাৎ ‘আপন ইচ্ছায় দেহ হতে যেমন বেরিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়।’ সুতরাং দেহটি যতই নুরানি হোক, সেই নুরানি দেহের মধ্যেই মহানবির শান-মান-জালুয়াকে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, আল্লাহ বলছেন : আমরা তোমার শাহারগের নিকটেই আছি। সুতরাং মহানবির সঙ্গেই তো আল্লাহ আছেন। এর বেশি ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি একদম উলঙ্গ হয়ে যায় তাই জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। এখানে সাধক না বলে যে কোনো ব্যক্তি, যিনি রাতের অন্ধকারের প্রতিটি প্রহরে সেজদায় থাকেন ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং আখেরাতকে ভয় করেন এবং রবের রহমত পাবার আশা করেন, সেই ব্যক্তিটি তো কখনই তাদের সমান হতে পারে না অন্য যারা এইভাবে এবাদত-বন্দেগি করে না। তাই *কোরান* বলছে, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা

কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই সমান নয়। তারপর বলা হয়েছে, আলবাবরাই তথা যারা এই বিষয়গুলো জানবার আগ্রহ প্রকাশ করে তারাই এই উপদেশগুলোকে মেনে নেয়।

পরিশেষে একটি কথা না বলে পারলাম না আর সেটা হলো, আনুগত্য প্রকাশ করতে গেলেই দাঁড়াবার কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। বসে বসে আনুগত্য অবশ্যই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করার কথাটি বেশি পাই। সুতরাং মহানবির আনুগত্য প্রকাশের জন্য দাঁড়িয়ে কেয়াম করবো, না বসে কেয়াম করবো? পাঠক বাবা-মায়েদের হাতে এই বিচারের ভারটুকু তুলে দিলাম। তারপরেও একটি কথা থেকে যায় যে, আপনার তকদির আপনাকে বসাতেও পারে, দাঁড়াতেও পারে। কারণ জন্মের আগেই প্রতিটি মানুষের তকদির নির্ধারিত। এই নির্মম সত্যটি মেনে নেওয়াও তকদির, আবার না মেনে নেওয়াটাও তকদির।

অধম লিখকের ইহা একটি নিজস্ব মত আর তা হলো, দিনের আলোকে গাছ-ভরা আম, গাছ-ভরা লিচু, গাছ-ভরা কমলা ইত্যাদি ফলগুলো সহজেই দেখতে পাই, কিন্তু রাতের অন্ধকারটি যখন ছেয়ে যায় তখন আর আম, লিচু, কমলা, পেঁপে ইত্যাদি ফলগুলো দেখা যায় না। দিনের বেলায় সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায়, অথচ রাতের আঁধারে গাছ-ভরা আমের একটি আমও দেখা যায় না। ছোট পাহাড়ের টিলার মতো অন্ধকারের বোরকা দিয়ে যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। মানুষের ভিতরের রিপুগুলো রাতের আঁধারে অনেকখানি দুর্বল থাকে, তাই রাতে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ তথা সংযোগ তথা সালাতে দাঁড়াবার উপদেশটি পাই। তা ছাড়া প্রায় আল্লাহ্‌র ওলিরাই সারা রাত জেগে সালাত ও জিকিরে মশগুল থাকেন। তাই হয় তো এবাদতের মোক্ষম সময় হিসেবে রাতের অন্ধকারকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

জাগ্রত অবস্থায় বাহ্যিক দৃশ্যগুলো আমরা দেখতে পাই, পরক্ষণে ঘুমিয়ে গেলে আর দেখতে পাই না, তবে স্বপ্নে দেখার প্রশ্নটি বাদ দিলাম। একটি মানুষ রহস্যলোকে প্রবেশ করার ধ্যানসাধনাটি করুক চাই না করুক, কিন্তু রহস্যলোকে তাকে যেতেই হবে। একটি ঘটনা দিয়ে রহস্যলোকে তাকে নিয়ে যাবে, সেই ঘটনাটির নাম মৃত্যু। মৃত্যু কখনই ধ্বংস নয়। সুতরাং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবার কথাটি একবারও বলা হয় নি। যিনি বা যারা জীবিত থাকতেই রহস্যলোকে প্রবেশ করতে পেরেছেন, তাদেরকেই লক্ষ করে বলা হয়েছে, '*মুতু কাবলা আনতা মুত*' তথা 'মরার আগে মরে যাও।' মৃত্যু অর্থ ধ্বংস নয় বটে, মৃত্যুকেই আবার *কোরান* কেয়ামত বলেছে। তবে মৃত্যু নামক ঘটনাটিকে কেয়ামতে সগিরা তথা ছোট কেয়ামত বলা হয়েছে। *কোরান* বলছে, কেয়ামতের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে উঠানো হবে। এখানে নফ্‌স তথা জীবাত্মাটিকে উঠানোর কথা বলা হয়েছে, দেহটির কথা বলা হয় নি, কারণ দেহটি হলো নফ্‌স তথা জীবাত্মার একটি পোশাক মাত্র। ***আমরা যেমন পুরনো পোশাক ফেলে দিয়ে নূতন পোশাক দেহে ধারন করি, সে রকম নফ্‌স তথা জীবাত্মাটিও দেহ নামক পোশাকটি বার বার বদলায়। হিন্দুশাস্ত্রে ইহাকে পুনর্জন্মবাদ বলা হয়। ইসলামে ইহাকে আরবি ভাষায় কেয়ামত বলা হয়।*** এই কেয়ামতটি বিবর্তনবাদের বলয়ে বাঁধা থাকে।

সুতরাং বিবর্তনবাদের রহস্যটি না বোঝার দরুন অনেক রকম চিন্তার অনেক রকম কথার ফসলগুলো আমরা অহরহ দেখতে পাই।

সম্পূর্ণ একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে চাই। বলতে চাই যে, অধম লিখকের বইটি পড়ে যদি মনে করেন যে *কোরান*-এর তফসিরটি করা কর্তব্য তা হলে অধম লিখককে আর্থিক সাহায্য করতে পারেন। কোরবানির চামড়ার টাকা, জাকাতের টাকার সামান্য একটি অংশ কি আপনাদের কাছে চাইতে পারি না?

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭১

কোরান-এর ৪২ নম্বর সুরা আশ্ শুরার ৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: এবং যাহারা তাহাদের রবের জন্য সাড়া দেয় এবং সালাত কায়েম করে, এবং পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কার্যসম্পাদন করে এবং আমরা যে রেজেক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে (*ওয়াল লাজিনাস তাজাবু লিরাব্বিহিম ওয়া, আকামুস্ সালাতা ওয়া আমরুহুম শূরা বাইনাহুম ওয়া মিম্মা রাযাক্নাহুম ইয়ন্ফিকুন*)।

ব্যাখ্যা

প্রথমেই বলতে হয় যে রবের ডাকে সাড়া দেওয়াটি দুই প্রকার : একটি মেজাজি সাড়া দেওয়া এবং অপরটি হাকিকি সাড়া দেওয়া। রবের জন্য সাড়া দেওয়াটি কখনই একটি মামুলি বিষয় নয়, কারণ আপন নফ্স তথা জীবাত্মার সঙ্গের খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার পরই রবের জন্য সাড়া দেওয়া যায়। অন্যথায় সারা জীবন চীৎকার করলেও কোনো সাড়া পাবার আইনটি রাখা হয় নি। আরও একটি কথা অনিচ্ছায় পাঠকদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই। ***আপন নফ্সের সঙ্গে খান্নাসটিকে জড়িয়েই বৈষয়িক সভ্যতা (ম্যাটেরিয়াল সিভিলাইজেশন) ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে।*** বৈষয়িক বিজ্ঞানের চোখ-ধাঁধাঁনো বিস্ময়কর চলমান আবিষ্কারগুলো সবই কিন্তু আপন নফ্সের সঙ্গে খান্নাসকে রেখেই করা হয়েছে। শুনলে মনে কষ্ট হয়, বোবা বিদ্রোহের একটি উত্তাপ উত্থিত হতে চায়, কিন্তু ইহা যে একটি নির্মম সত্য, উলঙ্গ সত্য। আবার একটু সান্ত্বনাটিও তো পাই। কখন পাই? যখন *কোরান* হতে জানতে পারি যে নবি দাউদ (আ.) এবং নবি সোলায়মান (আ.) জিনদের দিয়েই জেরুজালেম নগরী এবং বায়তুল মোকাদ্দাসটি বানিয়েছিলেন। যে বায়তুল মোকাদ্দাসটি জিন দ্বারা বানানো হয়েছিল উহা মেজাজি বায়তুল মোকাদ্দাস : ভুলেও চিন্তা করবেন না যে উহা হাকিকি বায়তুল মোকাদ্দাস।

যে বিজ্ঞানী ৬০০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত নিউট্রন নক্ষত্রটি আবিষ্কার করেছেন, যে নক্ষত্রটির এক চায়ের চামচ উপাদান পৃথিবী গ্রহে এনে মাপলে এর ওজন হয় ১০০ কোটি টন, সেই বিজ্ঞানী কিন্তু আপন নফ্সের সহিত খান্নাসকে রেখেই নিউট্রন নক্ষত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন। আল্লাহ্র প্রতিটি বিষয়ে স্থূলতার অভ্যন্তরে সূক্ষাতিসূক্ষ রহস্যময় ইঙ্গিতগুলো লুকিয়ে থাকে। কেউ ধরতে পারে, কেউ পারে না। ধরা এবং না ধরাটিও তকদির। এই কথাগুলো *কোরান*-এর সুরা মোমিনে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া

হয়েছে। আপন রবের ডাকে সাড়া দেওয়া এবং আপন রবকে সাড়া দেবার জন্য ডাকা– দু'টোই ধ্যানসাধনার মাধ্যমটি ছাড়া এক প্রকার অসম্ভব (মাদারজাত ওলি, মাজ্জুব এবং আবদালদের কথা আলাদা)।

দুনিয়ার ভিখারি সারাদিন দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সহজে সাড়া পায় না, আর এটা তো রবরূপী আল্লাহ্‌র সাড়া পাবার জন্য বলা হয়েছে। বাক্যটি খুবই ছোট, কিন্তু ইহার গভীরতা ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় বিরাট একটি লুকানো বিষয়। তবে এটিকে ওপেন সিক্রেট বলা যায়। অনেকটা এই রকম কথা যে, এই সামান্য আটলান্টিক সাগরটি পারি দিতে পারলেই আমেরিকা দেখতে পাবেন। আকাশযানের কথা বলছি না, স্টিমারে করে গিয়েই দেখুন না কত বড় ঠেলা সামলাতে হয়! অথচ এই তো আটলান্টিকের ওপারেই আমেরিকা। শুনলে মনে হয় যেন ছেলের হাতের মোয়া, কিন্তু ব্যাপকতার প্রশ্নে এইটা যে কত বিশাল এবং কত ঘাত প্রতিঘাতের মুখোমুখি হতে হয় তা কেবল স্টিমারের যাত্রীরাই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে।

বাক্যটি মেজাজি তথা ছোট, কিন্তু হাকিকি তথা আসল রূপটি যে কত ব্যাপক এবং পদে পদে হোঁচট খেতে হয় তা যারা ধ্যানসাধনা করেছেন বা করেন তারাই মর্মে মর্মে বুঝতে পারেন। কী সুন্দর করে বলা হয়েছে, যারা তাদের রবের জন্য সাড়া দেয়! কিন্তু এই সাড়া দেওয়াটি কখনই এবং কোনো কালেই নিজের নফ্‌সের ভিতরে আরেকজন খান্নাস থাকলে পাওয়া তো দূরের কথা, বরং সাড়া পাওয়ার আইনটিও রাখা হয় নি।

রবরূপী আল্লাহ্‌র জন্য সাড়া দিতে চাও? তা হলে যোগাযোগ তথা সংযোগ তথা আরবি ভাষায় সালাতটিকে দাঁড় করাও, তথা সালাতের মধ্যে ডুবে যাও, তথা ওয়াক্তিয়া নামাজে নয়, বরং দায়েমি সালাতের মধ্যে ডুব দাও। মহানবি বলেছেন, *'আস্‌সালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম মিনাল সালাতিল ওয়াক্তি'* অর্থাৎ, 'ওয়াক্তিয়া নামাজ হইতে দায়েমি নামাজ অনেক আফজাল তথা মর্যাদাপূর্ণ।' *কোরান*-এর ৭০ নম্বর সুরা মারেজের ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, *'আল্লাজিনা হুম আলা সালাতিহিম দায়িমুনা'* অর্থাৎ যাহারা তাহাদের সালাতের উপর দায়েমিভাবে দাঁড়ায়, তথা সর্বক্ষণ সালাতের মধ্যে ডুবে থাকে, তথা যোগাযোগের মধ্যে তথা সংযোগের মাঝে নিজের নফ্‌সটিকে সজাগ রাখে তথা নফ্‌সের সঙ্গে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে তাঁরাই এই অবিরাম ধ্যানমগ্নতায় অবিরাম ধৈর্যধারণের মাধ্যমে যখন রবরূপী আল্লাহ্‌র সাড়া পাবার উপযুক্ত হয় তখনই রবরূপী আল্লাহ প্রতিনিয়ত সাড়া দিয়ে থাকেন। ইহা দৃশ্যমান জগতের (ফেনোমেনাল ভিশন) বিজ্ঞান নয়, বরং আপন খান্নাস মেশানো প্রবৃত্তিটির বিরুদ্ধে অবিরাম জেহাদ করার সাধনা।

রবরূপী আল্লাহ্‌র জন্য কেউ যদি উপযুক্ত হতে চায় তা হলে তাকে অবশ্যই অবিরাম সালাতে দাঁড়াতে হবে। এখানে আমরা রবের পরিচয় এবং সালাতের পরিচয়টি মেজাজি-রূপেও পাই আবার হাকিকি-রূপেও পাই। যে যতটুকু জ্ঞানের বোঝা বহন করার উপযুক্ত আল্লাহ তাকে তার বেশি বোঝা চাপিয়ে দেন না, এবং ইহাও *কোরান*-এর একটি উপদেশ।

রবরূপী আল্লাহকে কেমন করে পাওয়া যায়, কীভাবে ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা-মোশাহেদাটি করতে হবে, এই বিষয়ের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন বা থাকেন, তাদের সঙ্গেই শলাপরামর্শ করার আদেশটি দেওয়া হয়েছে। ঘোর দুনিয়াদারদের কাছে পরামর্শটি চাইতে বলা হয় নি, কারণ ঘোর দুনিয়াদারদের কাছে পরামর্শটি নিতে গেলে কাঁচকলা পাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। একটু ভালো করে লক্ষ করে দেখুন আল্লাহ্‌র সবগুলো আদেশ বর্তমান কালে দেওয়া হয়েছে। তা হলে আল্লাহ্‌র রহস্যলোকে প্রবেশ করতে হলেও বর্তমান কালেই করতে হয়। তাই *কোরান* অন্যত্র বলেছে : যে দুনিয়াতে অন্ধ সে মরার পরও (আখেরাতে) অন্ধ থাকবে। আল্লাহ বর্তমান কাল দিয়ে আদেশ-নিষেধ করছেন আর পাওয়াটা যদি বাকি হয়, তথা মরে যাবার পর পাওয়া যাবে বলা হয়, তা হলে খনার বচনটি মনে পড়ে যায়, আর সেই বচনটি হলো, বাকির নাম ফাঁকি। মহানবি যে হেরাগুহায় নির্জনে ১৫টি বছর ধ্যানসাধনা করেছেন তার ফলাফলটি কি আল্লাহ বাকিতে দিয়েছেন, না নগদ দিয়েছেন? মহানবি নবুয়ত নগদই পেয়েছেন, বাকিতে নয়; আল্লাহ্‌র *কোরান* নগদই নাজেল হয়েছে, বাকিতে নয়; জিবরাইল আমিনের দর্শন নগদই হয়েছে, বাকিতে নয়– তা হলে মহানবিকে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করে বাকিতে পাবার কথাটি বড়ই বেমানান।

জন্মচক্রে বার বার কেয়ামতের মুখোমুখি হতে হতে যেদিন রবরূপী আল্লাহকে পাবার উপযুক্ত হয় তখনই পাওয়া যায়, অন্যথায় তকদির বড়ই নিষ্ঠুর। মনকে তৃপ্ত করার জন্য মনের মুখে হালুয়া-রুটি দেবার জন্য রবরূপী আল্লাহ্‌র নামে অনেক রকম মনগড়া ধানাই-পানাই-র কথাগুলো যুক্তিতর্কের মেকি মুখোশ পরিয়ে বিবেককে ফাঁকি দেবার ডুগডুগি বাজানো হয়। এতেই বা কাকে দোষ দেব? কারণ সবই তো তকদিরের খেলা।

আবার বলা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (সবাই আমভাবে বলা হয় নি) যে রেজেক দেওয়া হয়েছে উহা হতে ব্যয় করতে বলেছেন। চেয়ে দেখুন, এখানে 'আনা' তথা আমি শব্দটি নেই, বরং 'নাহনু' তথা আমরা তথা বহুবচনটি আল্লাহ ব্যবহার করেছেন। আগেই বলেছি যে, রেজেক বণ্টন করার প্রশ্নে আল্লাহ বহুবচনের রূপটি ধারণ করেন। এবং এই রেজেক ব্যয় করার প্রশ্নেও একটি বলয়, একটি দেয়াল, একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা সাধক, যারা আল্লাহকে পাবার সাধনায় সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন, কেবল তাদের জন্যই রেজেকটি ব্যয় করার কথাটি বলা হয়েছে। এই রেজেকটির প্রশ্নেও মেজাজি রেজেক এবং হাকিকি রেজেক কথা দু'টো এসে যায়। কী নিখুঁতেরও নিখুঁত *কোরানুল করিম!* কী মহা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান *কোরানুল হাকিম!* কেউ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না। পারা এবং না পারা দুটোই তকদরি। যদি রাগান্বিত হন এই কথাগুলো পড়ে, তা হলে এই রাগান্বিত হওয়াটাও তকদির। এই কথাগুলো পড়ে যদি খুশি হন, এই খুশি হওয়াটাও তকদির। এই বইটির ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন তো এটাও তকদির। আবার যদি মনে করেন, কী আজেবাজে উল্টাপাল্টা সব কথা লিখে রেখেছে, তা হলে এটাও তকদির।

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭২

কোরান-এর ৫০ নম্বর সুরা ক্বাফের ৩৯–৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং ধৈর্যধারণ করো উহারা যাহা বলে তাহার উপরে এবং তসবিহ পড়ো তোমার রবের হাম্‌দ (প্রশংসা)-এর সহিত সূর্য উঠিবার আগে এবং সূর্য ডুবিয়া যাইবার আগে এবং রাত্রির মধ্যে তসবিহ পড়ো এবং সেজদার পরেও। (*ফাসবির আলা মাইয়াকুলুনা ওয়া সাব্‌বিহ বিহাম্‌দি রাব্‌বিকা কাবলা তুলুইশ শামসি ওয়া কাব্‌লাল গুরূব। ওয়া মিনাল লাইলি ফাসাব্‌বিহ্‌হু ওয়া আদ্‌বারাস্‌ সুজুদ*)।

ব্যাখ্যা

এখানে এই আয়াত দু'টির সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই ৪০ নম্বর আয়াতের শেষ অংশটির কথা বলতে চাই। বলা হয়েছে, '*ওয়া আদ্‌বারাস সুজুদ*' অর্থাৎ 'এবং সেজদার পরেও।' এই সেজদাটিকে প্রায় তফসিরকারীরাই 'সেজদা' শব্দটি ব্যবহার না করে 'সালাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তথা নামাজের কথাটি উল্লেখ করেছেন। যদিও ওয়াক্তিয়া সালাত তথা নামাজ পড়তে গেলে নামাজের সঙ্গে সেজদা শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কিন্তু তাই বলে সেজদা শব্দটি হুবহু না রেখে সালাত শব্দটি ব্যবহার করা কি সঠিক মনে করেন?

কোরান-এর সুরা রহমানে বলা হয়েছে, '*ওয়ান নাজমু ওয়াস সাজারু ইয়াস জুদান*' অর্থাৎ 'এবং তারকা (লতা) এবং গাছগুলো সেজদায় আছে।' কেউ যদি লিখেই ফেলেন যে আকাশের তারা আর গাছগুলো নামাজ পড়ছে তা হলে কি বাক্যটিকে হুবহু রাখা হলো? মোটেই না। হিব্রু ভাষায় হজরত ইসা (আ.)-র কাছে যে *ইঞ্জিল শরিফ*-টি নাজেল হয়েছিল উহার অনুবাদটি সর্বপ্রথম ধাতবপাতে খোদাই করে লেখা হয়েছিল। হিব্রু ভাষার মূল *ইঞ্জিল শরিফ*-টিকে ফেলে দিয়ে সরল অনুবাদ করা হয়েছিল। অনুবাদটি হুবহু হয় নি বলেই *ইঞ্জিল শরিফ*-টির বিষয়ে অনেক রকম কথার্বাতা, অনেক রকম মতভেদ জানতে পারি। আল্লাহ্‌র নাজেলকৃত হিব্রু ভাষায় হজরত ইসা (আ.)-র কাছে যে *ইঞ্জিল শরিফ*-টি নাজেল হয়েছিল সেই *ইঞ্জিল*-টি মানুষের আপন প্রবৃত্তির বিচারের মাধ্যমে অনুবাদ করা হয়েছিল। এটা যে কত বড় মারাত্মক অপরাধ করা হয়েছিল তাতে কেবল খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীরাই ব্যথিত হন নি, বরং সমগ্র মুসলিম জাতিও ব্যথিত হয়েছিলেন। কারণ যদি কোনো মুসলমান হজরত ইসা (আ.)-র উপর নাজেলকৃত *ইঞ্জিল*-টিকে অস্বীকার করে তবে সেই ব্যক্তিটি প্রথমেই কাফের। আর কোনো দলিলপত্র, যুক্তিতর্ক এবং আইনি লড়াই প্রয়োজন হয় না। কারণ *কোরান* প্রথমেই যে ৪টি আসমানি কেতাবকে মেনে নেয়ার কথাটি ঘোষণা করেছে তার মধ্যে *ইঞ্জিল শরিফ*-ও একটি। সুতরাং বিসমিল্লাতেই যেখানে গলদ সেখানে আর কোনো কথা অবশিষ্ট থাকে না।

সেজদাকে সালাত তথা নামাজ অনুবাদ যারা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলার থাকে না। তবে হুবহুটি রেখে দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও নূতন নূতন, আরও চমকপ্রদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারতো। তবে আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত যে আক্ষরিক *কোরান*-টুকু আমরা হুবহু পেয়েছি। যদি না পেতাম

তা হলে অধম লিখক সেজদা না লিখে 'সালাত' কথাটিই লিখতাম। এইখানেই *কোরান*-এর মাহাত্ম্য। কারণ যত রকম অনুবাদই করা হোক না কেন, মূল বিষয়টি তথা মূল *কোরান*-টি সামনে আছে বলেই আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর ভয় থাকার কথাটি আসে না।

আল্লাহ্‌র এই প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণাটি স্থুল দৃষ্টিতে মনে হবে যে মহানবিকেই করতে বলা হয়েছে, আসলে তা মোটেই নয়। ইহা মহানবির উম্মতদেরকে করতে বলা হয়েছে। একবচনে 'তুমি প্রশংসা করো, তুমি মহিমা ঘোষণা করো' পড়লে মনে হয়, ইহা মহানবিকেই আল্লাহ করতে বলেছেন। কিন্তু মহানবি তো নিজেই প্রশংসা এবং মহানবি তো স্বয়ং মহিমা। ইহা অধম লিখকের কথা নয়, বরং বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির পীর ও মুরশিদ বাবা শামসে তাব্রিজের কথা।

আজ যদি মূল ফারসি ভাষাটি এবং তার সঙ্গে বাংলা উচ্চারণটি এবং সঙ্গে অনুবাদটি বাংলাদেশের বড় বড় পীরের দরবার হতে প্রকাশ করা হতো তা হলে ওহাবিদের গরম বাতাসগুলো রুমি এবং শামসে তাব্রিজ নামক এয়ারকুলার দু'টি বাহির করে দিতো এবং কিছুটা হলেও সংশয়ের অবসান হতো। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বড় বড় দরবারগুলো কেন যে হাত গুটিয়ে বসে আছে ভেবে পার-কূল পাই না। অধম লিখকের মতো গরিব আর পচা পীর ভক্তদের টাকায়, কোরবানির চামড়ার টাকায়, জাকাতের টাকায়, মানতের টাকায়, একটির পর একটি বই প্রকাশ করে চলছি। এই বৃদ্ধ বয়সে সারাটি রাত জেগে জেগে এই দুঃখের বিলাপ পাঠকদেরকে একটু শোনালাম।

কোরান-এ আল্লাহ 'আনা আকরাবু ইলাইহে মিন্ হাবলিল ওয়ারিদ' তথা 'আমি তোমাদের শাহারগের নিকটেই আছি' না বলে 'নাহনু' তথা 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমরা বলতে নিশ্চয়ই বহুবচনকেই বুঝানো হয় এবং বহুবচনে অনেক (?) আল্লাহ্‌র কথাটি এসে যায়। ঠিক সেই রকম 'আপনি প্রশংসা করুন, আপনি মহিমা ঘোষণা করুন'– এই কথাগুলো মোটেই মহানবির জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং মহানবির উম্মতদের জন্য।

'*আউজুবিল্লাহে মিনাশ্ শায়তোয়ানুর রাজিম*' তথা 'পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাইছি' কথাটি মুখে হাজারবার ঘোষণা করলেও শয়তান আপনাকে মোটেও ছেড়ে দেবে না। কীভাবে পড়লে, কীভাবে অনুশীলন করলে শয়তান হতে আশ্রয় পাওয়া যায় সেই কথাগুলো, সেই উপদেশগুলো কামেল পীর হতে জেনে নিতে হয়। *তফসিরে হুসাইনি* আর *মেশকাত শরিফ* পাঠ-করা শর্তযুক্ত পীরদের কাছে জানবার কথাটি বলা হচ্ছে না, কারণ এই জাতীয় পীর দিয়ে দেশ ছেয়ে গেছে।

যখন কোনো সাধক ধ্যানসাধনার অদৃশ্য তরবারি হাতে নিয়ে জেহাদে আকবরে বছরের পর বছর আল্লাহকে পাবার জন্য জেহাদ করে যায় তখন সেই জেহাদির চেহারা-সুরত, চলন-বলন, সমাজের কাছে বেখাপ্পা মনে হয় এবং নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তামাশা করে থাকে। এই বিষয়টিতে সুলতানুল হিন্দ খাজা গরিব নেওয়াজের কেবলায়ে কাবা হজরত খাজা ওসমান হারুনি ফারসি ভাষায় বলে গেছেন : '*মানাম ওসমানে হারুনি ইয়ারে শায়েখ মানসুরাম, মালামাত মিকুনাদ খালকেউ বারদারে*

মিরাকসাম।' অর্থাৎ 'আমি উসমান হারুনি মনসুর হাল্লাজের বন্ধু। মনসুর হাল্লাজ যন্ত্রণার শূলীতে, আর আমি মানুষের ঠাট্টা-তামাশা আর বিদ্রুপের অদৃশ্য শূলীতে দাঁড়িয়ে তোমার প্রেমে নাচছি।'

আল্লাহ্‌র প্রেমিকের জন্য, আল্লাহ্‌র জেহাদে আকবরের অনুসারীদের জন্য একদিকে অবিরাম ধ্যানসাধনার কঠোর পরিশ্রমে ধৈর্যধারণ করা, আবার অন্যদিকে মানুষের ঠাট্টা-তামাশা-বিদ্রুপের উপর দাঁড়িয়ে বিশাল ধৈর্যধারণ করে প্রেমের নৃত্য করা।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৩

কোরান-এর ৫২ নম্বর সুরা তুরের ৪৮–৪৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : আপনি সবর (ধৈর্যধারণ) করুন আপনার রবের হুকুমে (নির্দেশে)। সুতরাং আপনি আমাদের (আল্লাহ একবচন ব্যবহার করেন নি) চোখের সামনেই আছেন এবং তসবিহ পাঠ করুন হাম্‌দ (প্রশংসা)-এর সহিত আপনার রবের যখন আপনি বিছানা ত্যাগ করেন এবং রাত্রিকালে এবং তারকাগুলি ডোবার সময়ে আপনি তসবিহ পাঠ করুন। (*ওয়াস্‌বির লিহুক্‌মি রাব্‌বিকা ফাইন্‌নাকা বিআ ইউনিনা ওয়া সাব্‌বিহ বিহামদি রাব্‌বিকা হীনা তাককুম। ওয়া মিনাল্‌ লাইলি ফাসাব্‌বিহ্‌হু ওয়া ইদ্‌বারান নুজুম*)।

ব্যাখ্যা

'সুতরাং আপনি আমাদের চোখের সামনেই আছেন' এই কথা কয়টির সামান্য ব্যাখ্যা দিতে চাই, কারণ অন্য বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা কমবেশি আগেই দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ এখানে 'আমরা'-রূপ ধারণ করে তাঁর রহস্যময় চোখের সামনেই আছেন বলে ঘোষণাটি দিলেন। এই চোখ বলতে কি মানবীয় দেহের মাঝে যে দুটি চোখ দেওয়া হয়েছে উহাকে বোঝানো হয়েছে কিনা জানি না। আল্লাহ প্রতিটি মানুষের জীবন-রগের (শাহারগের) নিকটেই আছেন বলে যে ঘোষণাটি দিয়েছেন সেই ঘোষণাই অন্যরকম ভাষায় তথা চোখের অবতারণাটি করেছেন। যারা ধ্যানসাধনা করছে তাদেরকে এই বলে বুঝানো হয়েছে যে আমরা (আল্লাহ) তোমার চোখের সামনেই আছি। এই চোখের সামনে থাকা বলাতেই আল্লাহ্‌র জাতরূপে থাকা বলা হয়েছে। সেফাতরূপে থাকার কথাটি এখানে বলা হয় নি। কারণ আমাদের চোখের সামনেই আছেন বলে ঘোষণা করার অর্থটিই হলো জাতরূপে অবস্থান করা। এখানে কেবল মেজাজি সালাত এবং হাকিকি সালাত যারা পালন করে আসছে তাদের কথাটি যদিও বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ, কিন্তু প্রতিটি মানুষের জীবন-রগের (শাহারগের) নিকটেই আল্লাহ আছেন বলা হয়েছে। এখানে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায় কোনো কিছুরই উল্লেখ করা হয় নি। যেহেতু আল্লাহ সার্বজনীন এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তথা মহানিরপেক্ষ, তাই তিনি প্রতিটি মানুষের শাহারগের নিকটে আছেন বলে ঘোষণা করেছেন।

হে সাধক, আল্লাহ যে রকম তোমাকে সব সময় দেখছেন অথবা আল্লাহ্‌র চোখের সামনেই আছো, সুতরাং তুমি অবিরাম ধ্যানসাধনা করে যাও তা হলে তুমিও তাঁকে দেখতে পাবে। হে সাধক, সালাতে

দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহ যে রকম বিশেষভাবে তোমাকে দেখছেন অথচ তুমি দেখছো না, তাই তুমিও দেখতে চেষ্টা করো– এই কথাটি বলা হয়েছে।

রাতের আঁধারে, তারকাগুলো বিদায়ের পরে এবং বিছানা ছেড়ে উঠে আসার সময়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে যাও। সাধককে আরও বলা হচ্ছে যে, এই ধ্যানসাধনা করতে গেলে অবশ্যই তোমাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কারণ সালাতের সঙ্গে ধৈর্যধারণ করার কথাটি আগেও বলা হয়েছে। ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে 'তোমার রবের হুকুমের অপেক্ষায়।' রবের হুকুমটি বলতে এখানে কী বুঝানো হয়েছে? আল্লাহ্‌র নৈকট্য পাবার কথাটি বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র দর্শনের মহা-ফয়েজ লাভের কথাটি বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র এই মহা-ফয়েজ তারাই লাভ করতে পারে যারা বিরাট ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্‌র হাম্‌দ তথা মহিমাটি ঘোষণা করে যায়। ইহা করতে গেলে বিরাট ধৈর্যের প্রয়োজন। এই ধৈর্য যার নাই তার জন্য আল্লাহ্‌র দর্শনের মহা-ফয়েজটিও নাই। তাই *কোরান*-এর অন্যত্র আল্লাহ বলছেন যে, আমি (আল্লাহ) ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছি অথবা থাকি। অতি অবাক করা একটি বিষয় হলো এই যে সালাত তথা নামাজের কথাটি *কোরানুল মবিন*-এ ৮২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। (আমরা চেষ্টা করবো পাঠকদের সামনে এই ৮২ বার সালাত কায়েমের কথাটি তুলে ধরতে)। অথচ কেন অতি অবাক হই? সমগ্র *কোরান*-এ একটিবারও বলা হয় নি যে আল্লাহ পাক নামাজিদের সঙ্গে আছেন তথা '*ইন্‌নাল্‌লাহা মা আল মুসাল্‌লিনা*' অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নামাজিদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন!' কেন বলা হয় নি?

আওলাদে রসুল শহিদে আজম ইমাম হোসায়েন– '*হুসাইনু মিন্‌নি ওয়া আনা মিনাল হুসাইন*' তথা ' হোসায়েন আমা হতে এবং আমি (মোহাম্মদ) হোসায়েন হতে'– ঈদের জামাতে নামাজ পড়ার আগে ইমাম হোসায়েনকে মহানবি কাঁধের ওপর নিয়ে একটু দ্রুতপদে এগিয়ে চলছেন। ফারুকে আজম ওমর ফারুক বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার মোহরে নবুয়তের উপর ইমাম হোসায়েনের পায়ের লাথি পড়ছে।' মহানবি বললেন, 'ওমর, যার পায়ের লাথি মোহরে নবুয়তের উপরে পড়ছে, দ্যাখো সে কত সুন্দর।' মহানবি মসজিদে খুৎবা দিচ্ছেন। কিশোর ইমাম হোসায়েন মহানবির দিকেহেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন। পায়জামার নিচের অংশটি ইমাম হোসায়েনের পায়ের নিচে পড়ে যাবার সম্ভাবনাটি দেখে মহানবি খুৎবা পাঠ ফেলে রেখে ইমাম হোসায়েনকে কোলে তুলে নিলেন। মহানবি বলেছেন, 'কে সৈয়দদের বাবাকে দেখতে চাও? দেখে নাও ইমাম হোসায়েনকে।' সেই ইমাম হোসায়েনের তাঁবুতে নামাজ আদায় করার জন্য আজান হচ্ছে কারবালার রণপ্রান্তরে, আবার অন্যদিকে নরপিশাচ এজিদের তাঁবুতেও আজান হচ্ছে নামাজ আদায় করার জন্য। একই আজানের ধ্বনি ইমাম হোসায়েনের তাঁবুতে, আবার নরপিশাচ এজিদের তাঁবুতে। একই নামাজ, রুকু, সেজদা ইমাম হোসায়েনের তাঁবুতে, আবার নরপিশাচ এজিদের তাঁবুতে– তা হলে আদিল (সূক্ষ্মবিচারক) আল্লাহ কী করে নামাজিদের সঙ্গে থাকেন?

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

এই ৪৮ ও ৪৯ নম্বর আয়াত দু'টোর সারসংক্ষেপটি বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, হে সাধক, হে সালাত পালনকারী, তোমাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। তোমাদেরকে রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে হবে। সেটা বিছানা ছেড়ে ওঠার সময়েই হোক আর নিশীথ রাতের অন্ধকারেই হোক, অথবা তারকাদের বিদায় ঘণ্টাই বাজুক। আরও বলা হলো, তোমাদের এই ধ্যানসাধনা, তোমাদের এই সালাত আল্লাহ দেখছেন। তাই বলা হয়েছে, হে সাধক, তুমি তো আমার চোখের নজরেই আছো। রহমতের মহা-ফয়েজ পাবার অপেক্ষায় থাকতে চেষ্টা করো।

আওলাদে রসুল ইমাম জাফর সাদেক (আ.) বলেছেন, '*মান আরাফাল্লাহা আরাদা আম্‌মা সেওয়াহু*' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছে সে সব কিছু হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।' আল্লাহ্‌র বন্ধুদের বিষয়ে আল্লাহ এইরূপ বলবে, '*আজল ইয়ায়ি তাহ্‌তা কাবায়ি লা ইয়া রেফুহুম গায়েবি*' অর্থাৎ 'আমার বন্ধুগণ আমার কাবার আবরণে আবৃত, আমি ছাড়া অন্য কেহ তাদেরকে চিনতে পারে না।'

বাগদাদের বিখ্যাত ওলি হজরত মোহাম্মদ ওয়াসে বলেছেন, '*মা রাআইতু শাইয়ান ইল্‌লা রাআইতুল্লাহা ফিহে*' অর্থাৎ 'আমি কোনো বস্তুই দেখি নাই অথচ যা দেখেছি তাতে আল্লাহকেই দেখেছি।'

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৪

কোরান-এর ৫৩ নম্বর সুরা নজমের ৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং আল্লাহকে সেজদা করো এবং এবাদত করো। (*ফাস্‌জুদু লিল্লাহি ওয়াবুদু*)।

ব্যাখ্যা

ছোট্ট একটি আয়াত এবং তার হুবহু অর্থটি করা হলো। কিন্তু এই আয়াতটির আগে বলা হলো, কেয়ামত অতি নিকটে। এবং এই কেয়ামতের রহস্য একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং যারা আল্লাহ্‌র ওলি হয়েছেন তারা জানেন। তবে একটি কথা বলতে হয় যে, আল্লাহ জানালেই জানা যায়, অন্যথায় অসম্ভব।

কেয়ামত দুই প্রকার : একটি ছোট কেয়ামত, অপরটি বড় কেয়ামত। একটি কেয়ামতে সগিরা, অপরটি কেয়ামতে কবিরা। উপরের আয়াত কয়টি পড়লে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা কেয়ামতে সগিরা তথা একটি মানুষের মৃত্যুই কেয়ামত তথা ছোট কেয়ামত। তাই বলা হচ্ছে, এই দুনিয়ার মায়ার খপ্পড়ে পড়ে, দুনিয়ার মোহে ডুবে থেকে কী সুন্দর হাসিঠাট্টা করছো! কিন্তু কেয়ামত অতি নিকটে থাকা সত্ত্বেও একটু অনুতাপ, একটু আক্ষেপ, একটু গবেষণা এবং কেয়ামতের যে মুখোমুখি হতে হবে একদিন সেই জন্য কি কাঁদতেও পারো না?

আল্লাহ স্বয়ং বিস্ময় প্রকাশ করছেন। সর্বগ্রাসী শাস্তির কথাটিও কি চিন্তা করে একটু অনুতপ্ত হও না? একটু ক্রন্দন করতে পারো না? আর অনুতাপ ও ক্রন্দন করবেই বা কেমন করে? কারণ কেয়ামত বিষয়টি ভাববার সময় তো তোমরা পেলে না! তোমরা তো একদম উদাসীন। তোমরা মনেই করো না যে কেয়ামত

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

অতি নিকটবর্তী। এই লোভের সংসারের মায়ায় ডুবে থেকে কী করেই বা ভাবতে পারো! তাই তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ্র আনুগত্যকে মেনে নাও, তথা সেজদা করো এবং আল্লাহ্র এবাদত করো।

তোমরা কি দেখো নাই, সেই প্রাচীন আদ জাতিকে মূর্তিপূজার জন্য তথা আপন খেয়ালখুশি মতো চলার জন্য, এবং সামুদ জাতিকেও, ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল– ওই মূর্তিপূজার কারণেই, তথা আপন খেয়ালখুশি মতো চলার কারণেই। ***আপন খেয়ালখুশি মতো চলাকেই বলা হয় মূর্তিপূজা,*** তবে উহা হাকিকি মূর্তিপূজা, মেজাজি মূর্তিপূজা নয়। ইহা যদি সত্যিই মেজাজি মূর্তিপূজা হতো তা হলে আমরা দেখতে পাই, অখন্ড বিশাল ভারতে মেজাজি মূর্তিপূজা তথা নিজ হাতে পাথর, মাটি, ধাতব পদার্থ দিয়ে মূর্তি বানিয়ে আজও পূজা করে চলছে। মেজাজি মূর্তিপূজার কথাটি যদিও আমরা গ্রহণ করে নিতে পারি না, কিন্তু আদ ও সামুদ জাতিকে যে মূর্তিপূজার জন্যই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল সেটা ছিল হাকিকি মূর্তিপূজা তথা আপন খেয়ালখুশি মতো চলা। নতুবা অখন্ড ভারতে এই মেজাজি মূর্তিপূজা করার অপরাধে আদ ও সামুদ জাতির মতো করে ধ্বংস করে দেওয়া হতো। কিন্তু কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে আমরা কী দেখতে পাই?

সুতরাং ব্যক্তির মৃত্যুটাই হলো, ছোট কেয়ামত। অধম লিখকের মনে হয় এখানে ব্যক্তির মৃত্যু নামক ছোট কেয়ামতটির কথাই বলা হয়েছে। যদি কেউ আমার কথাগুলো মেনে না নেয় তা হলে আমার বলার কিছু নাই।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৫

কোরান-এর ৫৮ নম্বর সুরা মুজাদালার ১৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : ওহে! তোমরা গোপন আলাপের আগে সদকা দিতে ভয় পাও? যখন তোমরা তাহা পারিলে না এবং আল্লাহ তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিলেন। সুতরাং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে মানো এবং রসুলকে মানো। আল্লাহ জানেন তোমরা যা করো। (*ওয়া আশফাক্তুম আনতুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাই নাজওয়াকুম সাদাকাতিন; ফাইয্লাম তাফাআলু ওয়াতা বাল্লাহু আলাইকুম ফাআকিমুস সালাতা ওয়া আতুয্ যাকাতা ওয়া আতীউল্লাহা ওয়া রাসুলাহু; ওয়াল্লাহু খাবীরুম বিমা তামালুন*)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে এর আগের আয়াতটি সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়। বলতে হয় যে, রসুলের সাহাবাদের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে যারা আমানু তথা ইমানদার তাদেরকে চুপিচুপি তথা গোপনে কথা বলতে চাইলে আগে রসুলকে সদকা দিয়ে কথা বলার কথাটি বলা হয়েছে। মহানবির সাহাবারা নিঃসন্দেহে মোমিন। আমানু আর মোমিনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। যদিও আমানুরাও ইমানদার এবং মোমিনরাও ইমানদার। আমানু এবং মোমিনের পার্থক্যটি তখনই দেখতে পাই যে আল্লাহ আমানুদের সঙ্গে থাকেন না, বরং মোমিনদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বা থাকেন কথাটি *কোরান*-এ ঘোষণা

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

করা হয়েছে। *কোরান*-এর ৮ নম্বর সুরা আনফালের ১৯ নম্বর আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে, '*ওয়া আন্নাল্লাহা মাআল মুমিনীন*' অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মোমিনদের সঙ্গে আছেন বা থাকেন।'

আবার একই সুরার ৪৫ নম্বর আয়াতের শেষেও বলা হয়েছে যে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন বা থাকেন।' অনাগত কালে যারা দীনের উপরে ইমান আনবে তাদেরকেই লক্ষ করে বলা হয়েছে যে, রসুলের সাথে চুপিচুপি কথা বলতে চাইলে আগে সদকা দেবে তারপরে কথা বলবে। এটা বা এই বিষয়টি কল্যাণ ও পবিত্রতা বয়ে আনবার সহায়ক।

মুখের মিষ্টি কথা, বিনয়, ভদ্রতা এবং নম্রতার যেমন প্রয়োজন হয় তার চেয়ে কিছুটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে সদকা দেবার উপদেশটি এখানে দেওয়া হয়েছে। নিজের পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ হতে কিছুটা সদকা দেওয়া মোটেই কম কথা নয়। অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধনসম্পদ হতে কিছু দান করাটা যত সহজ, তত সহজ মোটেই নয় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্টে অর্জন করা ধন-সম্পদ হতে সদকারূপে কিছু দেওয়া। ধনসম্পদটি একই বিষয়, কিন্তু ধন-সম্পদ অর্জন করার প্রশ্নে অবৈধ আর বৈধ দু'টো বিষয়ে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

রসুলকে এই পরিশ্রমে অর্জিত ধনসম্পদ হতে কিছু সদকা তথা হাদিয়া প্রদান করতে *কোরান* বলছে এবং সেই সঙ্গে এই কথাটিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদি একান্তই সদকা তথা হাদিয়াটি দিতে না পারো, যদি অক্ষম হও, তা হলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। রসুলকে এই সদকা প্রদানের বিষয়টিতে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে যদি অক্ষম হয় তো ক্ষমা করে দেবার কথাটি বলা হয়েছে। তার মানেই হলো, রসুলকে সদকা তথা হাদিয়া না দেওয়াটা ঠিক নয়, তাই ক্ষমার কথাটি এসেছে। তা না হলে, সদকা দিতে না পারলে ক্ষমা করে দেবার কথাটি কেন এসেছে?

আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে আবার উপদেশ দিলেন এই বলে যে, তোমরা সালাত কায়েম করো তথা যোগাযোগটি তথা সংযোগটি সংরক্ষণ করো তথা হেফাজত করো। তারপর বলা হলো, জাকাত আদায় করো এবং এখানেই শেষ নয়, বরং আরও বলা হলো, আল্লাহ্‌র এত্তেবা করো তথা আল্লাহকে মানো এবং আল্লাহ্‌র রসুলের এত্তেবা করো তথা রসুলকে মানো।

এখন আমরা একটু গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নবি এবং রসুলের বিষয়টি আলোচনা করতে চাই। রসুল একটি চলমান প্রক্রিয়া, কিন্তু নবি কখনই চলমান প্রক্রিয়া হওয়া তো দূরে থাক, বরং মহানবির মধ্যেই নবুয়ত খতম তথা শেষ। সুতরাং মহানবি শেষ নবি তথা খাতামান নবি। রসুল বিষয়টি বলতে গিয়ে কেন ইহাকে একটি চলমান প্রক্রিয়া বলা হলো? তার প্রধান কারণ হলো, আল্লাহ্‌র রসুল মানুষ এবং ফেরেশতা উভয়টি হতে নির্বাচন করা হয় তথা নেওয়া হয় তথা মনোনীত করা হয়, কিন্তু নবির প্রশ্নে *কোরান*-এর একটি আয়াতেও কোনো ফেরেশতাকেই নবি বলা হয় নি। কেউ কি দেখাতে পারবেন যে একজন ফেরেশতাকে নবি বানানো হয়েছে? পারবেন না। কারণ এই রকম কথা থাকলে তো পারবেন। যাহা নাই উহা পারার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং বিশ্ববিখ্যাত একেকজন আল্লাহ্‌র ওলি এবং যে কোনো আল্লাহ্‌র ওলি ফেরেশতাদের চেয়ে অনেক অনেক মর্যাদাবান। ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র ওলিদের

খেদমত করেন, সাহায্য করেন এবং আরও অনেক রকম কাজ ওলিদের সঙ্গে থেকে সমাধান করেন। ফেরেশতাও রসুল আবার মানুষও রসুল। নফ্‌স ও রুহ যার নাই সেই ফেরেশতাও রসুল আবার নফ্‌স ও রুহ আছে সেই মানুষও রসুল। মানুষকেই আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে। ফেরেশতাদের এই রকম কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এই চুপিচুপি সদকা দেবার নিয়মটি তথা প্রথাটি কোনো অবস্থাতেই উচ্ছেদ করা যায় না। ইহাকে কখনই নাসেক-মনসুকের ফাঁদ পেতে ধরা যায় না। যদি *কোরান*-এর এই আয়াতে রসুল না বলে নবি বলা হতো তা হলে খোদার কসম, আমি অধম লিখকই এই আয়াতটিকে নাসেক-মনসুকের ফাঁদে ফেলে দিতাম।

আমরা আল্লাহ্‌র ওলিদেরকে– তা সেই ওলি বড়ই হোন আর ছোটই হোন, বড় মোমবাতিই হোক আর ছোট মোমবাতিই হোক, আলোর প্রশ্নে তার কমবেশি থাক, কিন্তু কখনও রসুল বলবো না, রসুল বলতে যাবো না। যদিও হাকিকতে বলা যায় কি না উহা পাঠকদের কাছেই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম। এ জন্যই আমরা ভক্তদের দেখতে পাই আল্লাহ্‌র ওলিদেরকে সদকা তথা হাদিয়াটি দিতে। যদিও ***বাংলাভাষায় এই সদকা ও হাদিয়াকে গুরুদক্ষিণা বলা হয়।*** বাংলাভাষায় গুরুদক্ষিণা অনুবাদ করলেই কিছু লোক হিন্দুধর্মের গন্ধ পায়। হিন্দুদের বিবাহে যেমন উলুধ্বনি দেওয়া হয়, খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমার বিবাহেও উলুধ্বনি দেওয়া হয়েছিল এবং এই একবিংশ শতাব্দীতেও আরব দেশগুলোর বিবাহ অনুষ্ঠানে ওই একই উলুধ্বনি দিতে দেখা যায়। এটা একটা নিজস্ব সংস্কৃতি।

ব্রিটিশ আমলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের মুসলমান বাপ-দাদারা সবাই ধুতি পরিধান করতো এবং খুবই কম লোকে, যারা নবাব পরিবারের, তাদেরকে খ্রিস্টানদের পোশাক ফুলপ্যান্ট পরতে দেখতাম। ছোটকালে দেখেছি বাপ-দাদারা ফুলপ্যান্ট পরিধানকারী ব্যক্তিটির দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকতো এবং একে অপরকে চুপিচুপি বলতো যে এরা খ্রিস্টান হয়ে গেছে। সেইদিনে ফুলপ্যান্ট পরাটাকে খ্রিস্টানদের অনুসরণ করা হচ্ছে বলে মনে করা হতো। আর আজ চেয়ে দেখুন তো! ফুলপ্যান্ট পরে মসজিদে নামাজ আদায় করাটা এখন একটি সাধারণ ব্যাপার। এখন যদি কেউ শখেও ধুতি পরিধান করে তো উল্টা প্রশ্ন করা হবে যে হিন্দুদের পোশাক কেন পরা হলো? এখন ধুতি পরাটার মানে হলো হিন্দুদের পোশাক পরিধান করা। বিবর্তনবাদের ধাপগুলো আমাদেরকে অবাক করে বৈকি!

সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই মুসলমানরা 'খোদা হাফেজ' কথাটি বলতো। আর এখন 'খোদা হাফেজ' বিদায় নিয়ে 'আল্লাহ হাফেজ' এসে গেছে। এ যেন রুচির ডিজাইন বদলানো। তবে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে যে 'আল্লাহ হাফেজ' বলার মাঝে অনেক সওয়াব হাসিল করা যায়। খোদা শব্দটি ফারসি ভাষার, সুতরাং ফারসি ভাষায় 'খোদা হাফেজ' বলার মাঝে সওয়াব থাকলেও উহা খুবই কম। দুঃখ হয় : আল্লামা ইকবাল, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি, হাফিজ সিরাজী, সানায়ি ইত্যাদি ইসলামের মহামনীষীরা আল্লাহ হাফেজের এত বড় মর্তবাটি জানতেন না!

***কোরান*-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৬**

কোরান-এর ৭০ নম্বর সুরা মারেজ-এর ১৭-২৩ এবং ৩৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : ডাকিবে (জাহান্নাম) যাহারা পিঠ দেখাইল এবং যাহারা মুখ ফিরাইয়া লইল। এবং যাহারা জমা করে (সম্পদ) এবং লুকাইয়া রাখে। নিশ্চয়ই ইনসান (মানুষ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে চঞ্চল মন দিয়া (হালুআ : দুর্বল মন, অস্থির, চঞ্চল মন)। যখন স্পর্শ করে মঙ্গল সে হয় কৃপণ (মানুআ)। কেবলমাত্র মুসল্লি ছাড়া। যাহারা সালাতের উপর দায়েম (সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায়, সর্বহালতে)। এবং যাহারা নিজেদের সালাতের উপর হেফাজতকারী। (*তাদউ মান আদ্‌বারা ওয়া তাওয়াল্লা। ওয়া জামাআ ফাআওআ। ইন্‌নাল ইনসানা খুলিকা হালুআ। ইজা মাস্‌সাহুশ শার্‌রু জাযুআ। ওয়া ইজা মাস্‌সাহুল খাইরু মানুআন্। ইল্‌লাল মুসাল্‌লিনাল লাজিনা হুম আলা সালাতিহিম দায়িমুন। ওয়াল্ লাজিনা হুম আলা সালাতিহিম ইউহাফিজুন*)।

ব্যাখ্যা

কোরান-এর প্রতিটি সুরাই অপূর্বেরও অপূর্ব, কিন্তু এই মারেজ সুরাটি বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর ছোট ছোট আয়াত দিয়ে এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এই একটিমাত্র *কোরান*-এর সুরা মারেজটি পৃথিবীর ৫৭টি মুসলিম দেশকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তোমরা কোন পতনের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছো। (মাজ্জুব, আবদাল, মাস্তান এবং আল্লাহ্‌র ওলিরা এই আহ্বানটির বাইরে, কারণ এঁদের ধ্যানসাধনা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা সমাজকেন্দ্রিক বলা যায়)। এই ৫৭টি মুসলিম দেশের মধ্যে মাত্র একটি মুসলিম দেশ ছাড়া বাকি ৫৬টি মুসলিম দেশ এতই নিম্নমানে অবস্থান করছে এবং *কোরানুল করিম*-এর কোনো আদেশ-উপদেশই যে মেনে চলছে না, তারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

বৈষয়িক উন্নয়নের প্রশ্নে (অধ্যাত্মবাদ বাদ দিলাম) একমাত্র মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া কিছুটা উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে। নেতৃত্ব যেখানে দুর্বল, রুগ্ন এবং লোভী সেখানে একটি দেশের বৈষয়িক উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়াটা বেশ কঠিন একটি ব্যাপার। মাত্র একটি নেতাও যে একটি দেশের চেহারা পাল্টিয়ে দিতে পারে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহাথির মোহাম্মদ।

আমাদের বাংলাদেশও একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। সব নেতাদের পাইকারিভাবে বলছি না, বরং বেশ কিছু নেতা আছে যারা দুর্নীতির ময়লা পুকুরে হরদম ডুবেই থাকে। তাই একটি নূতন প্রবাদ বেরিয়েছে যে জানোয়ারকে জঙ্গলে মানায়, বাচ্চাকে মায়ের কোলে মানায়, আর বাংলাদেশের রাজনীতির কিছু নেতাদের জেলখানায় মানায়। বাংলাদেশের এক প্রধানমন্ত্রীর বড় পুত্রধন কর্মীসম্মেলনে বলেছিল: যদি আমরা আবার ক্ষমতায় আসি তা হলে দুর্নীতির সবগুলো শেকড় উপড়ে ফেলবো। শ্রোতারা এই কথাগুলো শুনে আনন্দে হাততালি দিয়েছিল। কিন্তু যখন জনতা দেখতে পেল যে সেই নেত্রীর পুত্র আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে আছে এবং এই যে দুর্নীতিতে ডুবে আছে এই প্রমাণটি কাগজ-কলমে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না, বরং সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। সেই পুত্রধন কত উচ্চস্তরের

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

সেয়ানা যে দলিল প্রমাণে একটিও প্রমাণ রেখে যায় নি। এটা প্রায় সবারই জানা যে *কোরান* বলছে, যে জাতি তার নিজের ভাগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে পরিবর্তন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সেই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না (হুবহু উদ্ধৃত নয়)।

যদিও ফকিরের জন্য রাজনীতি হারাম (?) তবু খুব দুঃখ নিয়ে এই কথাগুলো একদম সাদামাঠা ভাষায় বলে গেলাম। বাংলাদেশ কি একজন মহাথির মোহাম্মদের মতো নেতার আশা করতে পারে না?

এবার মূল বিষয়টিতে ফিরে আসছি। *কোরানুল মাজিদ* কী সুন্দর ভাষায় বলছে : ওই ব্যক্তিদেরকেই জাহান্নাম ডাকবে, যারা সত্যকে সত্য জেনেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যারা সত্যকে জেনেও সত্যের জন্য সামান্য সাড়া-শব্দটিও করে নি। সেই সত্যটির প্রথমাংশেই *কোরান* জানিয়ে দিলো : যারা দুনিয়ার ধনসম্পদ জমা করে রাখে এবং সুন্দর হিশাব-নিকাশের মাধ্যমে গুণে-বেছে রাখে। ***সম্পদ জমা করাটাকেই কোরান মানা করছে।*** কতটুকু সম্পদ রাখা যাবে? অধম লিখকের রচিত ***'মারেফতের গোপন কথা'*** বইটি পড়লেই পরিষ্কার একটি ধারণা জন্মাবে।

সম্পদের পাহাড় জমিয়ে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছে আর অপরপক্ষে বেশিরভাগ মানুষ অভাব-অনটনে দারিদ্রের শেষ প্রান্তে এসে অসহায়ের মতো দিনযাপন করছে। ইতিহাসের জনক যেমন হেরোডোটাস, তেমনি সমাজকল্যাণ নামক তথাকথিত বিজ্ঞানের জনক হলেন ম্যাকনামারা। অতিশয় চক্ষুলজ্জায় এবং দাতা সাজার যাত্রাদলের সম্রাটের পোশাক পরে ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে ছিটাফোটা দান করার বিষয়টি দানবীরের ভারিক্কি চালে দেখিয়ে চলছে। আফসোস এই জাতির জন্য, পোড়া কপাইলা এই নিঃস্ব, রিক্ত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, অসহায় মানুষগুলোর ম্লান মুখগুলো দেখে দেখে। বিবেকের আবরণটি কি এতই কঠিন, এতই শক্ত যে ওয়েল্ডিং মেশিন ছাড়া এদের দিলের জানালা ফাঁক করা মুশকিল! সরল জনতাকে যে এই ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রয়াসে কত রকম চিকন ধোঁকাবাজির খেলা খেলছে, কত রকম প্যাঁচঘোচের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে আশার স্বপ্ন দিয়ে বিভোর করে রাখে। 'গরিবি হঠিয়ে দেব'–কী সুন্দর বাক্যটি! কী সুন্দর বচন! অথচ যিনি গরিবি হঠাবার ভাষণটি দিচ্ছেন তিনিই পবর্তপ্রমাণ ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন তথা জমা করে রেখেছেন।

মানুষ কোনো কিছুরই মালিক নয়, এমনকি মানুষ তার নিজের মালিক নিজেই নয়– এটা প্রতিটি মানুষ পরিষ্কার বোঝে, তবু এই সম্পদ জমাকারীরা 'কোরান-এ ব্যক্তিমালিকানা আছে'– প্রমাণ করার হরেক রকম দলিল দিয়ে যায়। ব্যক্তির অধীনে সম্পদ থাকাটিকে *কোরান* মালিকানা বোঝায় নি, বরং আমানতদারি বুঝিয়েছে। তারই জ্বলন্ত প্রমাণ মহানবির জলিল কদরের সাহাবা ফারুকে আজম হজরত ওমর ফারুক (রা.)-এর জীবনটি দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। আমি ভালো করেই জানি যে আমার এই কথাগুলো, আমার এই বিলাপের কান্নাগুলো, আমার এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো কোনো কাজেই আসবে না। তবু সাক্ষীগোপাল করে রেখে দিলাম।

এই সম্পদ জমাকারীরাই ধর্মের লেবাস পরিধান করে খাসির মাথা সামনে রেখে ভেড়ার মাংস বিক্রি করে। এরা নিঃস্ব-রিক্ত মানুষের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়। এরা ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তো ভালো, বরং ধর্ম নিয়ে ডাকাতি করে।

ধনসম্পদ আর ক্ষমতার লোভ যে কত ভয়ঙ্কর তা মাদকদ্রব্য সেবনকারীরা বুঝতেও পারে না। *কোরান* কী সুন্দর করে বলছে : মুসল্লি হতে চাও? তবে শোনো, মুসল্লি হবার ছোট ছোট নীতিগুলো জানিয়ে দিলাম। প্রথমেই জানিয়ে দিলাম, ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে যারা রাখে তাদেরকে জাহান্নাম বার বার ডাকছে : আয়, আমার কোলে আয়! জাহান্নাম ডাকছে, তবু এরা জাহান্নামকে ভয় করে না। এরা ভালো করেই জানে যে খুব বেশি হলে শতবছর বেঁচে থাকবে। তারপর? তারপর মৃত্যুঘটনা দিয়ে জাহান্নামের কোলে বসানো হবে। তাই *কোরান* বলছে : মুসল্লি তারাই যারা ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষণ করে না।

এরাও *কোরান* পড়ে, এরাও মুসল্লির সংজ্ঞাটি ভালো করেই জানে। তাই এরা মুসল্লি সেজে এয়ারকন্ডিশন্ড মেজাজি মসজিদে মেজাজি নামাজ আদায় করে। মিনিট দশেক এদের সঙ্গে চললেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই মুসল্লি যারা সেজেছে তাদের ভেতরটা অহঙ্কারের আগ্নেয়গিরির লাল আভা উদগীরণ করছে। এদের অহঙ্কার, এদের গর্ব, এদের ঠাটবাট, এদের টাইস অ্যান্ড টুইস (চলন-বলন : ঢাকাইয়ারা চলন-বলনকে টাইস অ্যান্ড টুইস বলে) এতই ভয়ঙ্কর যে আর কাছে থাকতে মন চায় না। সুতরাং নকল মুসল্লির ছড়াছড়িতে আসল মুসল্লিগুলোকে ধরতে কষ্ট হয়। এই নকল মুসল্লিদের মনমেজাজ এতই অস্থির থাকে যে এই অস্থিরতাকে ফিতা দিয়েও মাপা যায় না, একটু বিপদের ছোঁয়া লাগলেই এরা ছিলবিলিয়ে ওঠে (হা-হুতাস করে)। আবার বৈষয়িক মুনাফার ব্যাপারটি যখন ধরা দেয়, তখন কী যে আনন্দের হাসি হাসে! আনন্দে মুখের ৩২টি দাঁত দেখিয়ে হাসতে থাকে।

মুসল্লির আবরণে এদের কৃপণতা ধরাই পড়ে না। এরা কঞ্জুসের দাদা, কিন্তু দাতার অভিনয়ে অমিতাভ বচ্চনকেও হারিয়ে ছাড়বে। এদের টাইস অ্যান্ড টুইস বা রঙ-ঢঙ দেখে বোঝাই যাবে না যে এরা নকল মুসল্লি। এই নকল মুসল্লিরাই যুগে যুগে শোষণ, জুলুম আর অত্যাচারের এমন ভয়ঙ্কর স্টিমরোলার চালিয়েছিল যে এরাই খাল কেটে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন আর মাও সে তুঙকে ডেকে এনেছিলো।

মার্কস আর লেনিনকে দোষারোপ করার আগে এই জাতীয় মানুষগুলোর ইতিহাস পড়ে দেখুন। আপনার বিবেক কেঁদে উঠবে। আপনার মনপ্রাণ থরথর করে কেঁপে উঠবে। এবং আমার কথাগুলো যে কতটুকু সত্যতা বহন করে তা কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন।

হায় রে খান্নাসরূপী শয়তান! ওই নকল মুসল্লিদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিয়েছিলি! বিবেকের দরজার কপাট ভারী স্টিল দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিস! সাবাস খান্নাসরূপী শয়তান, সাবাস! এই নকল

মুসল্লিদেরকে চোখ মুখ আর পেট কোনোদিন 'ভরে না'-র শয়তানি দর্শনটি অদৃশ্য নফ্‌সের কাছেই থেকে থেকে কুমন্ত্রণা দিয়ে চলেছিস যুগে যুগে এবং আজও এবং আগামি কালও।

আবার একটু লক্ষ করুন, একটু চোখ কান খুলেই লক্ষ করে দেখুন, যারা নামাজ পড়ছেন তথা যারা সালাত আদায় করছেন তারা এই সমস্ত কুৎসিত বিষয়ের ধারে কাছেও থাকেন না। ইহা অধম লিখকের কথা নয়, বরং সুরা মারেজের ২২ নম্বর আয়াতেই বলা হয়েছে।

এখন একটু অনুরোধ করতে চাইছি। *কোরান*-এ বর্ণিত এই রকম নামাজ পড়ুয়া মুসল্লি খুঁজে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে দেখুন। আশা করি *কোরান*-এ বর্ণিত এই রকম মুসল্লি আপনি হাতে গুণতে পারবেন। যারা মুসল্লি নামধারণ করেও মুসল্লি নয়, সেই জাতির ভাগ্যটির শোচনীয় অবস্থা দেখুন। দেখুন ৫৬টি মুসলিম দেশের গাল ইহুদি, খ্রিস্টানরা কী সুন্দর করে চেটে চলছে। যারা গাল চাটছে তারা ভালো করেই জানে যে আমরা কোন পতনের শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি।

এইসব নকল মুসল্লিরা ভালো করেই জানে যে, সুরা মারেজের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, তোমাদের ধনসম্পদের ভাগ বঞ্চিতদের এবং যাদের চাইবার উপযুক্ততা আছে তাদেরকেও দিতে হবে।

দশচক্রেই যখন এ রকম তো যিনি প্রতিবাদ করছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তাকেও ভূত সাজতে বাধ্য করা হচ্ছে। খান্নাসরূপী শয়তানটি, যাহা আপন নফ্‌সের ভেতরে তথা জীবাত্মার ভেতর লুকিয়ে আছে, তার কুমন্ত্রণা আর ওয়াসওয়াসা কত বড় ভয়ঙ্কর!

এইসব নকল মুসল্লিরা মেজাজি হজটি পালন করতে গিয়ে মেজাজি তিনটি শয়তানকে মেজাজি কঙ্কর ছুঁড়ে মারতে ওস্তাদ, কিন্তু হাকিকি খান্নাসরূপী শয়তানটিকে যে প্রতিটি নফ্‌সের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইহা মালুম করতে পারে না। তাই হাকিকি কাবার হাকিকি তওয়াফ করে হাকিকি হাজি হবার তো প্রশ্নই উঠে না। তাই একই সুরার ৩৪ নম্বর আয়াতে এক ধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে : আমানত এবং প্রতিশ্রুতিটিও যারা রক্ষা করে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের সালাত তথা নামাজের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখে তথা যত্নবান হয় তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানে নিজেদের নামাজের উপর যত্নবান হওয়ার কথাটি বলতে কী বুঝায়? যারা অগ্র-পশ্চাৎ সব কিছু ভেবে এবং চিন্তা করে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে তারাই তাদের সালাতের তথা নামাজের জন্য যত্নবান, কথাটি *কোরান*-এ বলা হয়েছে।

এই সকল নকল মুসল্লিদের নামাজ যেমন নামাজ নয়, বরং লোক দেখানো নামাজ এবং ***এই লোক দেখানো নামাজিদেরকে ওয়াইল নামক জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে–*** এই কথাটিও *কোরান*-এর

কথা। যষ্টিমধু নামেই মধু, কিন্তু আসল মধু নয়, ঠিক তেমনই এদের নামাজ নামে যষ্টিমধু, মৌমাছির চাকভাঙা আসল মধু নয়।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৭

কোরান-এর ৭৩ নম্বর সুরা মোজাম্মেলের ২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে সুন্দর ঋণ (কারদান হাসানা) দাও। এবং নিজেদের নফ্সের (জীবাত্মার) জন্য যাহা পাঠাইবে ভালো হইতে তাহা পাইবে আল্লাহ্র নিকটে উহা খুব ভালো (খাইরান) এবং আজমতওয়ালা পুরস্কার এবং আল্লাহ্র দিকে মাফ চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ রহিম-রূপে (রহমান-রূপে নয়) দয়ালু। [হুবহু রাখতে গিয়ে বাক্যের সৌন্দর্য কিছুটা হোঁচট খায়]। (*ওয়া আকিমুস সালাতা ওয়া আতুজ্জাকাতা ওয়া আকরিদুল্লাহা কারদান হাসানা; ওয়ামা তুকাদ্দিমু লি আনফুসিকুম মিন খাইরিন তাজিদুহু ইনদাল্লাহি হুওয়া খাইরাঁও ওয়া আজামা আজরান; ওয়াসতাগফিরুল্লাহা; ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহিম*)।

ব্যাখ্যা

সুরা মোজাম্মেলের এই ২০ নম্বর আয়াতটি *কোরান*-এর বড় আয়াত কয়েকটির মধ্যে একটি। আমরা ইহার কিছু অংশ বাদ দিয়ে সেই বিষয়টুকুই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি যে বিষয়টি সালাতের সঙ্গে তথা নামাজের সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে সালাত ও জাকাত আদায় করার উপদেশটি দিয়ে একটি 'এবং' শব্দ দিয়ে আল্লাহ বলছেন : আমাকে (আল্লাহ) কর্জে হাসানা দাও, তথা সুন্দর ঋণ দাও (কারদান হাসানা)।

প্রশ্ন আসতে পারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি এতই অভাবী (?) যে আপন বান্দার কাছে কর্জ চাইবেন তথা ঋণ চাইবেন? এই সুন্দর ঋণটি যাহা আল্লাহ সালাত-ও জাকাতকারীর কাছে চাইছেন, সেই সুন্দর ঋণটি বলতে কী বুঝানো হয়েছে? প্রতিটি নফ্স তথা জীবাত্মা তথা প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষার মূল বিষয়টি তথা একমাত্র বিষয়টি হলো, প্রতিটি নফ্সের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আপন নফ্স হতে বাহির করে দিতে হলে আল্লাহ্র সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টায় তথা যোগাযোগের জন্য তথা সালাত কায়েমের জন্য অবিরামভাবে ধ্যানসাধনাটি করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। যে ধ্যানসাধনাটি মহানবি নিজেই আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত নির্জন অন্ধকার হেরাগুহায় ১৫টি বছর করে মানবজাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে, ধ্যানসাধনার মাধ্যম ছাড়া খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বাহির করে দেওয়া বড়ই কঠিন।

সাধক যখন ধ্যানসাধনা করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে তখন সাধকের মনটি উদাস হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ সাধকদের জন্য বিরাট একটি সুসংবাদ দিচ্ছেন এই বলে যে, তুমি আমাকে কর্জে হাসানা দাও তথা উত্তম ঋণটি দান করো। এই উত্তম ঋণটির হাকিকি অর্থটি হলো আপন নফ্সের মধ্যে খান্নাসরূপে

বাস করা শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া। *কোরান*-এর বর্ণিত এই কর্জে হাসানা-র মেজাজি অর্থটি যে যেভাবে ইচ্ছা করুক, তাতে অধম লিখকের কোনো আপত্তি রইল না। কারণ যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে একাগ্রমনে গবেষণা করতে গেলে ভুলত্রুটির উপর দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। প্রতি পদে পদে গবেষকদের গবেষণার পথে ভুলত্রুটিগুলোর সাক্ষাৎ পাওয়া আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। সুতরাং এই গবেষণার পথটিকে যে জাতি বন্ধ করে দিতে চায় সেই জাতিকে জাগতিক সভ্য জাতিদের হাসপাতালে স্যালাইন নিতে হয়। আমরা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে এই করুণ দৃশ্যগুলো অহরহ দেখতে পাই।

সভ্য জাতি নব নব জিনিস আবিষ্কার করে চলছে আর গবেষণা বর্জিত জাতি সেইসব আবিষ্কারের ফসল কিনে এনে ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য এই কথাগুলো মেজাজি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে খাটে, কিন্তু হাকিকি বিষয়ের উপর বিন্দুমাত্র খাটে না। কারণ ***সাধকদের কোনো জাত নাই, কোনো সংকীর্ণতা নাই, কোনো গন্ডির বলয়ে সে আবদ্ধ থাকে না।***

এই কর্জে হাসানাটি সালাত তথা যোগাযোগ এবং জাকাত তথা নিজের নফ্সের সাথে যুক্ত খান্নাসটিকে কোরবানি করে দেওয়ার জাকাত যাতে আদায় করতে পারে তারই জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ ঋণ চাইছেন। যেহেতু আল্লাহ ঋণ চাইছেন সেইহেতু এই ঋণটি নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর ঋণ, একটি উত্তম ঋণ। সাধকের মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ এই ঋণটি চাইছেন, নিজের প্রয়োজনের জন্য নয়, কারণ আল্লাহ অভাবমুক্ত।

অভাবমুক্ত হয়েও সাধকের কাছে যে ঋণটি চাইছেন সেই ঋণটি আর কিছুই নয়, বরং নফ্সের সঙ্গে পরীক্ষা করার জন্য যুক্ত-করে-দেওয়া খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া। এই খান্নাসের অনেক রকম নাম আছে। যেমন, হাস্তি, খুদি, অহম, ইগো, ইগোসেন্ট্রিসিটি, আমিত্ব, 'আমি-আমি' বলা ইত্যাদি। তাই আমরা দেখতে পাই, বিশ্বের বিখ্যাত আল্লাহ্র ওলি হজরত বাবা মনসুর হাল্লাজও *আনাল হক* তথা 'আমিই সত্য' বলে ঘোষণা করছেন, আবার একই মানুষ (দেহের বিচারে বলা হচ্ছে) ফেরাউন-ও 'আমিই সত্য' বলে ঘোষণা করছে। একজন খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিয়ে, আমিত্বটিকে বিনাশ করে, হাস্তিটিকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দিয়ে, আল্লাহতে ফানা হয়ে তথা আপন নফ্সের অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম রুহের অবস্থানটিকে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত করে তুলতে পেরেছেন।

বটবৃক্ষের বীজটি খুবই ছোট, কিন্তু ওই বীজ ধাপে ধাপে যখন পরিপূর্ণ বটবৃক্ষে পরিণত হয় তখন বিশ্বাসই হতে চায় না যে, এই বিশাল বটবৃক্ষটি সমস্ত গুণাগুণ ও শক্তি নিয়ে এত ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে অবস্থান করেছে। রুহ নামক বীজটি, যাহা নফ্সের কাছেই আছে (একমাত্র মানুষ ও জিনের নফ্স; অন্য কোনো জীবের নফ্সের সঙ্গে আল্লাহ জাতরূপে থাকেন না)। উহাকে সাধক যখন ধাপে ধাপে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তথা সালাত ও জাকাতের সাহায্যে পরিপূর্ণ বটবৃক্ষের মতো পূর্ণ বিকশিত করে তোলেন তখন নফ্সটি রুহের কাছে হারিয়ে যায়। এই হারিয়ে যাওয়াটিকেই ফানাফিল্লাহ বলা হয়। ইহা কাগজ কলমে পাওয়া যায় না, ইহা মোটা মোটা বইতে পাওয়া যায় না, ইহা কথার বস্তাতে পাওয়া যায় না, ইহা তর্ক-বির্তক ও বাহাসে পাওয়া যায় না, ইহা মাথার জ্ঞান দিয়ে পাওয়া যায় না–বরং

বিরাট ধৈর্যধারণ করে একাগ্রতার সহিত অবিরাম ধ্যানসাধনার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। তাই ইহাকে সিনার এলেম বলা হয় তথা বক্ষের জ্ঞান বলা হয়। সুতরাং মাথার এলেম এক বিষয় আর সিনার এলেম হাসিল করা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। সিনার এলেম হাসিল করতে গেলে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি এবং মাদ্রাসা পাস করে হাসিল করা যায় না। কারণ কোনো নবি-রসুলই মাদ্রাসা পাস করে নবি-রসুল হন নি।

মাথার এলেমওয়ালাদের পেটে বোমা মারলেও সিনার এলেমের একটি বাক্যও বুঝা কষ্টকর হয়ে যায়, অথবা বুঝতে পারলেও ধ্যানসাধনার কষ্টসাধ্য জীবনটিকে জাকাতরূপে আল্লাহকে দান করার প্রশ্নটিই ওঠে না। সুতরাং কর্জে হাসানার কথাটিতে একমাত্র সালাতি ও জাকাতিদের লক্ষ করে আল্লাহ উত্তম ঋণটি চাইছেন। মাথার এলেম হাসিলকারীরা কাগজে কলম ঘষে ঘষে মেজাজি এলেম হাসিল করেন। কিন্তু সাধকেরা সিনার এলেম হাসিল করার জন্য অবিরাম সালাত ও জাকাতের কলম নামক সংযোগের মাধ্যমে আপন নফ্সটির ভেতর খান্নাসের অবস্থানটিকে তাড়িয়ে দেয়। সুতরাং দুইটি এলেমের পথ ও মত, ধারা ও কৌশল এক নয়, বরং সম্পূর্ণ আলাদা তথা ভিন্ন। সিনার এলেম হাসিলকারীদের কথাগুলো শুনে মাথার এলেম হাসিলকারীরা উপেক্ষা করে, এড়িয়ে যায়, অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তাই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ্‌র অনেক ওলিদেরকে মাথার এলেম হাসিল করা ব্যক্তিরা পাগল বলে থাকেন। আবার পরক্ষণে আল্লাহ্‌র ওলিরাও মাথার এলেম হাসিলকারীদের পাগল বলে থাকেন। অনেক আল্লাহ্‌র ওলিরা এ রকম কথাটিও বলে থাকেন যে, যারা এখনও পাগল হয় নি তারাই আসল পাগল তথা *'উস্ত দেওয়ানা, দেওয়ানা নাশুদ।'*

কথার ছড়াছড়ি, বিদ্যার দাপট, ভাষা শিক্ষার অহঙ্কার যে-ই করুক না কেন, করতে দিন। কারণ সে যদি আসল রহস্যটির সামান্য গন্ধটিও পেত তা হলে আর এ রকমটি করতো না। সুতরাং কাকে দোষ দেব? সবাই তো আপন আপন তকদিরের খেলাটি খেলে চলছে। যে বলে : এই রকম তকদিরটিকে লাথি মেরে ফেলে দেই– এই লাথি মেরে ফেলে দেওয়াটাও সেই মানুষটির তকদির। গভীর জলে বিচরণকারী ইলিশ মাছের ঝাঁকের সঙ্গে পুঁটিমাছের ঝাঁকের চলাচল করবার, বিচরণ করবার, অবস্থান করবার বিধানটি আল্লাহ্‌র কেতাবে আল্লাহই রাখেন নি। সুতরাং কাকে দোষ দিতে যাব? গভীর জলের ইলিশ মাছের সুস্বাদু কয়েকটি ভাজা টুকরা বেশি খেলেই পেট খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আবার ষাট ফুট উঁচুতে অবস্থান করা নারিকেল গাছের ডাবটি রোদ-বৃষ্টি-জলের দাপটে অবস্থান করেও সেই ডাবের জল খেলে খারাপ পেট ভালো হয়ে যায়। তাই *কোরান*-এ আল্লাহ এই কর্জে হাসানাটিকে আজমতওয়ালা পুরস্কার বলে ঘোষণা করছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকে (কখনই 'মধ্যে' হতে পারে না) ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। এই ক্ষমাটি তখনই করা হয় যখন সাধক খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে। ইহা মোটেই সাধারণ মানুষের সাধারণ ক্ষমা নয়। ইহা মোটেই সাধারণ মানুষের কাছে কর্জে হাসানা চাওয়া নয়, বরং সালাত ও জাকাত আদায়কারীর কাছে চাওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই চাওয়াটি বিশেষ চাওয়া এবং দেওয়াটিও বিশেষ দেওয়া। এই বিশেষ দেওয়াটি ক্ষমার আগে দেওয়া হয় না, বরং ক্ষমার আরবি শব্দটিই হলো গফুর। আর যেখানে আল্লাহ বিশেষ

দানটি করছেন সেখানে তিনি রহিম (কখনই রহমান নন, কারণ রহমানরূপী দান সাধারণ দান)। সুতরাং আমার মনে হয় *কোরান*-এর একটি স্থানেও গফুরুর রহমান পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় গফুরুর রহিম। তথা ক্ষমার পরেই আল্লাহ রহিমরূপটি ধারণ করেন।

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৮

কোরান-এর ৭৪ নম্বর সুরা মোদাস্‌সেরের ৪২–৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : কীসে তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন (সাকার)-এর মধ্যে ফেলিল? বলিবে, 'আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।' (*মা সালাকাকুম ফী সাকার। কালুলাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন*)।

ব্যাখ্যা

প্রথমেই বলতে হয় জাহান্নামের আগুন তথা সাকার বলতে কী বুঝায়। এবং এই জাহান্নামের আগুনে কারা জ্বলছে তাদের কথাটিও বলা হয়েছে। তারাই জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে যারা মুসল্লিদের দলভুক্ত হতে পারে নি। *কোরান*-এর বাক্যটি আসলে চলমান ঘটনা তথা প্রেজেন্ট কনটিনিউয়াস টেন্সে অথবা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে বলা হচ্ছে। আমরা বাক্যটিকে সুন্দর করার জন্য অতীত অথবা ভবিষ্যৎ কালটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করি। ইহারও একটি বিশেষ কারণ আছে। সেই বিশেষ কারণটি হলো : জাহান্নামের আগুন ঘরবাড়ি জ্বালায় না। বনে-জঙ্গলে যে আগুনের দাবদাহ উহাও জাহান্নামের আগুন জ্বালায় না। জাহান্নামের আগুন নিজের শরীরে থাকা কাপড়-চোপড়গুলোও জ্বালায় না। এক কথায় জাহান্নামের আগুন শুধুমাত্র একটি জিনিসই জ্বালায় এবং জ্বালাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই জিনিসটি হলো, ***জাহান্নামের আগুন কেবলমাত্র জিন ও মানুষের অন্তরটিকে জ্বালায়।*** এই অন্তরের জ্বালা বনের আগুন লাগার চেয়েও ভয়ঙ্কর। জাহান্নামের এই আগুন কেবলমাত্র অন্তরটিকে জ্বালায় এবং এই জ্বালাবার ভয়াবহতা এতই শক্তিশালী যে একজন ভুক্তভোগী অনেক সময় সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আমরা যে দুনিয়াতে বাস করছি, প্রতিনিয়ত সবাই কমবেশি এই জাহান্নামের আগুনে জ্বলছি। তাই জাহান্নামের আগুনটি চোখে দেখা যায় না, বরং অন্তরে অনুভব করা যায়। তবে যারা মুসল্লি তথা সালাতি তথা নামাজি কেবলমাত্র তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে না এবং জ্বলবে না। এখন একটু নিরপেক্ষ মনে চিন্তা করে দেখুন তো, মুসল্লিদের মর্যাদা এবং সম্মান আল্লাহ্‌র নিকট কতো ঊর্ধ্বের বিষয়! কতো ঊর্ধ্বের বিষয়টি হলে একজন মুসল্লিরও জাহান্নামের আগুনে জ্বলবার প্রশ্নই ওঠে না এবং জ্বলবেও না। *কোরান*-এ বর্ণিত এই জাতীয় মুসল্লিদের সংখ্যাটি কী রকম হতে পারে তা পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

এখানে মুসল্লির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সালাতের সঙ্গে আরেকটি কাজ যোগ করে দেওয়া হয়েছে আর সেই কাজটি হলো : যারা অভাবী, যারা গরিব তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করা।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৭৯

_কোরান_-এর ৮৭ নম্বর সুরা আলার ১৪-১৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : যে নিজেকে পবিত্র করিতে পারিয়াছে অবশ্যই সে কামিয়াব হইয়াছে। এবং যে জিকির করে তাহার রবের দিকে সুতরাং সালাত করে যোগাযোগ করে, সংযোগ করে। (_কাদ আফ্লাহা মান তাজাক্কা ওয়া জাকারাস্মা রাব্বিহী ফাসাল্লা_)।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতে সর্বপ্রথম যে শব্দটির ব্যাখ্যা দেওয়াটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই শব্দটি হলো 'পবিত্র'। পবিত্রতা দুই প্রকার : একটি মেজাজি পবিত্রতা, অপরটি হাকিকি পবিত্রতা, মেজাজি পবিত্রতা হলো ওজু-গোসল করে পবিত্র হতে হয়, আর হাকিকি পবিত্রতা হলো আপন নফ্স তথা জীবাত্মার ভেতরে দুধের সঙ্গে মাখন মিশিয়ে দেওয়ার মতো মিশিয়ে দেওয়া খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বাহির করে দেবার পবিত্রতা। একটি সাধারণ পবিত্রতা এবং অপরটি অসাধারণ পবিত্রতা। _কোরান_-এর অন্যত্র বলা হয়েছে যে পবিত্র না হয়ে কেহই _কোরান_ স্পর্শ করতে পারে না। ইহারও দুই রকম অর্থ আছে! একটি মেজাজি পবিত্রতা এবং অপরটি হাকিকি পবিত্রতা। মেজাজি পবিত্রতা দিয়ে কাগজ-কালি-কলমের দ্বারা লিখিত ছাপার অক্ষরের অথবা হাতের লিখা _কোরানুল করিম_-কে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু পক্ষান্তরে হাকিকি _কোরান_ তথা নুরি _কোরান_-কে স্পর্শ করতে হলে আপন নফ্স তথা জীবাত্মা হতে আপন নফ্সের ভিতরে লুকিয়ে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানটিকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করার পরই নুরি _কোরান_-কে স্পর্শ করতে পারে, অন্যথায় অসম্ভব। আমরা কাগজ-কালি-কলমের লিখিত _কোরান_ এবং নুরি _কোরান_ দুটোকে একত্র করে ফেলি। তাই আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো জগাখিচুড়িতে পরিণত হয় এবং মানুষ সত্য পথের আলো দেখতে গিয়ে প্রতি পদে পদে আছাড় খায়, ধাক্কা খায়, উষ্টা খায় এবং এর ফলে বিভ্রান্তির জটাজালে আবদ্ধ হয়ে নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হয়।

জুন্নুন নুরাইন হজরত ওসমান গনি (রা.) যখন _কোরান_-কে একত্রিত করছিলেন তখন মাওলা আলি (আ.) একটি কথাই বলেছিলেন আর সেই কথাটি হলো : আপনি যে _কোরান_ সংগ্রহ করছেন উহা বোবা _কোরান_ আর আমিই (মাওলা আলি) জীবন্ত _কোরান।_ জুন্নুন নুরাইন হজরত ওসমান গনির সংগ্রহ করা _কোরান_-টির মূল্য অপরিসীম, কারণ দুনিয়ার সাধারণ মানুষেরা এই সংগৃহিত _কোরান_ পড়েই শিক্ষালাভ করবে। আবার মাওলা আলির বর্ণিত _কোরান_-টিও মহাসত্য, কিন্তু এই মহাসত্য _কোরান_-টি সবার পক্ষে আলিঙ্গন করা তো বহু দূরের কথা এমনকি মোকামে জাবরুতের শেষ প্রান্তে গিয়েও নুরি _কোরান_-কে বুঝতে পারা যায় না, বরং যদি কোনো সাধক আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতের দ্বারা লাহুত মোকামে প্রবেশ করতে পারে, তখনই নুরি _কোরান_-এর রহস্যটি পরিপূর্ণরূপে বুঝতে পারে, অন্যথায় অসম্ভব। অন্যথায় কতগুলো ব্যাকরণের মারপ্যাঁচ দেওয়া কথা শিখে নিজেও বুঝতে পারে না এবং অপরকে বুঝবার পথে ছোট ছোট দেয়াল দাঁড় করিয়ে রাখে। তাই এই সুরার ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে নিজেকে

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

পবিত্র করতে পেরেছে তথা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সার্বজনীনতার মহান ডাকে ডাক দিয়ে বলছেন : ***অবশ্যই সেই ব্যক্তি সাফল্যলাভ করতে পেরেছে তথা কামিয়াব হতে পেরেছে যে নিজেকে পবিত্র করতে পেরেছে।***

অধম লিখকের মনে হয় *কোরান*-এর এই আয়াত দ্বারা মেজাজি পবিত্রতার কথাটি মোটেই বলা হয় নি। *কোরান* এখানে সর্বোচ্চ দর্শনটি বলে দিয়েছে। ওজু-গোসলের পবিত্রতা তো একটি অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। ওজু-গোসলের পবিত্রতা তো চোর-চোট্টা, বাটপার, অজ্ঞানপার্টি, মলমপার্টি, গাট্টিপার্টি, পগারপারপার্টি, ছিনতাই পার্টি, মীরজাফর, ইসলামের হিটলার হাজ্জাজ, মোয়াবিয়ার ছেলে এজিদ এবং আরও অনেককে ওজু-গোসলের মেজাজি পবিত্র হয়ে মেজাজি *কোরান* পাঠ করতে দেখেছি এবং অনেকেই দেখেছে। সুতরাং *কোরান*-এর এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, যে নিজেকে পবিত্র করতে পেরেছে সে অবশ্যই কামিয়াব হয়েছে। আরবি ভাষায় 'লাকাদ' শব্দটির অর্থটি 'অবশ্যই অবশ্যই' যাকে ইংরেজি ভাষায় 'এসেনশিয়াল' বলা হয়। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা হাকিকি পবিত্রতার কথাটি তথা আপন নফ্‌সের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানটিকে যে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে সেই তো কামিয়াব হয়েছে, সেই তো হাকিকি *কোরান*-এর হাকিকি অর্থগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারে।

এই হাকিকি *কোরান*-এর রহস্যটি যদি কেউ জানতে চায় তার জন্য পরের আয়াতে তথা ১৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, এবং যে জিকির করে তথা আল্লাহকে পাবার আশায় যে ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে রবরূপী আল্লাহকে হাসিল করার দিকে, সুতরাং সালাত করে তথা রবের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যায়। রবের সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টায় নিজেকে তিলে তিলে, ধাপে ধাপে এই সজ্ঘাতময় জীবন ও সংসারকে উপেক্ষা করে একাগ্রমনে যে এগিয়ে যেতে থাকে, সে-ই একদিন আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে সালাতকে কায়েম করতে পারে তথা যোগাযোগটি চিরস্থায়ী করতে পারে। যোগাযোগটি কখনও ছিন্ন হয়ে যায় না, যোগাযোগটিকে কোনো বৈষয়িক ঝড়-ঝঞ্ঝা ছিন্ন করতে পারে না, যোগাযোগটিকে কখনও লোভ-মোহ সংসারের মায়ার বন্ধনগুলোর কোনো নেটওয়ার্কই আর ছিন্ন করে দিতে পারে না।

আমরা জিকির শব্দটিকে 'স্মরণ করো' লিখে সমস্ত দায়দায়িত্ব হতে মুক্ত হতে চাই। অথচ 'স্মরণ করো' তথা জিকির করো শব্দটির সত্যিকার অর্থটি কী হবে তা লিখক নিজেই বুঝতে পারেন না, অথচ ফস্ করে 'স্মরণ করো' কথাটি লিখে ফেলেন। যেন ভাবখানা এই রকম, অনেক কিছু বুঝে গেছি, কিন্তু প্রশ্ন করলে দেখা যায় কিছুই বোঝেন নি। এটা অনেকটা আন্দাজে গুল মারার বিদ্যা। যে বিষয়টি, যে ঘটনাটি কোনোদিন কোনো কালেই দেখতে পারি নি সেই রকম ঘটনা ও বিষয়গুলোর উপর 'স্মরণ করো' কথাটি একটি বিরাট আত্মবিরোধী কথা। যেখানে দেখিই নাই, সেখানে স্মরণ করার কথাটি আসতেই পারে না। আদমের তওবা ১০ই মোহরমের দিন কবুল হয়েছিল তাহা পৃথিবীতে বাস করা একমাত্র মা হাওয়া ছাড়া আর কেউই জানতেন না, তা হলে আদমের তওবা করাটির কথায় যদি 'স্মরণ করো' বলা হয় তা হলে কেমন শোনায়? মানবজাতিই জন্মায় নাই অথচ যদি বলা হয়, 'স্মরণ করো' তা হলে কেমন

করে স্মরণ করবো? দুনিয়াতেই তো ছিলাম না। তা হলে স্মরণ করার প্রশ্নটিও হাস্যকর। সুতরাং জিকির শব্দের অর্থটি খুবই রহস্যপূর্ণ। কারণ জিকির অর্থ অনেকটা সালাতের মতো যোগাযোগ ও সংযোগ-এর কথাটি মনে করিয়ে দেয়। যেমন *কোরান* বলছে, *'ইন্‌নাস সালাতা লে জিকরি'* ইহার হুবহু বাংলাটি হলো, 'নিশ্চয়ই সালাত তথা যোগাযোগটি যোগাযোগের জন্যই।' কারণ সালাতও যোগাযোগ, জিকিরও যোগাযোগ। অনুবাদক মহাফাঁপড়ে পড়ে যায়। বাক্যের সৌন্দর্য আনতে গিয়ে অনুবাদক আসল দর্শনটি হারিয়ে ফেলে আর অনুবাদকের অকপট স্বীকার করে নেওয়াটি তথা 'এই আয়াতটি বুঝতে পারলাম না' বলাটি যেন একটি মহাপাপ বলে মনে করে, অনেকটা *'বিসমিল্লাহির রাহমানুর রাহিম'*– বাক্যটির অনুবাদ করার মতো। এখানেও অনুবাদক অনেকটা বাধ্য হয়ে গুলামারা বিদ্যাটি লিখে ফেলে। 'বাধ্য হয়ে' বললাম এ জন্য যে অনুবাদক এই আয়াতটির রহস্য না বোঝার দরুন– কারণ রহমান-ও দয়ালু রহিম-ও দয়ালু, কিন্তু অনুবাদক বুঝতে পারে না রহমান নামক দয়ালু শব্দটি কোথায় বসবে এবং রহিম নামক দয়ালু শব্দটি কোথায় বসানো হবে। অনুবাদক জানে না, রহমান অর্থ সাধারণ দান, যাহা মানবজাতির সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে করা হয়। সুতরাং ইহা নিছক সাধারণ দান। কিন্তু পরক্ষণে রহিম শব্দটিও দয়ালু। রহিম-এর দানটি সবার জন্য নয়, বরং যাঁরা ধ্যানসাধনার অবিরাম জিকির ও সালাতে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন তাঁদেরকে তাঁদের নিজ নিজ খান্নাস হতে মুক্ত করে দেবার বিশেষ দানটি করা হয় এবং এই বিশেষ দানটি ক্ষমার পরেই তথা আমিত্ব, হাস্তি, খুদি, ইগো, অহমকে তাড়িয়ে দেবার রহমতটি যখন দান করা হয় তখনই সেই দানটিকে বলা হয় বিশেষ দান তথা খাস্‌সুল খাস দান। এই দানে সাধকদের অবিরাম সালাত ও জিকিরের মাধ্যমে মোকামে জাবরুতের শেষ প্রান্তে আসার পর আল্লাহ রহিমরূপে লা-মোকামে সাধককে নিয়ে যান। ইহাই আল্লাহ্‌র ক্ষমার পরে দান করাটিকে বুঝায়। এই দানটির নাম গফুরুর রহিম তথা ক্ষমার পরে যে দানটি করা হয় উহা রহিমরূপেই করা হয়। সুতরাং *কোরান*-এর একটি স্থানেও গফুরুর রহমান শব্দটি নাই, বরং আছে গফুরুর রহিম। সুতরাং আমিত্ব হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত সাধকদেরকে যে দানটি করা হয় ওই দানের কথাটি যখন *কোরান*-এ উল্লেখ করা হয় তখনই আমরা আল্লাহকে 'গফুরুর রহিম' রূপে দেখতে পাই কিন্তু 'গফুরুর রহমান'-রূপে একটিবারের তরেও দেখতে পাই না। অতএব রহমানরূপে সাধারণ দান, রহিমরূপে বিশেষ দান। তা না হলে *কোরান*-এর আয়াতটির অনুবাদ করতে হয় : তিনি দাতা এবং তিনি দাতা। অনুবাদক আয়াতের সৌন্দর্যবর্ধন করার জন্য শব্দটির হেরফের করে ফেলেন।

এমন কিছু ঘটনা আছে যা অতি প্রাচীন এবং কেহই স্মরণ করতে পারছে না। সেইখানে যদি 'স্মরণ করো' কথাটি বলা হয় তা হলে সেই 'স্মরণ করো' কথাটির আরবি শব্দ 'জিকির'-এর আরও অনেক রকম রহস্যপূর্ণ অর্থ থাকতে পারে, যাহা অনুবাদক বুঝেও অনেকটা না বুঝার ভান করে। আসলে 'সালাত'-ও যোগাযোগ, আবার 'জিকির'-ও যোগাযোগ। সালাতটিকে যোগাযোগ অনুবাদ করা হয় আর জিকিরটিকে স্মরণ করো নামক ধান্দাবাজির অর্থটি করে আপন দায়িত্ব হতে মুক্তি পেতে চায়। যাহা জীবনে কেউ দেখেই নি সেই বিষয়ের উপর 'স্মরণ করো' কথাটি কি একটি বিরাট আজগুবি বিষয় নয়?

চলমান ঘটনার বর্তমান কালটি এক সেকেন্ডেরও কম, তারপর সেই চলমান ঘটনাটি অতীতকালের দিকে ধাবিত হয়। ভবিষ্যৎকালের ঘটনাগুলো বর্তমানকালের আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের দিকে চলে যায়। সুতরাং টাইম অ্যান্ড স্পেস সম্বন্ধে অতি হালকা একটি মোটামুটি ধারণা না থাকলে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।

এই আয়াতটির এক স্থানে বলা হয়েছে, 'এবং যে জিকির করে তার রবের দিকে', কিন্তু এই কথাটি বলা হয় নি যে, 'রবের মধ্যে' কারণ রবের মধ্যে ডুব দিতে পারলে জিকিরও থাকে না সালাতও থাকে না, তথা নাম জপ আর থাকে না, বরং দর্শন হয়ে যায়। তাই বাগদাদের জগৎ বিখ্যাত ওলি হজরত বাবা আলি আহাম্মদ রুদবারি বলেন : যদি আমা হতে আল্লাহ্‌র দর্শন বিলুপ্ত হয় তবে আমা হতে দাসত্ববাদ ভেঙে যায়। মোহশূন্য জিকির ও সালাত রহস্যলোকের জ্ঞান উদয় হবার সবচেয়ে বড় সহায়ক এবং উহা যদি নির্জন বাসের মাধ্যমে করা যায় তো আরও বিরাট সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আপন প্রবৃত্তি হতে যাহা চাওয়া হয় উহাকেই দুনিয়া চাওয়া হয় বলা হয়। সেই রকম দুনিয়া যে চায় আবার সেই সঙ্গে আল্লাহকেও চায় ইহাকে বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি পাগলামি বলেছেন। উনি বলেছেন, '*হাম খোদা খাহি ও হাম দুনিয়ায়ে দঁয়ি খেয়ালাস্ত তো মাহালাস্ত ওজনু।*' অর্থাৎ 'আমি আল্লাহও চাই এবং দুনিয়াও চাই এই খেয়াল অসম্ভব তথা পাগলামি।'

বিশ্ববিখ্যাত ওলি হজরত আহমদ হওয়ারি তাঁর নিজের কাছে সংরক্ষিত হস্তলিখিত বইগুলো নদীতে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এই সকল বই আমাকে সত্যপথের সন্ধান দিয়েছে এবং আসল লক্ষস্থলে যাওয়ার পথে মুরশিদ পেয়েছি। যাত্রী যে পর্যন্ত পথে থাকে সে পর্যন্ত পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয়, যখন সত্যসাগরে ডুবে যায় তখন পথের আর কী মূল্য থাকে?'

এই পথের নামই হলো জিকির ও সালাত। এবং এই জিকির ও সালাতের হাকিকি তথা আসল তথা গোপন অর্থগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই বুঝানো পথে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ্‌র রহস্যসাগরে ডুবে যাবার পর আর জিকির, সালাত ও মুরশিদের প্রয়োজন হয় না। যাত্রাপথে এগিয়ে যাবার জন্য এই তিনটির প্রয়োজন হয়। তাই *কোরান* অন্যত্র বলছে, এবাদত করো ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত আইনুল একিন তথা প্রত্যক্ষদর্শন না হয়। অনেকেই এই রকম কথার রহস্যগুলো না বোঝার দরুন আইনুল একিন শব্দটির অর্থ করে ফেলেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এবাদত করে যাও। হায়রে খোদা, কোথায় আইনুল একিন আর কোথায় মরণ পর্যন্ত! গোঁজামিলের তেলেসমাতি খেলা না বুঝে অনুবাদক খেলে যান আর সরল বিশ্বাসে পাঠকেরা সেই কথার উপর ভিত্তি করে লাফালাফি শুরু করে দেয়। ইহাতে উপকার তো হয়ই না, বরং ঝগড়াঝাঁটি, বাহারি বাহাস, এবং পরিশেষে লাঠালাঠির পর্যায়ে নেমে আসে। বিশ্ববিখ্যাত ওলি হজরত বাবা আবু আলি আহমদ রুদবারি বলেছেন : যাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেমিক তাঁরা জীবিত। মরণ তাঁদের কাছে একটি ঘটনা মাত্র। ঘটনাটি পোশাক বদলাবার, এর বেশি কিছু নয়। বিশ্ববিখ্যাত ওলি হজরত আওয়াল হোসেন খেরকানি চমৎকার একটি উপদেশ আল্লাহ্‌র পথের যাত্রিকদের বলে গেছেন আর সেই কথাটি হলো : ***আল্লাহ্‌র প্রেমিকের কাছে সকল স্থানই***

মসজিদ, সকল দিনই শুক্রবার, সকল মাসই রমজান, তিনি যেখানেই থাকেন আল্লাহ্‌র সঙ্গে থাকেন। দুনিয়ার সব রকম জ্বালা-যন্ত্রণা ধৈর্য সহকারে সহ্য করে অবশেষে ইফতার করতে পেরেছেন। তিনি আরও বলেছেন, মানুষ জিকির ও সালাতের মাধ্যমে অধ্যাত্ববাদের উন্নত স্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু বহু ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়। বহু ধর্মানুষ্ঠানে নানান রকম কথার চালাচালি হয় আর জিকির ও সালাতের মাধ্যমে নিজের ভেতরে রুহরূপী রব যখন প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখন আর কথা থাকে না, বরং নির্বাক হয়ে যান।

সুতরাং সুরা আলা-র ১৫ নম্বর আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'এবং যে জিকির করে তার রবের দিকে সুতরাং সালাত করে' কথাটির মোটামুটি একটি হালকা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হলো।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৮০

কোরান-এর ৯৬ নম্বর সুরা আলাকের ৯–১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: আপনি কি দেখিয়াছেন যে বাধা দেয় বান্দা যখন সালাতের উপরে? (*আরাই তাল্‌লাজি ইয়ান্‌হা আবদান ইজা সাল্লা*)।

ব্যাখ্যা

এই দুটি আয়াতের মেজাজি অর্থটিকে ধরে নিতে হলে মহানবির সালাতের উপর বাধা প্রদানকারী আবু জাহেলের নামটি এসে পড়ে। যদিও মহানবি সালাতের স্তম্ভ এবং আবু জাহেল বাধা প্রদানকারীদের স্তম্ভ। সম্পূর্ণ দুইটি মেরুতে অবস্থানকারী দুইজনের পরিচয়টির মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেবার জন্য *কোরান*-এর এ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। আবু জাহেল মরে না, মারা যাবার প্রশ্নই ওঠে না, কেবলমাত্র আবু জাহেলের দেহটির মৃত্যু ঘটে। জঘন্যরূপী নরপিশাচ আবু জাহেল-মার্কা নফ্‌সটির মৃত্যু তথা চির অবসান এই ঘটনার আগেও হয় নাই, পরেও হয় না এবং ভবিষ্যতেও কোনো দিন হবে না। এখানে আবু জাহেলকে জালেম শক্তির প্রতিমূর্তিরূপে দাঁড় করানো হয়েছে। তাই যুগে যুগে, কালে কালে মহানবির সাচ্চা অনুসারীদেরকে এই জালেম আবু জাহেল-মার্কা নফ্‌সগুলো বাধা দিয়েই যাবে। এই দ্বান্দ্বিক দর্শনের সার্বজনীনতাটি এই *কোরান*-এর আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। তাই প্রথমেই বলা হলো আবু জাহেলের ঘটনাটি একটি মেজাজি ঘটনা। এই মেজাজি ঘটনার মাধ্যমেই সার্বজনীন চলমান ঘটনাগুলো যে ঘটে চলছে, চলে এবং চলবে সেই অতি অপ্রিয় সত্য কথাটি তুলে ধরা হয়েছে।

এই সুরার শেষ আয়াতে যে মহানবিকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে উহাও মেজাজি সাবধান তথা মহানবির জন্য মোটেই নয়। শেষ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে এদেরকে অনুসরণ করবেন না। এই অনুসরণ করার কথাটি মহানবির উপর কোনো অবস্থাতেই খাটানো যায় না। যদি কেহ জোর করে খাটাতে চায় তা হলে সে একশত পার্সেন্ট কাফের। মহানবির মাধ্যমে যুগে যুগে মহানবির অনুসারীদেরকে এই জাতীয় পাপিষ্ঠদের অনুসরণ করতে মানা করে দেওয়া হয়েছে। মানা করার

কোরান-এর ভাষাটিতে প্রচন্ড শক্তিপ্রয়োগ করা হয়েছে। আরবি ভাষায় 'কাল্লা' শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়: কখনই নয় অথবা কোনো অবস্থাতেই নয়। তারপর বলা হয়েছে, সেজদা করুন এবং সেজদা করুন শব্দটি বলতেও দুই প্রকার অর্থ বোঝানো হয়েছে : একটি মেজাজি, অপরটি হাকিকি। ***মেজাজি সেজদা বলতে মাটিতে মাথা নত করাকে বুঝায় আর হাকিকি সেজদাতে বোঝানো হয়ে থাকে মনপ্রাণ এবং সব কিছু জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াটুকু, আল্লাহ্‌র পাক দরবারে উৎসর্গ করে দেবার সেজদাটি।*** ইহাই হাকিকি সেজদা। ইহাই আপন নফ্‌স হতে খান্নাস-বর্জিত সেজদা। এই হাকিকি সেজদা দিতে পারলে সেজদাকারী নিজেই বুঝতে পারে যে সে আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী হয়ে আছেন।

'আমার নিকটবর্তী হও', *কোরান*-এর এই কথাটির মূল্য অপরিসীম, কিন্তু সাধক যখন হাকিকি সেজদায় জীবনটিকে উৎসর্গ করে দেন তখন নিজেই বুঝতে পারেন যে তার আপন রব জাতরূপে তারই মাঝে বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে আছেন। দূরে অবস্থানকারী প্রিয় বন্ধুটিকে বার বার ডাকা যায়, কিন্তু সেই প্রিয় বন্ধুটি যখন মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় তখন আর ডাকার প্রয়োজনটি থাকে না। যদি তখনও কেহ ঘাউরামি করে ডাকতে থাকে তা হলে সেই প্রিয় বন্ধুটি তাকে পাগল মনে করবে। সুতরাং দূরে থাকলে ডাক আছে, অতি নিকটে আসলে আর ডাক থাকে না। সুতরাং দর্শনের বাহিরে ডাকাডাকি, চিল্লাচিল্লি, বাহারি আস্ফালন এবং ঠাটবাটের উপাসনাগুলো থাকে, কিন্তু যখন যাকে এত ডাকাডাকি করা হচ্ছে সেই ডাকের প্রাণপ্রিয়টি আপন নফ্‌সের ভিতর হতে স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন, প্রকাশিত হয়ে পড়েন এবং বিকাশমান রূপধারণ করেন তখন ডাকের বদলে নির্বাক হয়ে যান। তাই চরম মুহূর্তে প্রভুকে আর ডাকা যায় না। কারণ প্রভু তো নিজের মাঝেই সমাসীন।

কোরানুল হাকিম-এর প্রায় অধিকাংশ আয়াতে আমরা মেজাজি এবং হাকিকি দুটো রূপই দেখতে পাই। এ যেন বৈষয়িক এবং অধ্যাত্মবাদের দ্বান্দ্বিক দর্শনের ফলশ্রুতি। এই উপসংহারটুকু যারা বুঝতে পারে না, বা যারা বোঝার শক্তি অর্জন করে নি, বা বুঝবার মতো জ্ঞানদান করা হয় নি তাদেরকেই বা কী দোষ দিতে যাব?

পরিশেষে একটি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আবু জাহেলের হাত-পা, মাথা-মুন্ডু, চোখ-কান-নাক তথা সমগ্র দেহটি তওহিদে বাস করে এবং যাহা তওহিদে বাস করে উহাই মুসলমান। সুতরাং আবু জাহেলের দেহটি মুসলমান হলেও আবু জাহেল নামক নফ্‌সটি হলো প্রচন্ড কাফের এবং ভীতিপ্রদ কাফের। আবু জাহেল মোটেই সাধারণ কাফের নয় এবং আবু জাহেলের নফ্‌সটি মোটেই সাধারণ কাফের নয়, বরং শয়তানের চারটি রূপ দিয়ে টাইট করে বাঁধানো একটি বিভীষিকাময় কাফের। শয়তানের যে চারটি রূপ তথা ইবলিস, শয়তান, মরদুদ এবং খান্নাস– এই চারটি পরিপূর্ণ রূপে আবু জাহেলের নফ্‌সটিকে চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণের মতো সম্পূর্ণ গিলে ফেলেছে। তাই আবু জাহেল এবং তার মতো অনুসারীরা যেদিকেই তাকায় সেই তাকানোর মাঝে ধ্বংস আর বিভীষিকা লেলিহান জিহ্বার মতো লক লক করছে। আবু জাহেলের দেহটি একটি পোশাক। ছিন্ন পোশাক ফেলে দিয়ে মানুষ যেমন নূতন পোশাক ধারণ করে সেই রকম আবু জাহেলেরা যুগে যুগে পুরাতন পোশাকগুলো ফেলে দিয়ে নূতন

শয়তানি পোশাক ধারণ করে মানব সমাজ জীবনটিকে অস্থির করে তোলে। আবু জাহেলের নফ্‌সটি যখন দেহ হতে বিদায় গ্রহণ করলো তখন দেহটির নাম হয়ে যায় লাশ। আবু জাহেলের লাশের আকার, ধরে নিলাম, সাড়ে তিন হাত, কিন্তু মহাপাপিষ্ঠ আবু জাহেল নামক নফ্‌সটি, যাহা চর্মচক্ষে দেখা যায় না, উহা মাপা যায় না। তখন উহাকে আমরা অপশক্তিরূপে আখ্যায়িত করি। সুতরাং ব্যক্তি আবু জাহেল একটি মেজাজি উদাহরণ। আর হাকিকি আবু জাহেল যুগে যুগে, কালে কালে চলমান একটি অভিশপ্ত দানবীয় শক্তি। এই শক্তি হতে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থাপত্রটির নাম *কোরানুল মবিন* এবং এই *কোরানুল মবিন*-এর যিনি স্রষ্টা তিনি হলেন আল্লাহু জাল্লে শানাহু জুলজালালুহুল ইকরাম।

আরেকটি প্রশ্ন হয়তো উঠে আসবে, প্রশ্নটির উত্তরও হয়তো সামান্য কিছু জানা থাকারই কথা, কিন্তু রহস্যলোকের সব কথা আমভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরাটিকে অধম লিখক ব্যক্তিগতভাবে মোটেই সমীচীন মনে করি না। তবে বিশেষ বিশেষ খাস মুরিদ ও খলিফাদেরকে বলা যায়। তাই পাঠক বাবা-মায়েদের কাছে আমি করজোরে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। তবে মহানবির বিষয়টির সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে গেলাম। মহানবি জাত নুরের তৈরি। সেফাতি নুরে ফেরেশতারা তৈরি। আর মানুষেরা মাটির তৈরি। তাই *কোরান*-এর কোথাও *'আনা ইনসানুল মিসলেকুম'* তথা আমি তোমাদেরই মতো মানুষ, এই ইনসান শব্দটি একটি আয়াতেও পাওয়া যায় না।

অধম লিখক ফতোয়াবাজ নয়, তবু একটি প্রশ্নে অধম লিখক একটি মাত্র ফতোয়া দিচ্ছে, আর সেই ফতোয়াটি হলো, যারা মহানবিকে মাটির তৈরি বলে মনে করে তারা ১০০% কাফের। তারপরে আরেকটি প্রশ্ন থাকে আর সেই প্রশ্নটি হলো, মহানবিও কি তাঁর জাতনুরের তৈরি সাড়ে তিন হাত দেহটিতেই সীমাবদ্ধ নাকি সর্বভূতে বিরাজিত? মহানবির দেহটি কি মদিনার রওজাতেই সীমাবদ্ধ নাকি সর্বস্থানে সর্বাবস্থায় বিরাজিত? মদিনার রওজায় মহানবির অবস্থানটি হলো মেজাজি অবস্থান। আর মহানবির হাকিকি অবস্থানটি তিনি নিজেই বলে গেছেন, *'আউয়ালুনা মোহাম্মদ, আওসাতুনা মোহাম্মদ, আখেরুনা মোহাম্মদ, কুল্‌লানা মোহাম্মদ'* অর্থাৎ 'আদিতে ***আমরা মোহাম্মদ, মাঝখানে আমরা মোহাম্মদ, শেষেও আমরা মোহাম্মদ এবং সর্বস্থানে আমরা মোহাম্মদ।'***

এই কথাগুলো বলতে গিয়ে একটি সামান্য অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে বাধ্য হলাম আর সেটা হলো, বিশ্ববিখ্যাত আল্লাহ্‌র ওলিরা *'আনাল হক'* বলেছেন, *'আনা সুবহানি'* বলেছেন, *'লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ তায়ালা'* বলেছেন, 'জাতে সুবহানি' বলেছেন, *'খাহেকে হুআল্লাহ'* বলেছেন, *'বালকে খোদারা'* বলেছেন, কিন্তু একটিবারও ভুলেও এই কথাটি বলেন নি যে *'আনা মুহাম্মদ'* তথা *'আমিই মোহাম্মদ'*। সুতরাং জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট, যাকে উর্দু ভাষায় বলা হয় 'আকেল মন্দকে লিয়ে ইশারাই কাফি হ্যায়।'

মেজাজি শেরেক এবং হাকিকি শেরেকের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মেজাজি শেরেকে আপন নফ্‌সের ভেতর খান্নাসরূপী শয়তানটিকে নিয়ে উপাসনা-আচার-অনুষ্ঠান পালন করাটিকে শেরেক বলা

হয় না তথা শেরেক ধরা হয় না, কিন্তু পরক্ষণে হাকিকি অর্থে আপন নফ্‌সের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি যতদিন অবস্থান করবে ততদিনই শেরেকে ডুবে আছে বলা হয়।

মেজাজি অর্থে হাজার হাজার বার '*আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তোয়ানুর রাজিম*' তথা 'প্রস্তরের আঘাত খাওয়া আপন নফ্‌সের ভেতরে অবস্থান করা শয়তানটি হতে আশ্রয় চাই' পড়লেও শয়তান মোটেই ছেড়ে দেবে না। তাই কেমন করে, কী উপায় অবলম্বন করলে, কীসের মাধ্যমে এবং কীসের সাহায্য নিয়ে আপন নফ্‌সে অবস্থান করা শয়তানটিকে তাড়ানো যায় সেই ব্যবস্থাপত্রটি যাঁরা দান করবার উপযুক্ত সেই পীরের কাছে গিয়ে শিক্ষাটি গ্রহণ করতে হয়। মহান আল্লাহ তো তাঁর কালাম তথা *কোরানুল করিম*, *ইঞ্জিল শরিফ*, *জব্বুর শরিফ*, *তাওরাত শরিফ* সর্বশক্তিমান হয়েও সরাসরি পাঠিয়ে দিলেন না, বরং মহানবি, হজরত ইসা রুহুল্লাহ (আ.), হজরত দাউদ (আ.)–র ঠোঁট মোবারক হতে পেলাম! আল্লাহ সর্বশক্তিমান হয়েও নবিদের উসিলায় কালাম পাঠিয়ে দিলেন, আর আমরা অসহায়রা কি গুরু ধরে তথা পীর ধরে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হবো না? যার যার তকদির তার তার কাছেই পীর ধরা আর না-ধরার যুক্তিগুলো তুলে ধরবে। ইহাই তকদিরের দুঃখজনক অথবা আনন্দদায়ক নিয়তির লিখন, খন্ডাবার বিধানটি আছে কিনা জানা থাকলেও বলবো না।

তওহিদে একেরই অবস্থান, একেতেই স্থিতি। তওহিদে দু'য়ের স্থান নাই, বহু স্থান থাকাটার তো প্রশ্নই আসে না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত সাধক এবং তার পীর উভয়ে একত্রে অবস্থান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত হাকিকি সূক্ষ্ম শেরেকে অবস্থান করছেন। সুতরাং পীর ধরাও একটি অতীব সূক্ষ্ম শেরেক। এই পীরের মাধ্যম দিয়ে যখন আপন নফ্‌স হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে সম্পূর্ণরূপে বাহির করে দিতে পারবে তখনই সাধক তওহিদে অবস্থান করে।

ইমামুল আউলিয়া হজরত বাবা বায়েজিদ বোস্তামি আওলাদে রসুল হজরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-এর কাছে মুরিদ হয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে ধ্যানসাধনা করে যখন মোকামে জাবরুতের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন তখন তিনি বললেন, 'হে আমার রব, আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট।' প্রতি-উত্তরে রব বললেন, 'বায়েজিদ, যদি তুমি সত্যিই আমার উপর সন্তুষ্ট থাকতে তা হলে তোমার মুখে এই রকম কথা না শুনে অন্যরকম কথা শুনতে পেতাম।' বায়েজিদ লজ্জিত হয়ে আবার কঠোর ধ্যানসাধনার রেয়াজতে মশগুল হয়ে গেলেন। এবং কিছুদিন পরে বলে ফেললেন, '*আনা সুবহানি, মা আজামুশ্‌শানি*' অর্থাৎ 'আমিই সুবহানি, সব শান আমারই।' ইহাই তওহিদে অবস্থান করার হাকিকি দর্শন।

বিশ্ববিখ্যাত ওলি হজরত জুন্নুন মিসরি পীরের দেওয়া ধ্যানসাধনার পথে এতই কঠিন সাধনা করেছিলেন যে এন্তেকালের পর তাঁর কপালে নুরানি অক্ষরে যে বাণীটি লিখা ছিল তা হলো '*হাজা হাবিবুল্লাহে মা তা ফি হুব্বুল্লাহে কাতিবুল্লাহে মা তা বে সাইফুল্লাহে*' অর্থাৎ 'ইনি আল্লাহ্‌র বন্ধু আল্লাহ্‌র এশকের মধ্যে জীবন দান করেছেন (এবং) আল্লাহ্‌র পথে শহিদ হয়েছেন (এবং) আল্লাহ্‌র তরবারিতে শহিদ হয়েছেন।' এই সেই বিখ্যাত ওলি, যাঁকে হুজ্জাতুল ইসলাম বাহালুল উলুম ইমাম গাজ্জালি তাঁর অমর গ্রন্থটিতে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে গেছেন। সাধারণ মানুষ অথবা ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

বলতে পারে যে, কেমন করে হজরত জুন্নুন মিসরি আল্লাহ্‌র তরবারিতে শহিদ হয়েছেন? জুন্নুন মিসরির এই শহিদ হওয়াটা মেজাজি তরবারি হাতে নিয়ে মেজাজি শত্রুদের বিরুদ্ধে মেজাজি জেহাদটি করেন নি এবং করার প্রশ্নটি ওঠে না। তিনি আপন নফ্‌সের ভেতর খান্নাসের লক্‌লকে শত জিহ্বাকে রেয়াজতের তরবারি দ্বারা হত্যা করতে পেরেছেন, মেজাজি জেহাদের মেজাজি তরবারি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেন নি। হায় রে খোদা! এত বড় ওলির বিরুদ্ধেও যখন নানা রকম মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া হয় তখনই মনে হয় এই দুনিয়াতে আল্লাহ অনেক অনেক মানুষের সুরতে পশুর চেয়েও অধম তৈরি করে রেখেছেন। তাই বলতে ইচ্ছা করে, আল্লাহ্‌র খেলা আল্লাহই খেলে চলছেন; আবার আল্লাহই বলছেন, আমার (আল্লাহ্‌র) কোনো খেলার মধ্যেই বিন্দুমাত্র ভুলত্রুত্রুটি পাবে না। যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাও তো ভুল তো দেখতেই পাবে না, বরং আপন চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে আপনার কাছেই ফেরত আসবে।

সুতরাং নাসুত, মালাকুত, এবং জাবরুত– এই তিনটি মোকাম পর্যন্ত 'আমি' নামক নফ্‌সটি আছে, সঙ্গে খান্নাস আছে, সঙ্গে রুহরূপী আল্লাহ আছেন এবং পীরের ধ্যানটি আছে। যেইমাত্র সাধককে আল্লাহ বিশেষ রহমতে রহিম-রূপধারণ করে ক্ষমা করে দেন তখনই লাহুত মোকামে প্রবেশ করতে পারেন। ***লাহুত মোকামে প্রবেশ করামাত্র সাধক দেখতে পান, আপন পীরও নাই, নফ্‌সের সঙ্গে সঙ্গীরূপে থাকা খান্নাসটিও নাই।*** এবং তখনই চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করেন, *'আনাল হক'*, *'লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ তায়ালা'*, *'আনা সুবহানি মা আজামুশ শানি'*, *'মাতলে আনোয়ারে জাতে সুবহানি সুদাম'*, *'না দিদাম মোস্তফারা বালকে খোদারা,'* *'জামালে খুদ জামালে ইয়ারে দিদাম'*, *'খাহে কে আনাল্লাহে বগু খাহে কে হু আল্লাহ'*, *'মান না আম মাসুদ বিল্লাহ মান না আম'*, *'হাজারওখানে মা বারকান্দা বাশি'*, *'না ম্যায় ম্যায় না তু তু ফাকাদ একি হু হ্যায়'*, *'লেচাল উজ দেশ মে জিদার আলিফ মে লাম নাহি'*, *'সোহহম সোহমি'*, *'তুই মুই, মুই তুই।'*

আফসোস! এই লক্ষ লক্ষ ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফরা যেখানে এক রকম কথাটি বিভিন্ন ভাষায় বলছেন, সেখানে ওহাবি আলেম-উলামারা প্রচার করে বেড়ায় যে পীর না ধরে আল্লাহকে সোজা ডাকতে হবে। ওহাবি আলেম-উলামাদের কথাটি যদি সত্য বলে ধরে নেই তা হলে এই লক্ষ লক্ষ বিশ্ববিখ্যাত ওলিরা সবাই ফোর টুয়েন্টি হয়ে যায়, আর যদি এই ওলিদের কথাগুলো নিরেট সত্য কথাটি বলে মনে হয় তা হলে ওহাবি আলেম-উলামারা ফোর টুয়েন্টি হয়ে যায়। এখন পাঠক বাবা মায়েদের কাছেই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম, কারটা গ্রহণ করে নেবে। তবে আপনার বাবারও সাধ্য নাই যে আপনি কোনোটি গ্রহণ করে নেবেন। কেন? জন্মের আগেই আপনার তকদিরে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন। কথাগুলো শুনলে অবাক হতে হয়, মনে মনে দুঃখ পাওয়া যায়, কিন্তু তকদির বিষয়টির উপর কিছুই করার থাকে না। যেমন এইড্‌স-এ আক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীটির মৃত্যুর দৃশ্যটিতে বিশ্বের সব জাঁদরেল ডাক্তাররা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

_কোরান_-এ সালাতের উল্লেখ : ৮১

_কোরান_-এর ৯৮ নম্বর সুরা বাইয়্যিনাহ-এর ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: এবং আদেশ দেওয়া হয় না একমাত্র আল্লাহ্র এবাদত করার জন্য মাত্র একটি বিষয়ে নিষ্ঠাবান (মুখলেসিন একাগ্র, একনিষ্ঠ, বিশুদ্ধ চিত্তে, পবিত্র মনে, পরিশুদ্ধভাবে) দীনের জন্য সত্যে অবস্থান করিয়া (হুনাকা) এবং সালাত কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো এবং ওইটাই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। (_ওয়া মা উমিরু ইল্লা লিইয়া বুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দীন, হুনাফা আ ওয়া ইউকিমুস্ সালাতা ওয়া ইউতুজ্ জাকাতা ওয়া জালিকা দীনুল কাইয়্যিমাহ_)।

ব্যাখ্যা

_কোরান_-এর এই আয়াতটির হুবহু অনুবাদ করতে গিয়ে বাক্যের সৌন্দর্যটি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হই। যা-তা লিখে গড়পরতা অনুবাদ করার পক্ষপাতী আমরা নই। আমরা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই এবং এই আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যেও যদি সামান্য ভুলত্রুটি থেকে যায় উহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গেলে প্রথমেই লিখতে হয় যে দীন দুই প্রকার : একটি আল্লাহ্র দীন এবং অপরটি মানুষের দীন। আল্লাহ্র দীন এক, অখন্ড, অদ্বিতীয় এবং ইহার কোনো পরিবর্তন নাই (_সুন্নাতাল্লাহে লা তাব্দিলা_)।

কেন আল্লাহ্র দীন এক ও অখন্ড এবং অদ্বিতীয়? কারণ সমগ্র _কোরান_-এর সমগ্র ভাষণে সমগ্র আদেশ-উপদেশে মাত্র একটি কথাই আল্লাহ বার বার বিভিন্ন ভাষার স্টাইলে বলেছেন আর সেই একমাত্র উপদেশটি হলো : মানুষের নফ্সের সঙ্গে তথা জীবাত্মার সঙ্গে তথা প্রাণের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দেওয়া, উহা হতে তথা খান্নাস হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া। মূল উপদেশের প্রশ্নে সমগ্র _কোরান_ মাত্র একটি উপদেশই দিয়েছে। তাই আল্লাহ্র দীন এক, অখন্ড এবং অদ্বিতীয়।

কর্মের বিভিন্নতা থাকতে পারে, কর্মের প্রকারভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সব কর্মের মূল বিষয়টি হলো আল্লাহ্র দীনকে কায়েম করা। খান্নাস আপন নফ্সের সঙ্গে যত ক্ষুদ্র আকারেই থাক না কেন, সেই থাকাটি মোটেই আল্লাহ্র দীনের প্রশ্নে বাঞ্ছনীয় নয়। অপরপক্ষে মানুষের দীন তথা ধর্ম অসংখ্য, অগণিত এবং ক্ষণস্থায়ী। যদি আল্লাহ্র একমাত্র দীনের রঙে রাঙিয়ে না নেওয়া হয় তা হলে এই অগণিত কর্মগুলো সম্পূর্ণ বৃথা। আল্লাহ্র দীন এবং মানুষের দীন বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যিনি _কোরান_-হাদিস দিয়ে সুন্দরভাবে লিখে গেছেন তাঁর নাম শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী– তাঁর বিখ্যাত বই _মসজিদ দর্শন_-এ। তাই এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আর অগ্রসর হলাম না। এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহ্র এবাদত করার জন্য আদেশ দেওয়া হচ্ছে– এবং সেই আদেশের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে বলা হয়েছে। 'মুখলেসিন' আরবি শব্দটির অনেক রকম অর্থ হতে পারে, কিন্তু এখানে বিশুদ্ধ চিত্তে তথা পবিত্র মন নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র এবাদত করতে বলা হয়েছে।

চিত্তের বিশুদ্ধতা বলতে কী বুঝায়? আর মনের পবিত্রতা বলতেই বা কী বুঝায়? চিত্ত তথা নফ্স কখন বিশুদ্ধ হয়? মন তথা নফ্স কখন পবিত্র হয়? একই কথা বার বার কতবার বলবো? অথচ বলতেই হবে। কারণ মূল কথার প্রশ্নে *কোরানুল করিম* বার বার একই কথা অনেক রকম ভাষায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আমরা বুঝেও বুঝি না। আমরা জেগে থেকে ঘুমাই। তাই শত চেষ্টা করেও আসল কথাটি উদ্ধার করতে বড়ই কষ্ট হয়। বিশাল কালো কয়লার বিশাল আবর্জনার অভ্যন্তরেই হাতে গোনা কয়টি উজ্জ্বল বর্ণের হীরা পাওয়া যায়। এই আয়াত যারা আল্লাহ্‌র মূল রহস্যটি বুঝতে পারে, জানতে পারে সেইসব সাধকদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে, তাই সাধকদের বলা হচ্ছে : তোমরা একাগ্র মনে, বিশুদ্ধ চিত্তে, পবিত্র মনে আল্লাহ্‌র দীনকে কায়েম করার জন্য অবিরাম সালাত ও জাকাত আদায় করে যাও। এই সালাতটি দায়েমি সালাত, তথা অবিরাম আল্লাহ্‌র সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করার তরে এগিয়ে যাও। অবশ্য ওয়াক্তিয়া সালাতের মাধ্যমেই ধীরে ধীরে দায়েমি সালাতের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। মহানবি বলেছেন, '*আস্‌সালাতুদ দাওয়ামি আফজালুম্ মিনাল সালাতিল ওয়াক্তি*' অর্থাৎ 'ওয়াক্তিয়া সালাত হতে দায়েমি সালাত অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ।' সুরা মারেজের ২৩ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে : যাহারা সালাতের উপর দায়েম তথা সর্ব অবস্থায় যোগাযোগের সালাতটিতে মশগুল হয়ে আছে এরাই প্রকৃত সালাতি। এই রকম সালাতিদের প্রতিটি কাজ-কর্ম, চলাফেরা, আচার-অনুষ্ঠান এবং নিদ্রা যাওয়া সবই দায়েমি সালাতের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল সাধকেরা অবিরাম ধ্যানসাধনায় দায়েমি সালাতকে প্রতিষ্ঠা করার তরে উঠে-পড়ে লেগে আছে তাদেরকেই এই আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশ-উপদেশটি মোটেও অতিসাধারণ মানুষের জন্য নয়, বরং যারা চিন্তাশীল, যারা সত্যের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে, যারা সত্যের পূজারি, যারা সত্যকে বুকে ধারণ করার জন্য জীবন বাজি রেখে জ্ঞান গবেষণায় মেতে থাকে, যারা আল্লাহ্‌র রহস্যলোকের পর্দা তথা পিন্‌হানি উন্মোচন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে, তাদের জন্যই *কোরান*-এর এই পবিত্র উপদেশটি দেওয়া হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে জাকাতের কথাটি। এই জাকাত সম্পত্তির আড়াই ভাগ দান করার জাকাত নয়, যদিও সম্পত্তির আড়াই ভাগ দেওয়াটাও জাকাত, তবে ইহা মেজাজি জাকাত। এমন কোনো নবি-রসুলের আগমন এই ধরাধামে হয় নি, যাঁরা জাকাত আদায় না করেছেন। নবি হজরত আদম (আ.) সম্পত্তির আড়াই ভাগ কাকে জাকাত দিয়েছিলেন? সম্পত্তির আড়াই শতাংশ দেবার মতো মানুষ কোথায়? তা-ও আবার অভাবী মানুষ হতে হবে, কারণ মেজাজি জাকাত অভাবীদেরকে দান করার বিধানটি দেওয়া হয়েছে। যেখানে মানুষই নাই সেখানে অভাবী শব্দটি একটি অবান্তর শব্দ।

আপন নফ্সের অভ্যন্তরের খান্নাসকে বিতাড়ন করার ধ্যানসাধনাটি হলো হাকিকি জাকাত। এই হাকিকি জাকাতটি দান করতে পারলেই ইনসানে কামেল হয়ে যায়। এঁদেরকেই সম্যক গুরু, চেতন গুরু, পীরে কামেল ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে এবং সীমিত অভিজ্ঞতায় এইটুকু অন্তত বুঝতে পারি যে আলোর সঙ্গে অন্ধকার থাকাটি অবধারিত। ভালোর সঙ্গে মন্দ, খাঁটির সঙ্গে ভেজাল, তওহিদের সঙ্গে মূর্তিপূজা (আপন প্রবৃত্তির চাহিদাগুলোই মূর্তি) এবং নিজের

মধ্যে দুইয়ের অবস্থানের শেরেক হতে মুক্তি পাবার ধ্যানসাধনার জন্য অবিরাম সালাত ও জাকাত করে যাবার উপদেশটি এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে, জেনে রাখো, এটাই আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত দীন তথা ধর্ম। এই কায়েমি দীনের মধ্যে অবস্থান করার জন্য সাধকদেরকে *কোরান*-এর এই আয়াতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

কর্ম বন্ধন নয়, বরং কর্ম এবাদত। কর্মের অভ্যন্তরে খান্নাসের দেওয়া কামনাগুলো যখন আপনার ভিতর হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখনই কর্মটি বন্ধনে পরিণত হয়ে যায়। খান্নাসের চাওয়া-পাওয়াগুলো মানব দেহের বাহিরে থাকে না, বরং নফ্‌সের অভ্যন্তরেই লুকিয়ে থাকে। সেই কামনাগুলো যখন কর্মগুলোর উপর হস্তক্ষেপ করে বসে তখনই কর্ম বন্ধন হয়। সুতরাং কামনার জন্মদাতা পবিত্র নফ্‌স নহে, বরং অপবিত্র খান্নাস। সুতরাং যেইমাত্র কামনা কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে তখনই কর্ম বন্ধন হয়ে পড়ে। কামনার বন্ধন মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রতারিত করে। মৃত্যু নামক ঘটনাটি যখন জীবন সায়াহ্নে এসে দাঁড়ায় তখনই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে, সব কর্মগুলোই আমার বৃথা, নিষ্ফল, অসাড়। কিন্তু তখন করার আর কিছুই থাকে না। ঢাকাইয়া ভাষায় বলে : অপারেশন সাকসেসফুল, কিন্তু রোগী মারা গেছে।

মহানবি ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন, সংসারধর্ম পালন করেছেন, অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হয়েছেন : কিন্তু কামনার বন্ধন এক মুহূর্তের তরেও স্পর্শ করতে পারে নি।

জানোয়ার পেট ভরে খেতে জানে, কিন্তু গাট্টি ভরে নিয়ে আসতে জানে না। হাঁস জলেই অবস্থান করে, কিন্তু সাঁঝের বেলা যখন উঠে আসে তখন জল নিয়ে আসে না। যে সব দেশ ও জাতি অসহায়, গরিব, এতিম, মিসকিনদের ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যবস্থাটি করে রাখে সেই দেশের, সেই জাতির অভ্যন্তরে নাস্তিক্যবাদ-কমিউনিজম কমই উঁকিঝুঁকি মারতে পারে। তাই মহানবি ক্ষুধার্ত মানুষটিকে উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, আগে খেয়ে নাও, তারপর নামাজ পড়ো। যে দেশে ধনসম্পদের বিরাট বৈষম্যটি থেকে যায় সেখানে অনেক রকম অপরাধের জন্ম হওয়াটা একান্ত স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ্‌র কী বিচিত্র খেলা! এই খেলায় একজন ত্যাগী, অপরজন ভোগী। ত্যাগী ত্যাগ করেই ত্যাগের কোলে একদিন ঘুমিয়ে পড়ে, আবার ভোগীও ভোগ করতে করতে রক্ত আমাশায় ভুগতে থাকে। ফুল চিরদিন মধু দিয়েই যায়, আর ভ্রমর চিরদিন ফুলের মধু পান করেই যায়। যেন প্রতিটি জীব একটি নির্দিষ্ট তকদিরের বলয়ে লীলাখেলা করে চলছে। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না।

পরিশেষে একটি কথাই বলতে চাই, আর সেই কথাটি হলো : আমি কাকে দোষ দেব?

কোরান-এ সালাতের উল্লেখ : ৮২

কোরান-এর ১০৭ নম্বর সুরা মাউনের ৪–৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : সুতরাং ওই সকল মুসল্লিদের জন্য ওয়াইল (যদিও ওয়াইল একটি দোজখের নাম এবং সেই দোজখটিকে মেজাজি ভাষায় আফসোসের দোজখ বলা হয়, সুতরাং ওয়াইল শব্দটির অর্থ অনেকে দুঃখ, দুর্ভোগ, দুর্গতি, লাঞ্ছনা, কষ্ট ইত্যাদি

করেছেন। যেমন হাবিয়া দোজখটিকে বলা হয়, যে দোজখের তলা নাই তথা কেবল পড়তেই থাকবে। যারা দুনিয়ার ধনসম্পদকেই একমাত্র মাবুদ বলে মনে করে এবং এই ধনসম্পদের লোভীদের যেমন লোভের শেষ নাই তথা তলা নাই সেই রকম হাবিয়া দোজখের তলা নাই।) যাহারা তাহাদের সালাতে অমনোযোগী, যাহারা লোক দেখানোর জন্য (সালাত) করে। (*ফাওয়াইলুল্‌লিল্‌ মুসল্লিনা-ল্‌লাজিনা হুম আলা সালাতিহিম সাহুনা-ল্‌ লাজিনা হুম ইউরাউনা।*)

ব্যাখ্যা

এই আয়াত কয়টির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রধানত মনের অবস্থানটির উপর সমস্ত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মনের অবস্থানটিকে নিয়ত বলা হয়। এই নিয়তের দাঁড়িপাল্লাটি আল্লাহ্‌র হাতে। কার নিয়ত আল্লাহ্‌র দিকে আর কার নিয়ত দুনিয়ার দিকে ইহা আল্লাহই বিচার করবেন। যদিও জ্ঞানী লোকেরা অনেক সময় এই নিয়তের পরিষ্কার ভাষাটি ধরতে পারেন, আবার অনেক সময় মোটেই পারেন না। তাই এই বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক একটা বিষয়। কেন একটি অত্যন্ত নাজুক বিষয় বললাম? বললাম এই জন্য যে, যে সালাত তথা নামাজ চর্মচক্ষে দেখা যায় উহাকেই লোক-দেখানো সালাত নামটি দেওয়া যায়। তবে একটি কথা থাকে যে, আনুষ্ঠানিক সালাতে যে সকল অঙ্গভঙ্গি তথা রুকু-সেজদা করতে হয় উহা সবাই দেখতে পায়। যাহা সবাই দেখতে পায় উহাকেই লোক-দেখানো বলা যায়। কিন্তু যে বা যিনি এই আনুষ্ঠানিক সালাতের অঙ্গভঙ্গি তথা রুকু-সেজদাগুলো একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য খাস নিয়তে আদায় করছেন তার সালাতটি লোক-দেখানো সালাত হলেও আসলে উহা মোটেও লোক দেখানো সালাত নয়। তাই আল্লাহ বলছেন, যারা লোক-দেখানো সালাত আদায় করবে তাদের জন্য ওয়াইল নামক দুঃখভোগের দোজখটি রেখে দেওয়া হয়েছে।

সালাত তথা যোগাযোগটি যদি আল্লাহ্‌র সঙ্গে যুক্ত না হয়ে দুনিয়া পাবার আশায় করার নিয়তটি থাকে তা হলে ওই সকল নামাজিদের জন্য ওয়াইল নামক আফসোসের দোজখের কথা বলা হয়েছে। এই রকম নামাজিদের মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগের কথাটি থাকে না। তাই এই সালাত তথা নামাজকে অমনোযোগী, উদাসীন, ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। আবার পরক্ষণে যারা প্রকাশ্যে সালাত আদায় করার তরে আনুষ্ঠানিক রুকু-সেজদা করছে, অথচ লোক দেখানোর তরে মোটেই করছে না, এটা বুঝতে কঠিন হলেও মোটেও অমনোযোগী এবং লোক-দেখানো সালাত নয়। সুতরাং এক কথায়, কোনটা আসল সালাত আর কোনটা নকল সালাত এই পার্থক্যটি করা বড়ই কঠিন কাজ। তবে দায়েমি ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকতার বালাই থাকার কথা নয়। যদি কেউ বুঝতে পারে যে লোকটি দায়েমি সালাতের মাঝে ডুবে আছে, কিন্তু চর্মচক্ষে দেখবার এবং বিচার করার কোনো উপায় আছে কি না আমাদের জানা নাই। আফসোস নামক ওয়াইল দোজখের তলা আছে কি না জানা নাই, কিন্তু হাবিয়া নামক দোজখের যে কোনো তলাই নাই এবং কেবল পড়তেই থাকবে এবং তলার সন্ধান কোনোদিন পাওয়া যাবে না, সেই কথাটি আমরা কমবেশি সবাই জানতে পারি। যে-সব মানুষের নফ্‌সের সঙ্গে খান্নাসরূপী লোভনীয় প্রবৃত্তিগুলো যখন ধনসম্পদ অর্জন করাটিকেই একমাত্র মাবুদ বলে

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

ধরে নেয় কেবল তাদেরকেই এই তলাহীন হাবিয়া দোজখে ফেলে দেওয়া হবে। কী অপূর্ব ভাষার সমন্বয়! চাহিদার যেমন সীমা থাকে না, চাহিদার যেমন কোনো স্টেশন থাকে না, চাহিদার যেমন কোনো তলা বা শেষ থাকে না, সেই সব মানুষদেরকেই তলাবিহীন হাবিয়া দোজখে ফেলে দেওয়ার কথাটি বলা হয়েছে, যারা শত বছরের বেঁচে থাকার জীবনটি দেহের পোশাক নিয়ে বেঁচে থাকে এবং ভাবতেই চায় না যে এই দেহ-পোশাকটি হতে একদিন আমাকে মৃত্যু নামক ঘটনাটি দ্বারা বের করে দেবে। যেইমাত্র নফ্‌স তথা প্রাণ তথা জীবাত্মাটি এতদিনের লালিত যত্ন করা দেহটি হতে বিদায় গ্রহণ করে তখন সেই দেহটি একটি সুন্দর নামধারণ করে, সেই সুন্দর নামটি হলো লাশ।

লাশ কখনই জীবাত্মা নয়, আবার জীবাত্মাটিও লাশ নয়। জল ধরে রাখার পাত্র হতে যখন জল ঢেলে ফেলা হয় তখন পাত্রটি খালি হয়ে যায়। এই সূক্ষ্ম এবং জটিল বিষয়টি বুঝে আসাটা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। ঘৃণ্য পুঁজিবাদের জঘন্য ধনসম্পদের উপর দাঁড়িয়ে যারা পরহেজগারির রঙ-তামাশা দেখায় তাদের রঙতামাশাগুলো দেখে দেখেই কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, এবং মাও সে তুঙ-এরা জীবাত্মাটিকে তথা নফ্‌সটিকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

রাশিয়ার সম্রাট জারের আমলে ধনী-গরিবের নির্মম-নিষ্ঠুর বৈষম্য দেখে দেখে যখন বিদ্রোহের দানা বাঁধতে থাকে, এবং সেই বিদ্রোহই একদিন গণবিপ্লবের রূপধারণ করে, গণবিপ্লবের অনুসারীরা যখন জার সম্রাটের রাজপ্রাসাদ ক্রেমলিন আক্রমণ করে তখন ক্রেমলিনের অভ্যন্তরে পবিত্র গির্জাটির ভেতর যিশুখ্রিস্ট এবং মা মরিয়মের বানানো পাথরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে জার সম্রাট, যাকে আইভান দ্য টেরিবল বলা হতো, সেই জার সম্রাট চিৎকার দিয়ে জনতাকে ধর্ম উপদেশ দিয়ে বললো, 'এই পবিত্র গির্জায় প্রবেশ করো না। তোমরা কি দেখতে পাও না যিশু আর মা মরিয়মের পবিত্র প্রতিচ্ছবি?' তখন জনতা গির্জার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলে ফেললো, 'তোমার মতো পাপিষ্ঠ শয়তান যে ঘরে অবস্থান করে সেই ঘর কখনই আল্লাহ্‌র ঘর হতে পারে না।' পরক্ষণে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, অর্ধেক দুনিয়ার খলিফা আমিরুল মোমিনিন ফারুকে আজম হজরত উমর ফারুক (রা.) জেরুজালেমে পোপের আগমন উপলক্ষে গিয়েছিলেন। পোপ সফ্রোনিয়াস উটের পৃষ্ঠ হতে খলিফা আমিরুল মোমিনিন উমর ফারুককে নামিয়ে যখন লাল গালিচায় সংবর্ধনা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মুসলিম জাহানের জেনারেল আবু উবায়দা চিৎকার দিয়ে বললেন, 'ওগো সফ্রোনিয়াস, আপনি যাঁকে উটের পিঠ হতে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি আমাদের খলিফা নন, তিনি খলিফার চাকর, আর যিনি আমারই সামনে উটের রশি ধরে দন্ডায়মান তিনিই আমাদের খলিফা আমিরুল মোমিনিন ওমর ফারুক।'

এই কথা শুনে পোপ সফ্রোনিয়াস নির্বাক দৃষ্টিতে খলিফার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর এক দৌড়ে উমর ফারুকের পদতলে লুটিয়ে পড়ে ইসলাম ধর্ম কবুল করে নিলেন এবং সঙ্গে তাঁর সহচররাও। কথিত আছে যে রোমন সম্রাট বলেছিলেন, যদি সেই মূহূর্তে সমগ্র খ্রিস্টান জাতি উপস্থিত থাকতো তা হলে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নিত। এই বিস্ময়কর আদর্শ আজ কেবল ইতিহাসের পাতায় বিলাপের কান্নারূপেই দেখতে পাই। বাস্তবে এর সামান্য প্রতিফলনটিও পৃথিবীর সাতান্নটি মুসলিম দেশের

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

একটিতেও নাই। তাই আজ আমরা ইহুদি-খ্রিস্টানদের হাতে মার খেয়ে চলেছি। অস্ত্রের মার, বোমাবাজির মার, কূটনীতির চালের মার, প্যাঁচঘোচ মারা মুচকি হাসির মার এবং কত রঙঢঙের মার যে মুসলমানেরা খেয়ে চলছে তার হিশাবটি কে রাখে? আর সেই সঙ্গে *কোরান*-এর ঘোষণাটি বার বার আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়, আর সেই ঘোষণাটি হলো : যে জাতি তার নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন না করে, সেই জাতির ভাগ্য আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না (হুবহু উদ্ধৃত নয়)। তাই আল্লামা ইকবাল দুঃখ করে বলেছিলেন, 'তুর পাহাড়টি আজও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মুসা নাই।'

এই সুরাটির প্রথম আয়াতেই একটি প্রচন্ড চপেটাঘাত করেছেন আল্লাহ। আল্লাহ বলছেন : তুমি কি দেখেছ সেই মানুষটিকে, যে ধর্মকে তথা দীনকে অস্বীকার করে তথা ধর্ম বলে কিছু একটা আছে বলে মানে না? তারা কারা তোমরা কি জানো? তারাই ধর্মকে তথা দীনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে যারা এতিম, নিঃস্ব, রিক্ত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, সর্বহারা (পচা নামের সর্বহারা নয়, পচা নামের আলবদর নয়, পচা নামের রাজাকার নয়) হতে মুখটি ফিরিয়ে নেয়।

কত বড় মারাত্মক *কোরান*-এর ঘোষণা। অনুবাদকারী কিছুক্ষণের জন্য চমকে ওঠেন। জঘন্য পুঁজিবাদের ধাবমান কুকুর আরবি ভাষা জানা পন্ডিতেরা এই আয়াতটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে কত রকম যে ধানাইপানাই শুরু করে দেয় তার ইয়াত্তা নাই। ভূতের মুখে রামনাম নেওয়াটি যেমন কষ্টকর ব্যাপার, সেই রকম জঘন্য পুঁজিপতিদের ধাবমান আরবি ভাষা জানা মানুষরূপী কুকুরগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যার চেহারাগুলো আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই।

আজ যেন আসল বিষয়গুলোই বলতে গেলে নূতন শোনায় এবং এই রকম অপ্রিয় সত্যকথাগুলো লিখতে যারা শক্ত হাতে নিরপেক্ষ মন নিয়ে কলম ধরে তাদের জীবনে অনেক রকম হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। এ যেন দশটি শয়তানের পাল্লায় পড়ে ভগবানকেও ভূত সাজতে হয়।

দ্বারে দ্বারে ঘুরেও যখন এক মুঠো ভাত একটি যুবতী মেয়ে সংগ্রহ করতে পারে না, তখন পেটের ক্ষুধা নিবারণ করার তরে যদি দেহটি বিক্রি করে দেয়, তা হলে সেই ফতোয়ার ভাষাটি অধম লিখকের জানা নাই।

ইসলাম যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন, ঠিক তেমনই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। কেউ কেউ বলে থাকে : 'যদি বার বছর বয়সে নামাজ না পড়তে চায় তা হলে সমস্ত রকম আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে মুখ ফিরিয়ে নাও।' আর যারা ধনসম্পদের পাহাড় বানিয়ে এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে, জাল দলিল করে এতিমের শেষ সম্বল থাকার ঘরটি হতে উচ্ছেদ করে দেয়, তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথাটি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে একবারও শুনতে পাই না। কী চমৎকার আলেম-উলামা! কী বাহারি ফতোয়ার বাহারি দলিলগুলো দিতে দেখি!

এতিমের হক মেরে দিয়ে 'হালাল সাবান' দিয়ে গোসল করে বেহেশতে যাবার দিবাস্বপ্ন দেখায় এই জঘন্য পুঁজিপতিরা। 'হালাল সাবান' দিয়ে এতিমের হক মারা মানুষটির চামড়াটি পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু কোন 'হালাল সাবান'টি দিয়ে মনের অভ্যন্তরের শয়তানি ময়লাগুলো পরিষ্কার করা যায় সেই কথাটি

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

ভুলেও একবার প্রচার করতে দেখি না। বড়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই কথাগুলো লিখে গেলাম। জানি, কারো কাছে ভালো লাগবে, কারও কাছে বিষের মতো মনে হবে। এবং দু-একজন ভন্ডামি করছে বলে অপবাদ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না। হায় রে মানুষের খুব বেশি হলে একশত বছরের জীবন! জানে, মৃত্যু অবধারিত, তবু শয়তানি খেলাটি খেলেই চলছে।

একদম নিরপেক্ষ মন নিয়ে একটি বিশেষ ঘটনার অভিজ্ঞতাটি এখন বলছি। এক মুক্তিযোদ্ধা এক রাজাকারকে গুলি করে হত্যা করবে। রাজাকার অনুরোধ করছে: আমাকে বুকে গুলি করুন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা পায়খানার রাস্তায় রিভলবারের নলটি ঢুকিয়ে গুলি করে।

অধম লিখক তখন সদরঘাটের শরিফ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় ডাক্তারি করি। একটি রোগীকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হলো। রোগীর আত্নীয়দেরকে প্রশ্ন করলাম : কী রোগ হয়েছে? বলা হলো : ক্যান্সার। জিজ্ঞেস করলাম : কোথায়? উত্তর: পায়খানার রাস্তায়। আমি অধম লিখক পায়খানার রাস্তাটি দেখার জন্য কাপড়টি খুলে ফেলি। দেখতে পেলাম, ছোট্ট একটি ফুলকপির মতো সাদা। পায়খানা করার রাস্তাটি দেখা যায় না। টিউবের সাহায্যে অন্য পথে পায়খানা করানো হয়। প্রশ্ন করলাম রোগীকে : তুমি এমন কী পাপ করেছ, বাবা? রোগী অকপটে বললো, যা প্রথমেই বর্ণনা করেছি। বুঝতে পারলাম, যত বড় পাপীই হোক না কেন এইভাবে হত্যা করাটি মোটেই ঠিক হয় নি। এ রকমভাবে ৪২টি বছর হোমিও ডাক্তারি করেছি। অহংকার করে বলছি না, হোমিও ডাক্তার হিসাবে অধম লিখকের মোটামুটি একটা সুনামই ছিলো। বহু অভিজ্ঞতার মধ্য হতে মাত্র একটি অভিজ্ঞতার কথাটি তুলে ধরলাম।

হজরত জাবির (রা.)-এর বর্ণিত বিখ্যাত হাদিসটির অর্ধেক আমাদের দেশে প্রচার করা হয়। সেই অর্ধেক হাদিসটি হলো, 'নামাজ বেহেশতের চাবি।' কিন্তু পরের অর্ধেক হাদিসটি বলা হয় না। সেই অর্ধেক হাদিসটি হলো, 'নামাজের চাবি তাহারত তথা পবিত্রতা।' বেহেশতের চাবি যে রকম নামাজ ঠিক সে রকম নামাজের চাবিটিও হলো তাহারত তথা পবিত্রতা। এই তাহারত তথা পবিত্রতা কি 'হালাল সাবান' দিয়ে সমগ্র শরীরটাকে ধৌত করে পবিত্র হবার কথাটি বলা হয়েছে? যদি বলেন 'হ্যাঁ' তা হলে এই হ্যাঁ বলাটাই আপানার তকদির, আর যদি বলেন, 'না' তা হলে এই না বলাটাই আপনার তকদির। (একটি কথা অবশ্য ভুলে গেলে চলবে না যে যারা মাজ্জুব, মাস্তান, আবদাল, আরিফ, আল্লাহ্‌র আশেক তাদের বেলায় এই কথাগুলো মোটেই প্রযোজ্য নয়। কারণ '*লা ইউফ্‌তা আলাল আশেকিন*' তথা 'আল্লাহ্‌র আশেকদের উপর কোনো ফতোয়া নাই।') জান্নাতের চাবিটি যে নামাজ এবং নামাজের চাবিটি যে তাহারত তথা পবিত্রতা এই কথাটির আরেকটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন, তবে পাঠকদের সুবিধার্থে বাংলা ভাষায় হাদিসটি হুবহু তুলে দিলাম : '*আন জাবেরিন কালা কালা রসুলুল্লাহে (আ) মেফতাহুল জান্নাতে আস-সালাতু ওয়া মেফতাহু সালাতিত তহুর।*' অর্থাৎ 'হজরত জাবের (রা.) বলেছেন, জান্নাতের চাবিটি হলো নামাজ এবং নামাজের চাবিটি হলো পবিত্রতা।' এখানে পবিত্রতার প্রশ্নেও মেজাজি পবিত্রতা এবং হকিকি পবিত্রতার কথাটি এসে পড়ে। মেজাজি পবিত্রতা বলতে আমরা

মোটামুটি বুঝে থাকি ওজু-গোসল আর অপর পক্ষে হাকিকি পবিত্রতাটিকেও ইচ্ছা করেই দুই ভাগ করে নিলাম। প্রথম ভাগটিতে সত্য পথে চলা, অন্যায় না করা, জুলুম হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করা, গরিব-দুঃখীকে দান-খয়রাত করা, মাপে কম না দেওয়া, খাদ্যে ভেজাল না মেশানো, ব্যবসা করতে গিয়ে মানুষের মাথায়-বাড়ি-দেওয়া লাভ করা হতে বিরত থাকা, জাল দলিল করে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো হাকিকি পবিত্রতার প্রথম ধাপ। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপটি তথা সর্বোচ্চ পবিত্রতাটি হলো আপন নফ্স তথা প্রাণ তথা জীবাত্মা হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বাহির করে দেওয়া– মানুষ মনে করে যে সে একা, কিন্তু এই মানুষের সঙ্গেই যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে উহাকে ধ্যানসাধনা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে সরিয়ে দেওয়া। যিনি আপন নফ্স হতে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছেন তিনিই পীর, তিনিই মুরশিদ, তিনিই পথপ্রদর্শক, তিনিই গুরু। 'গু' মানে অন্ধকার এবং 'রু' মানে আলো। সুতরাং যিনি অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে যাবার ফর্মুলাগুলো দিতে পারেন তিনিই গুরু। মহানবি বলেছেন, মানব দেহের অভ্যন্তরে এক টুকরো গোশ্ত আছে। সেই গোশ্তটি যদি পবিত্র হয় তবে সমস্ত দেহটাই পবিত্র, আর যদি সেই গোশ্তের টুকরোটি অপবিত্র থেকে যায় তা হলে সমস্ত দেহটাই অপবিত্র। (হুবহু উদ্ধৃত নয়)। মহানবির এই হাদিসটিতে একটি মারাত্মক বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই গোশ্তের টুকরোটির নাম হলো কল্ব। সেই কল্বেই আপন নফ্স এবং খান্নাসরূপী শয়তান উভয়ে অবস্থান করে। উভয়ের অবস্থানে একটি মানুষ যত বড় দাতাই হোক, যত বড় মহানই হোক, যত বড় ত্যাগীই হোক, কিন্তু খান্নাসরূপী শয়তানটি যদি আপন কল্বে অবস্থান করে তা হলে সুফিবাদের দৃষ্টিতে সেই মানুষটিকে পবিত্রতার বলয়ে রাখা যায় না। আমার এই কথাগুলোতে মন ও বিবেক হয়তো বিদ্রোহ করতে পারে, প্রতিবাদ করতে পারে, কিন্তু যত বিদ্রোহ আর যত প্রতিবাদই করা হোক না কেন, কল্বে খান্নাসের অবস্থানটি থাকা পর্যন্ত মানুষটি কমবেশি কলুষিত। এই বিষয়গুলো এতই সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অণু-পরমাণু ধরা পড়ে, কিন্তু এই বিষয়টি ধরা পড়ার যন্ত্রটি অধম লিখকের জানা নাই।

কল্বে খান্নাস থাকলে কামনা থাকবেই, আর কামনা থাকলেই কর্ম কলুষিত হয়। সুতরাং কামনাই বন্ধন। কোথাও স্থুল বন্ধন, কোথাও সূক্ষ্ম বন্ধন, কোথাও অণু-পরমাণুর চেয়েও সূক্ষ্ম বন্ধন। এই বন্ধনই দুনিয়ার দাসত্ব করায়। এই বন্ধনই তাগুতের কমবেশি পূজা করায়। এই বন্ধনই জীব্তের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই কামনার বন্ধনই মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই কামনার আবেষ্টনই জান্নাত হতে দূরে সরিয়ে রাখে। এই কামনার বন্ধনই বার বার কেয়ামতের দৃশ্যটি দেখিয়ে যায়।

মৃত্যুই কেয়ামত এবং এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং মৃত্যু নামক কেয়ামতটি ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠানো হয়, হিন্দু ধর্মে যাকে পুনর্জন্মবাদ বলা হয়। আমরা ইচ্ছা করেই পুনর্জন্মবাদ না বলে বার বার কেয়ামত হবার কথাটি বলবো। অনেকটা লাউ মানে কদু আর কদু মানে লাউ। ভাষার প্রকারভেদে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তির গোলক-ধাঁধায় পড়াটা অস্বাভাবিক নয়।

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com

ছোটবেলায় দেখেছি বাপ-দাদারা সবাই ধুতি পরিধান করতো। আর এখন ড. গোয়েবল্‌সের মতো প্রচারণায় ধুতিটি হয়ে গেছে হিন্দুদের পোশাক। গোয়েবল্‌সের প্রচারণায় 'খোদা হাফেজ' হয়ে গেছে 'আল্লাহ হাফেজ।' অথচ ধুতি বাঙালির জাতীয় পোশাক। অবশ্যই বাঙালি জাতির জন্য আল্লাহ অনেক নবি-রসুল পাঠিয়েছেন, বাঙালির জাতীয় ভাষায় আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ প্রচার করার জন্য। আবু লাহাব, আবু জেহেল, ওক্‌বা, সায়েবা এবং আবদুল্লাহর মতো কাট্টা কাফেরেরা যে পোশাক পরিধান করতো সেই একই পোশাক মহান সাহাবারাও পরিধান করতেন (ইমাম গাজ্জালি)।

প্রায় ধর্মেই এইসব ছোট ছোট বিষয়ে নোংরা কথা প্রচার করে সার্বজনীনতার রূপটিকে গন্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলে। মনে করে ধর্মের জন্য অনেক কিছু করলাম, আসলে কী ভয়ংকর ক্ষতিগুলো যে করা হচ্ছে তা বুঝতে পারে না। এই প্যাঁচঘোচের দুনিয়াতেই আপনাকে পীর খুঁজতে হবে, গুরুর কাছে মুরিদ হতে হবে, কারণ হাকিকি জ্ঞানটি লাভ না করা পর্যন্ত বার বার দেহ নামক পোশাকগুলো বদল করে আপনাকে আসতেই হবে। আপনি মানলেও আসবেন, না মানলেও আসবেন। যে পর্যন্ত আপনি পীর তথা গুরু না পাবেন এবং সেই গুরুর কথা মতো ধ্যানসাধনাটি না করবেন ততবার আপনাকে দেহ নামক পোশাকটি ফেলে ফেলে আসতেই হবে। দেহের পোশাক কাপড় যখন পরার অযোগ্য হয়ে যায় তখন ফেলে দেয়। ঠিক সেই রকম যতদিন এই অযোগ্য দেহ নামক পোশাকটি থেকে যাবে ততদিন আপনার জন্য পীর নাই, গুরু নাই! কেবল এক বোবা উদ্দেশ্যবিহীন উপাসনার আস্ফালন করে যেতে হবে। আসলে অতি অপ্রিয় সত্য কথাটি হলো, আগের জন্মের কর্মফলটি ভোগ করতেই হবে। ইহাই তকদিরের লিখন, ইহাই নিয়তির বিলাপ। সুতরাং 'তুমি যেমনে নাচাও তেমনি নাচি, পুতুলের কী দোষ?' কথাটির মর্মবাণী কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না; কেউ ঠাট্টা করে, কেউ বিদ্রুপের হাসি হেসে ছেঁড়া কাগজের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এই খান্নাস নিয়ে মানুষ যদি অন্য কোনো গ্রহে যেতে পারে এবং বাসযোগ্য করে তুলতে পারে, সেখানেও এই খান্নাসটি থাকার দরুন ঝগড়া ঝাঁটি, মারামারি, লাঠালাঠি, নেতৃত্বের রক্ত আমাশা, দারোগা-পুলিশ, সিআইডি-ডিবি, আধুনিক র‍্যাব, কোর্ট-কাচারি, বিচারক, বিচার, জেলখানা, ফাঁসি দেবার জল্লাদ ইত্যাদি বিষয়গুলো অবশ্য অবশ্যই থাকবে। কেন থাকবে? ওই একটিমাত্র কারণ হলো, প্রতিটি মানুষের নফ্‌সের সঙ্গে তথা প্রাণের সঙ্গে তথা জীবাত্মার সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, *কোরান*-এর মূল দর্শনটিই হলো, যত প্রকার অপকর্মের একমাত্র নেতাটিই হলো খান্নাসরূপী শয়তান। এই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে কেমন করে তাড়াতে হবে বিষয়টি অনেক জ্ঞানীগুণির কাছেই একটি ফালতু বিষয়। হি হি করে হাসবার বিষয়। শান্তির জন্য কত রকম যে গবেষণা চলছে আর টন কে টন কাগজ নষ্ট করা হচ্ছে এটা বলতে গেলে মহান তথাকথিত গবেষকেরা বিষয়টি চিন্তা করা তো দূরের কথা, বরং গাঁজাখুরি গল্প মনে করে কী অপূর্ব জ্ঞানের হাসি হেসে যায়!

মহাপবিত্র মহামহান নোবেল প্রাইজটির সামান্য বয়ান দিতে চাই। বয়ানটি তথা ব্যাখ্যাটি অধম লিখকের নয়, আমেরিকার একজন নাম করা বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর। অনেক সময় গোপনে লুকিয়ে

রাখা থলি হতে ছোঁচা বিড়ালের ছোঁচামির ইতিহাসগুলো তুলে ধরে দুনিয়াতে হইচই ফেলে দেয়। অধম লিখকের পরম শ্রদ্ধেয় সেই বিখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর নামটি হলো নোয়াম চমস্কি। একবার মহান নোবেল প্রাইজের মাথায় মুগুর দিয়ে বাড়ি দিয়ে বলে ফেললেন যে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে কেমন করে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হলো? নোবেল অর্থটি যদি সম্ভ্রান্ত আর ভদ্রই হয়ে থাকে তা হলে এই ভদ্র কমিটিতে অবশ্যই কিছু অভদ্র জ্ঞানী ঢুকে পড়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি বলে ফেললেন যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়াটি বিশ্ব বিবেকের গালে একটি প্রচন্ড চপেটাঘাত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি এমন অবাক করা কথাটি বলে ফেলেছিলেন যা শুনে তাবৎ পৃথিবীর জ্ঞানীগুণিদের মাঝে হইচই পড়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, হিটলারের বড় বড় চেলা-চামুন্ডাদের নুরেমবার্গ নামক ট্রাইব্যুনালে বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই অশান্তির ধারক-বাহক প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে যদি নুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনালের মতো বিশেষ আদালতে বিচার করা হতো তা হলে নোবেল প্রাইজের বদলে ফাঁসি দিলে ঠিক হতো। বিবিসির সাংবাদিক জেরেম প্যাক্সম্যানের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমেরিকার পরম শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি এই রকম কথাগুলো বলেছিলেন। উনি আরও অনেক বেশি বলেছিলেন, কিন্তু অধম লিখক সংক্ষেপে বিষয়টি পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম।

আরেকটি নোবেল প্রাইজের সামান্য বয়ান দিতে বাধ্য হলাম। আর সেটা হলো, কোনো এক বিজ্ঞানী নিকোটিনমুক্ত সিগারেট আবিষ্কার করে ফেললেন। আর যায় কোথায়! নিকোটিনমুক্ত সিগারেট! এই আবিষ্কারটি কি কম বড়ো আবিষ্কার? আবিষ্কারের বছরই সেই বিজ্ঞানীকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে দেওয়া হলো। অবশেষে দেখা গেল, কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে যে নিকোটিনমুক্ত সিগারেটগুলো বানানো হয়েছিল সেটা কেউ পান করেন না। আমেরিকা সরকার এই নিকোটিনমুক্ত সিগারেটের জন্য সিগারেট কোম্পানিগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে কি না জানি না তবে এইটুকু জানি যে সেইসব নিকোটিনমুক্ত সিগারেটের প্যাকেটগুলো আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আরেকটি অর্থনীতির উপরে নোবেল পুরস্কারের উপরে বয়ানটি শুনতে ইচ্ছা পোষণ করি। যদিও অর্থনীতির উপর নোবেল পুরষ্কারটি নোবেল কমিটি দিয়ে যান নি, বরং আমেরিকার পবিত্র জ্ঞানীগুণিরা অর্থনীতির উপর নোবেল পুরস্কারের বিভাগটি খুলেছিলেন। আমেরিকার এক অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির উপরে একটি সূত্র আবিষ্কার করলেন। আর সেই সূত্রটি হলো কোটি কোটি ডলারের শেয়ার কেনার পর মার খেলে যে হতাশার চিত্রটি মনের মাঝে ফুটে উঠে সেই হতাশার থেরাপি দেবার অর্থনৈতিক সূত্রটি। বাহ, বাহ! কী অপূর্ব! কী সুন্দর নোবেল প্রাইজ!

পবিত্র নোবেল পুরস্কারটিকে আমরা পবিত্রই জেনে আসছি। কিন্তু কী এমন অজ্ঞাত কারণে ফরাশি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রে নোবেল প্রাইজটি গ্রহণ করেন নি? রাশিয়ার নাগরিক বরিস পাস্টারনাক রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি আখাস্তা বই *ডা. জিভাগো* লিখেছিলেন, কিন্তু নোবেল প্রাইজটি

নেবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া নিতে দেয় নি। শুনেছি ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এবং বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ-ও নোবেল প্রাইজটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (?)।

এই সুরার প্রথম দুটো আয়াত বিশ্ববিবেককে চমকিয়ে দেয়। চমকিয়ে দেয় মুসলমান নামের সাইনবোর্ডটি যাদের কাঁধে ঝুলে আছে। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই যে উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলমান হয় না, এই দুটো আয়াতের কষ্টিপাথরে যাচাই করলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। এই কথাগুলো *বুখারী* এবং *মুসলিম শরিফ*-এর বর্ণিত হাদিস নয়, এই কথাগুলো *মুত্তাফেকুন* অথবা *হাসান শরিফ*-ও নয়, ইহা স্বয়ং আল্লাহ্‌র *কোরান*-এর কথা। কী সুন্দর ভাষায় কী অপূর্ব ছন্দ দিয়ে *কোরান* বলছে : তুমি কি দেখেছ সেই মানুষটিকে যে প্রথমেই তথা বিসমিল্লাতেই ধর্ম হতে বাদ? দীন হতে বাদ? এই দীন বলতে ইসলাম ধর্মকেই বোঝানো হয়েছে। বড় সাজ্ঘাতিক কথা যে বিসমিল্লাতেই ইসলাম ধর্ম হতে সম্পূর্ণরূপে বাদ এবং এই বাতিল হবার প্রশ্নে কোনো শর্তই রাখা হয় নি। এখন একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখি, দেখি ইসলাম কয়টি খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইমান, নামাজ, রোজা, হজ এবং জাকাত–এই পাঁচটি খুঁটির উপর ইসলাম ধর্মটি দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ বলছেন : তুমি কি সেই মানুষটিকে দেখেছ যে ইসলাম ধর্ম হতে প্রথমেই বাদ? অর্থাৎ ইমান, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত এই পাঁচটি খুঁটিকে অস্বীকার করে। সে সেই মানুষটি যে বা যারা এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তথা এতিমদের সব রকম দায়-দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। এতিমদের প্রতি লক্ষ না রাখলে অথবা মুখ ফিরিয়ে নিলে অথবা তাড়িয়ে দিলে অথবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে সেই মানুষটি সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম হতেই সম্পূর্ণ বাদ।

জঘন্য পুঁজিবাদের পূজারি পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত বিকাহুয়া আলেম-উলামারা এই দু'টো আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে কত রকম যে ভড়ং চড়ং ও তামাশার খেল দেখায় এবং জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালায়, তাদেরই বা কী বলবো? জঘন্য পুঁজিবাদের পূজারিরা জনতার চোখে ভেলকিবাজির ডুগডুগি বাজিয়ে *কোরানুল করিম*-কে আদরের চুমো দেবার দৃশ্যটি দেখায়। কী বাহারি মহব্বত *কোরান*-এর উপর!

মীরজাফর, মীরসাদেক আর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মতো খচ্চর নামের নরপশুরাও বার বার *কোরান*-এ চুমো খেয়েছে। চুমো খেয়েছে এজিদ আওলাদে রসুল শহিদে আজম ইমাম হোসাইনের কাটা মাথা মোবারক সামনে রেখে সুরা আল ইমরান হতে একটি আয়াত পড়তে গিয়ে। যেন *কোরান*-এর প্রতি এজিদের বড় দরদ! এজিদের টাকা-পয়সায় পালিত তিনশত জাঁদরেল আলেম-উলামারা আওলাদে রসুল শহিদে আজম ইমাম হোসাইনকে 'বাঘি' উপাধি দিয়ে কতল করার ফতোয়াটি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের জনসাধারণকে দেখিয়েছিল। এই জন্যই মহানবি বলেছেন , এমন জামানা আসবে যখন এই আরবি ভাষা জানা আলেম-উলামারা দুনিয়ার নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হবে। (হুবহু উদ্ধৃত নয়)।

দেশের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষের হাড়-ওঠা বুকের পাঁজরের উপর দিয়ে হেঁটে এহরামের পোশাক পরিধান করে উড়োজাহাজে চড়ে মেজাজি হজব্রতটি পালন করে। তা পালন করুক, কিন্তু দেশের সরকার যদি এই রকম এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার মানবিকতাকে উপেক্ষা করে তো প্রতিনিয়ত একেক রকম গজব নাজেল হতে থাকে। ভাবতে অবাক লাগে, যেখানে *কোরান* বলছে : তুমি কি সেই মানুষটিকে দেখেছ, যে ইসলাম ধর্মটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তথা মানে না? কতবার কত রকমে একই কথা বার বার বলতে হচ্ছে। মনে হয় সবচেয়ে কঠিন পাথর নামক হীরাটি হতেও এদের বিবেক আরও শক্ত, আরও কঠিন।

মহানবি বলেছেন, সূঁচের ছিদ্র দিয়ে একটি উট ঢোকাটা তোমার কাছে যে রকম অসম্ভব মনে হয় তারচেয়েও অনেক অনেক বেশি অসম্ভব একজন ধনবান ব্যক্তির বেহেশতে প্রবেশ করা। (হুবহু উদ্ধৃত নয়)। আস্‌সারে মোবাশ্‌শারার যে দশজন মহান সাহাবা দুনিয়াতে থেকেই বেহেশতের সুসংবাদ পেয়েছেন তাদেরই একজন ধনবান সাহাবা আবদুর রহমান ইবনে আউফ। এই আবদুর রহমান ইবনে আউফেরও বেহেশতে প্রবেশ করতে ৫০০ বছর লাগবে। এই ৫০০ বছরটি কি পৃথিবী গ্রহের হিশাব নাকি অন্য কোনো অজ্ঞাত স্থানের হিশাব, অধম লিখকের তা জানা নাই। অধম লিখক দশ বছর একাগ্র গবেষণা করে যে ***'মারেফতের গোপন কথা'*** বইটি লিখেছিলাম সেই বইটির জন্য জঘন্য পুঁজিপতিদের ধাবমান তথাকথিত আলেম-উলামারা লেখকের ফাঁসি চেয়েছিল। বইটি বাজেয়াপ্ত করতে চেয়েছিল। বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ***'মারেফতের গোপন কথা'*** নামক বইটি। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল জজ কোর্টে অধম লিখকের বিচার হবার পর কেবল বেকসুর খালাসই পাই নি, বরং বিচারক নিজে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ বলে রায় দিয়েছেন। পাঠকদেরকে অবশ্যই অনুরোধ করতে চাই যে *মারেফতের গোপন কথা* বইটি সংগ্রহ করুন এবং পড়ে দেখুন। তবেই এইসব হালচালের ব্যাপারগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠবে। *কোরান* এবং *হাদিস* হতে এত দলিল-দস্তাবেজ আর কোনো বইতে দেওয়া হয় নি।

এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই যদি ইসলাম ধর্ম হতে প্রথমেই বাদ হতে হয় এবং 'তুমি কি দেখেছ, ইসলাম ধর্ম হতে বাদপড়া মানুষটিকে' কথাটির ভাষাটি কী অপূর্ব, কী অতুলনীয়! জগতের কোনো ধর্মগ্রন্থে এই রকমভাবে এতিমদের বিষয়ে বলা হয়েছে কি না অধম লিখকের জানা নাই। এখানে মুখ ফিরিয়ে নেবার কথাটি বলা হয়েছে, কিন্তু এতিমের সম্পদ মেরে দেবার কথাটি বলা হয় নি। এতিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেই যদি ইসলাম হতে বাদ পড়া হয় তবে এতিমদের সম্পদ মেরে দিলে কী হতে হবে? অনেকটা কুচ পরোয়া নাহি, কিন্তু যখন লিভার ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিগুলো আক্রমণ করে তখন হয়তো কিছুটা বুঝতে পারে যে ঠেলার নাম বাবাজী। এই রকম ঠেলার নাম বাবাজী, এই রকম উষ্টা-টক্কর খেয়ে খেয়ে হয়তো সামান্য হুঁশ আসতে পারে, কিন্তু তখন জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। যেমন কর্ম তেমন ফল।

বিরাট দিঘিতে পালিত বড় বড় রুই-কাতলা মাছ ধরার সৌখিন মৎস্য শিকারিদের বড়শিতে যখন দশ-পনের কেজি ওজনের মাছটি আটকে যায় তখন ছুটে পালাবার জন্য দ্রুত বেগে পালিয়ে যেতে

থাকে। মৎস্য-শিকারি ততই সুতা ছাড়তে থাকে। এভাবে ঘণ্টাখানেক দৌড়াদৌড়ি করার পর দশ পনের কেজির মৎস্য বাবাজী একদম ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মৎস্য-শিকারি আস্তে আস্তে সুতা গুটিয়ে কাছে এনে বড় একটি জালের থলিতে ভরে আনে। আল্লাহ পাকও এই জাতীয় মানুষ নামের মাছগুলোকে দুনিয়ার দিঘিতে ছুটাছুটি করার দৃশ্যটি দেখতে থাকেন আর মনে মনে হাসেন যে আসল সুতা টানার গেরাপিটি তো আল্লাহ্‌রই হাতে। ঢাকাইয়া ভাষায় বলে : হাড্ডিতে যতদিন গুদা থাকে ততদিনই তড়ং বড়ং।

এতিম হতে মুখ ফিরিয়ে নেবার এত বড় সতর্কবাণী *কোরান* দিয়েছে, কিন্তু যারা এতিমদের ধনসম্পদ মেরে দেয় তথা হজম করে ফেলে তথা আত্মসাৎ করে, তাদের শাস্তিটি কী রকম হতে পারে তা পাঠক বাবা-মায়েদের হাতেই তুলে দিলাম।

মহানবি অন্য একটি হাদিসে বলেছেন : ***যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকে, সেই অন্তরে ইমান থাকে না এবং যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ইমান আছে, তার আর অহংকার থাকে না।*** (হুবহু উদ্ধৃত নয়)। এই অহংকারটি বলতে কী বুঝানো হয়েছে এবং কোন ধরনের অহংকার করলে এক সরিষা পরিমাণ ইমান থাকে না ইহাও পাঠকের হাতে বিচারের ভার তুলে দিলাম এবং আবার বললাম, অধম লিখকের রচিত ‘***মারেফতের গোপন কথা***’নামক বইটি পড়ুন।

অধম লিখক আল্লাহ্‌র ওলি হতে পেরেছি কি না জানি না, তবে একটি ভবিষ্যৎবাণী করতে চাই, আর সেই ভবিষ্যৎবাণীটি হলো : হারিকেন-টর্নেডোতে গরিব আর সাধারণ মানুষ মারা যায়, কিন্তু ধনীদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে না, ভবিষ্যৎবাণীটি হলো : অচিরেই বাংলাদেশে একটি মহাপ্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হবে এবং এই ভূমিকম্পে আশা করি ধনী লোকদের কান্নাকাটির দৃশ্যটি দেখে যেতে পারবো। যদি এই প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পটি না হয় তা হলে মনে করবো, অধম লিখকের বাক্য শুদ্ধ নয়।

বাবা জাহাঙ্গীরের বইগুলো
পড়েই দেখুন না!
অনেক অজানা কথা পান কি না!

বাবা জাহাঙ্গীরের ওয়াজগুলো
শুনেই দেখুন না!
চমকে ওঠেন কি না!

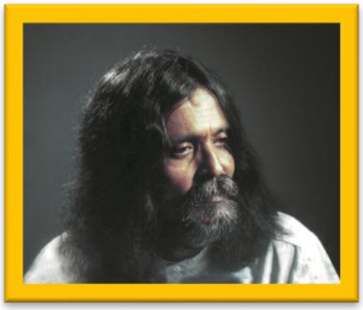

[আমার লিখিত আটাশটি বই, পনেরো পারা কোরানের অনুবাদ ও কিছুটা ব্যাখ্যা এবং আটাত্তর ঘণ্টার মেমোরি কার্ডটি শুনলে আমি ও আমার দর্শন বিষয়ে অনেকটা জানতে পারবেন। আমি বলতে চাই, আমার বইগুলোই আমার আয়না, আমার প্রতিবিম্ব, আমার ছায়া—

যেমন ধোঁয়া ইঙ্গিত দেয় আগুনে অস্তিত্বের। আর প্রেম ইঙ্গিত দেয় তিলে–তিলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে প্রেম সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার।]

মারেফতের গোপন দর্শন : অনেকেরই অজানা (পৃ. ১৩১)
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল সুরেশ্বরী লিখিত বইগুলো সংগ্রহ করুন– সুফিবাদ প্রকাশনালয়। মো: ০১৭১৭৬৩৬৩৫৩
www.babajahangirbd.com